প্রতিক্ষণ
১৭ মে ১৯৮৪ তিন টাকা
সুদীপ্তা সেনগুপ্তের
কুমেরু অভিযানের কাহিনী
আন্ত্রিক মহামারী
বিশেষজ্ঞের মত : সরেজমিন রিপোর্ট

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ রূপালী গোসাভি

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

সুপার রিন-এর শুভ্রতার অধিক চমক

অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট ট্যাবলেট বা বারের চেয়ে অনেক বেশী!

তফাৎটা সহজেই প্রমাণ করতে পারেন। সুপার রিনে ধোয়া কাপড় অন্য যেকোনো ডিটারজেন্ট পাউডার বা বারে কাচা কাপড়ের চেয়ে অনেক বেশী ধবধবে সাদা হয়. কারণ সুপার রিনে আছে শুভ্রতা আনার বেশী শক্তি! আপনার জামাকাপড় এমন সাদা করে, যা সবার নজরে পড়ে।

LINTAS RIN 54 2115 BG

হিন্দুস্থান লিভার-এর উৎকৃষ্ট উৎপাদন

বারোমাস হাসিখুশি, তরতাজা, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল
এই ত্বকের সাথী বোরোলীন।
বোরোলীনের কোমল যত্ন—শুষ্কতা
আর গা-হাত-পা ফাটা,
র‍্যাশ বেরোনো বা রোদে
ঝলসানোর থেকে
খেলাধুলোর সাথী
ত্বককে রক্ষা করে।
বোরোলীনের অ্যান্টিসেপটিক
ক্ষমতা রোজকার সাধারণ
কাটা ছড়ায় দারুণ কাজ দেয়।
বোরোলীন
সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম
BOROLINE
ত্বকের সুরক্ষার জন্য সত্যিই
কার্যকরী ক্রীম
GD
জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস
লিমিটেড
আশা মহল নিউ আলিপুর
কলকাতা ৭০০ ০৪৮
HTC-GDP-5194

উষা-পাখা এবং সেলাই মেশিনের ক্ষেত্রে অগ্রদূত। মূল্য ও মানে সেরার সেরা।

যে কারণে উষার বিক্রি আজ সর্ব্বাধিক

উষা পাখার উচ্চ গুণ-বৈশিষ্ট্য

- কম্‌পিউটারে ডিজাইন করা মোটর অল্প বিদ্যুৎ খরচে বেশী বাতাস দেয়।
- কম ভোল্‌টেজেও অতি উত্তম কাজ করে।
- ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক পেন্টিং-এর জন্য মসৃণ রঙের বাহার।
- ২ বল-বেয়ারিং এবং অন্য সব উষার গুণ-বৈশিষ্ট্য।
- এবং এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সাথে উষার আছে-প্রত্যেকের পছন্দ, রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী নানা মডেলের পাখার সমারোহ।

JE/4-7 B(0)

"ভারতের বধূদের চিনুন" উষার প্রতিযোগিতায় যোগদিন

উষা সেলাই মেশিন ক্রেতাদের জন্য ৩৬ লাখ টাকারও বেশী পুরস্কার।

প্রতি সপ্তাহে প্রথম ২০০টি সঠিক প্রবেশপত্রের জন্য ৫১ টাকা করে পুরস্কার।

তাড়াতাড়ি করুন ! মাত্র কিছুদিনের জন্য এই সুযোগ দেওয়া হবে !!
বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিকটতম উষার দোকানে যোগাযোগ করুন।

১ম পুরস্কার
যে কোন একটি জিতে নিন
- দুজনের জন্য বিমানে পৃথিবী ভ্রমণের টিকিট
- দুজনের জন্য লসএ্যাঞ্জলিস অলিম্পিক্‌স দেখার সুযোগ
- নগদ ৪০,০০০ টাকা

২য় পুরস্কার দুইটি
যে কোন একটি জিতে নিন
- একটি ২০ ইঞ্চি রঙীন টিভি
- একটি স্কুটার
- নগদ ৯,০০০ টাকা

৩য় পুরস্কার তিনটি
যে কোন একটি জিতে নিন
- ভারতের যে-কোন জায়গায় দুজনের জন্য তীর্থযাত্রার বা ছুটি কাটানোর ব্যবস্থা
- নগদ ৬,০০০ টাকা

৪র্থ পুরস্কার ৯টি
যে কোন একটি জিতে নিন
- একটি ১৬৫ লিটারের রেফ্রিজারেটর
- নগদ ৪,৫০০ টাকা

৫ম পুরস্কার ১৮৫টি
- এইচ. এম. টি হাতঘড়ি

আরও পাবেন!
সীমিত সংখ্যক সম্পূর্ণ জাপানী পার্টস্‌ সম্বলিত ফুল জিগ-জ্যাগ মেশিন

গুণের মহান ঐতিহ্য

বাংলা ভাষায় সর্বভারতীয় পাক্ষিক
প্রথম বর্ষ বিংশ সংখ্যা ১৭ মে ১৯৮৪

এই পক্ষের প্রধান রচনায় বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিদ্যার জয়যাত্রারই একটি অভিযানের বিবরণ যখন আমরা পড়ব, তার পাশাপাশি মেনে নিতে হবে এক কঠিন বাস্তব সত্য। অপর একটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের চরম ব্যর্থতা। সহস্র প্রাণের বিনিময়েও একটি রোগের কার্যকারণ খুঁজে বার করতে বিজ্ঞান যেখানে এখন পর্যন্ত ব্যর্থ।

আন্ত্রিক রোগ বিষয়ে প্রাথমিক রিপোর্টটি যখন আমরা প্রকাশ করবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম গত সংখ্যায়, তখনও পর্যন্ত ভরসা ছিল, সেই লেখা ছাপার হরফে প্রকাশিত হবার আগেই ভয়াবহ এই রোগ আয়ত্তে আসবে। আতঙ্কিত মানুষজন অবকাশ পাবেন আশ্বস্ত হবার। কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ নিরাশ্বাস করে ইতিমধ্যে রোগাক্রান্ত এবং মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। রোগ ছড়িয়েছে নতুন নতুন এলাকায়। সরকার এবং সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকগণ তৎপরতার সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলার চেষ্টা করলেও, এখন পর্যন্ত অন্ধকারেই পথ হাতড়ে ফিরছেন—এই আশঙ্কার সঙ্গত কারণ আছে।

আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গে, রোগের প্রকোপ যেখানে সবচাইতে বেশি এমন কয়েকটি এলাকায়, হাওড়ার আমতা এবং বাগনানে, জলপাইগুড়িতে, কুচবিহারে—গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরে আন্ত্রিক রোগের কার্যকারণ খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছেন। মানুষের অসাবধানতায়, সামান্য প্রচারের অভাবে, প্রাথমিক অজ্ঞানতায় কি ভাবে আন্ত্রিক রোগ ক্রমশ মহামারীর আকার নিতে পেরেছে, আমাদের অনুসন্ধানে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সেই তথ্য। শহরের ডাক্তারদের শর্তাধীন সেবার পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধে স্থানীয় ডাক্তার এবং তরুণদের অক্লান্ত, নজীরবিহীন প্রচেষ্টা বিশেষত উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে, মানুষকে কিছুটা আশ্বস্ত করতে পেরেছে।

বাংলাদেশের যে নাটকের দলটি অভিনয়ের সূত্রে নিবিড় করে গেলেন আমাদের সাংস্কৃতিক বন্ধন, বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তাঁদের প্রযোজনা, অভিনয়রীতি, এবং নাটক নিয়ে একটি সাক্ষাৎকার এবং সামগ্রিক আলোচনা এই সংখ্যার এক বিশিষ্ট সংযোজন।

দক্ষিণ মেরুতে তৃতীয় যে অভিযানটি হয়ে গেল সম্প্রতি, তার অন্যতম সদস্য ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা সুদীপ্তা সেনগুপ্ত। তাঁর অনন্য অভিজ্ঞতা প্রতিক্ষণের পাঠকদের উপহার দিয়েছেন তিনি এই পক্ষের প্রধান রচনায়, নবনীতা দেবসেনের সঙ্গে একান্ত, বিস্তৃত একটি সাক্ষাৎকারে। নবনীতা দেবসেনের লেখনী যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে এই রচনায়—সেটুকু আমাদের উপরি পাওনা।

সম্পাদক স্বপ্না দেব

প্রতিক্ষণ-এর পক্ষ থেকে প্রিয়ব্রত দেব কর্তৃক ৭, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৩ ফোন ২৩-০৫৯০ থেকে প্রকাশিত
হেডওয়ে লিথোগ্রাফিক কোম্পানি পি-২৫৩ সি·আই·টি স্কিম ৬-এম কাঁকুড় গাছি, কলকাতা-৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
পাইকা ফটোসেটার্স, ১১২সি, আনন্দ পালিত রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৪ থেকে কম্পিউটার টাইপসেট যন্ত্রে গ্রথিত।
দাম : তিন টাকা। বিমানে অতিরিক্ত ০·২৫ পয়সা

এদের জীবনে লাগুক আলোর স্পর্শ, কেটে যাক্ অন্ধকার।

১৯৮৪-র ১লা মে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ২৯ বছর পূর্ণ হল।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের পরিস্থিতি খুবই জটিল। ৭০ দশকের শুরুতে যে ভয়ঙ্কর বিদ্যুৎ সংকট দেখা দিয়েছিল, আজ তা বেশ কিছুটা রোধ করা গেছে, তবুও বিদ্যুতের চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে ব্যবধান রয়ে গেছে।

আজ অতীতের কথা না ভেবে আমরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের কিছু ভাবনা তুলে ধরতে চাই।

কয়েকটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য

কেবল বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে হা হুতাশ না করে আমরা কয়েকটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করেছি ; এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সমস্তরকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। অতীতের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই আমাদের নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে আমাদের প্রয়াস আরও বেশি ফলপ্রসূ হতে পারে।

নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ এগিয়ে চলেছে। সাঁওতালডি ও ব্যাণ্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে পর্ষদ এখন ৫৫০-৬০০ মেগাওয়াট, অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় গড়ে ১০০ মেগাওয়াট বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে।

কোলাঘাট দ্রুত বাস্তবে রূপ নিচ্ছে

কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিটটি এই বছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ৫০ থেকে ১০০ মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবে, আশা করা যাচ্ছে। বাকি দুটি ইউনিট আগামী বছর থেকে উৎপাদন শুরু করবে।

জলঢাকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎপাদন শুরু হবার পর উত্তরবঙ্গের বিদ্যুৎ পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ভূটানের চুখা প্রকল্প থেকে যখন বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে, তখন অবস্থার আরও উন্নতি হবে। সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি থেকেও বাড়তি বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে।

গ্রামের মানুষের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচী

গ্রামাঞ্চলই পশ্চিমবঙ্গের প্রাণ। এই প্রাণের স্পন্দন অব্যাহত রাখতেই হবে। আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে পশ্চিমবঙ্গের ১ লক্ষ ৩০ হাজার নতুন গ্রাহককে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার এবং ১০,০০০ নতুন পাম্প সেট চালু করার যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল, তা সম্ভব হতে চলেছে। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জরুরী ভিত্তিতে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের যে কর্মসূচী আমরা হাতে নিয়েছি, তাতে রাজ্যে ১৯,০০০-এরও বেশি মৌজাতে আমরা বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে পেরেছি। এর ফলে গ্রামের মানুষের এক বিরাট অংশ উপকৃত হয়েছেন।

জনগণের সহযোগিতাই আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করবে

আমাদের একটি প্রধান কাজ হল সুদূর গ্রামাঞ্চলের মানুষদের বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতা না পেলে কোনও কর্মসূচীই সাফল্য লাভ করবে না। তাই আমাদের কর্মসূচী বাস্তবে রূপ দেওয়ার আগে আমরা স্থানীয় জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। জেলা স্তরে স্থানীয় উপদেষ্টা কমিটি এবং 'গ্রুপ ইলেকট্রিক সাপ্লাই' স্তরে কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিগুলি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, পর্ষদ এবং স্বায়ত্তশাসন বিভাগের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। স্থানীয় জনসাধারণের কোনরকম সন্দেহ বা ভুল বোঝাবুঝি দূর করার জন্য যে কোন কর্মসূচী কার্যকরী করার আগে এই কমিটিগুলি বিশদভাবে আলোচনা করে নেন।

আমাদের সহকর্মী বন্ধুদের, যারা নানা বাধা বিপত্তির মধ্যেও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে চলেছেন, বিগত দিনগুলিতে যারা আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ্

মাটির সুরের খোঁজে

ওরা সবাই লোকশিল্পী। কখনো গাইছে কখনো বাজাচ্ছে। ওরা আমাদের শুনিয়েছিল বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার আঞ্চলিক সুরের গান ঝুমুর। ওদের গানেই আমরা পেলাম ওই অঞ্চলের ঝুমুরের আদি চেহারা। বলা যায় ওই অঞ্চলের সকল সুরের আদিম ছাঁচটি যেন।

প্রধান রচনা

দক্ষিণ মেরুর মাঝখানে আন্টার্কটিক মহাদেশকে ঘিরে রেখেছে চারিদিকের মহাসমুদ্র। এই সমুদ্র সারা বছরই প্রচণ্ড ঝঞ্ঝায় তোলপাড়। সমুদ্র তোলপাড় ঢেউয়ে-বরফে আর আকাশ তোলপাড় ঝড়ে। সমুদ্র বা আকাশ জাহাজ বা প্লেনের জন্যে ব্যবহৃত হয় না। এই ভয়ঙ্কর নির্বাসিত মহাদেশে তৃতীয় ভারতীয় অভিযাত্রী দলের সঙ্গে গিয়েছিলেন আমাদের কলকাতার সুদীপ্তা সেনগুপ্ত। তাঁর সেই অভিযানের কাহিনী তিনি প্রতিক্ষণকে বলেছেন।

বাংলাদেশের নাটক

শুধু ঢাকা শহরেই নয়। নাটক ছড়িয়ে পড়ল গ্রামেগঞ্জে বিভিন্ন মফঃস্বল শহরে। চট্টগ্রামেই এখন আছে গোটা এগারো নাট্যদল—তির্যক, থিয়েটার ৭৩, অরিন্দম নাট্য সম্প্রদায়, নান্দিকার প্রভৃতি তাদের মধ্যে কয়েকটি। তির্যক সংস্থা বার করলেন নাট্য পত্রিকা, তির্যক নামে। অভিনীত হতে লাগল বহু নাটক।

এখান থেকে কোনো সীমান্তরেখা দেখা যায়না। গোটা গ্রহ যেন একটাই। বোঝা মুশকিল, পৃথিবীতে কেন এত উত্তেজনা। এখান থেকে পৃথিবীকে দারুণ শান্ত মনে হয়।

—মহাকাশযান থেকে রাকেশ শর্মার পৃথিবী দেখার অনুভূতি।

যে কোনো আন্তর্জাতিক সঙ্কটের সমাধানে রাষ্ট্রপুঞ্জই প্রথম এবং শেষ অবলম্বন হওয়া উচিত। বিশ্বের ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা ঠেকানোর জন্য এই একটা পথই খোলা রয়েছে।

—রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারি জেনারেল পেরেজ দ্য কুয়েলার

পাকিস্তানে দলবিহীন নির্বাচনে আমরা যোগ দেব না। কারণ সামরিক প্রশাসনের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করার কোনো অভিপ্রায় আমাদের নেই।

—বেনজির ভুট্টো

শ্রীমতী গান্ধী বিশ্ব পর্যায়ের নেত্রী। যদি তিনি জাপানে নির্বাচনে দাঁড়ান তাহলে সব মহিলা ভোট তিনি পাবেন এবং রাতারাতি সেখানকার প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাবেন। —জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইয়াসুহিরো নাকাসোনে

চলচ্চিত্রের মাধ্যমে কোনো পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। দর্শকের মনে কেবল প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। চলচ্চিত্র কোনো উত্তর দিতে পারে না।

—চলচ্চিত্রকার সৈয়দ মির্জা

আমি দেখেছি পুরুষশাসিত এই সমাজে একটি ছেলের কিংবা বিবাহিত পুরুষেরও যদি একাধিক মেয়ে বন্ধু থাকে তা নিন্দের নয়। ...কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে এই সেক্সুয়াল ফ্রিডম কোথায়? —অপর্ণা সেন

আমি কোনো রাজনৈতিক দল গড়ার কথা ভাবছিনা। আমি বা আমার সহকর্মী কারোরই রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই।

—জেনারেল জিয়া-উল হক

আমি সব সময়েই জুলফিকার আলি ভুট্টোর গুণমুগ্ধ এবং আমি বিশ্বাস করি তিনিই ছিলেন আমাদের শেষ আশা—গণতন্ত্রে ফেরার ব্যাপারে এবং সরকারের একটা অসামরিক রূপ দিতে।

—আফতাব আলি, প্রাক্তন পাকিস্তানি টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়

শ্রীমতী গান্ধীর জাতীয়তাবাদের আবেদনকে সাম্প্রদায়িক ভাবলে ভুল হবে। এটা জাতীয় ঐক্যের প্রশ্ন, বিদেশে ভারতের সম্মানের প্রশ্ন, সাধারণ মানুষের ওপর এর প্রভাব আছে। —বিপিন চন্দ্র

আমি দালদার বিজ্ঞাপনে কাজ করতে অস্বীকার করি। কারণ ঘিটা খাঁটি নয় আর ভেজাল জিনিসের বিজ্ঞাপন দারা সিং করে না। —দারা সিং

আজ বড় দুঃখের দিন। রুশদের সঙ্গে লড়ে পদক জেতা আর তাদের বাদ দিয়ে পদক জেতার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য।

—রাশিয়ার অলিম্পিক থেকে নাম প্রত্যাহার করা প্রসঙ্গে বৃটিশ

সোভিয়েত সিদ্ধান্ত বদল হলে আমি খুবই খুশি হব। আমি নিশ্চিত যে সোভিয়েত অ্যাথলিট এবং অন্যরা মার্কিনদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে চায়। মার্কিন অ্যাথলিট এবং জনগণ সম্বন্ধেও তাঁদের ধারণা খুবই ভাল।

—সোভিয়েত সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য জর্জি আরবাটভ

শরীরের ডাক্তার, তোমার মন নাই?

অজেয়া সরকারের "শরীরের ডাক্তার, তোমার মন নাই?" (প্রতিক্ষণ, ১৭ মার্চ, ৮৪) রচনা সময়োপযোগী। কিন্তু সমস্যা ও সমাধান দুটোই অস্বচ্ছ থেকে গেছে। কিছু তথ্যের বিকৃতি আছে এবং বহু তথ্য নজরের বাইরে থেকে গেছে। প্রথমেই বলেছেন, "পশ্চিমবঙ্গের হেলথ সার্ভিসেসের ডাক্তাররা নতুন আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।" অথচ অজেয়া সরকার স্বীকার করেছেন যে তিনি সবরকমের ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছেন—একমাত্র হেলথ সার্ভিসেস এ্যাসোসিয়েশন-এর ডাক্তার ছাড়া। এটাই রচনার অসম্পূর্ণতার একটা কারণ হতে পারে।

মন্তব্য—"স্বাধীনতার পর যে কয়েকটি বৃত্তির (প্রফেশনের) আয় সবচেয়ে বেশি বেড়েছে—ডাক্তারি তার মধ্যে প্রধানতম।" সরকারি ডাক্তার সম্বন্ধে এ ধরনের তথ্যবিহীন উটকো মন্তব্য নিষ্ঠার পরিচয় দেয় না। এই রাজ্যে সরকারি ডাক্তার প্রায় ৮ হাজার। এর মধ্যে হাজারখানেক চাকুরির সঙ্গে প্রাইভেট প্র্যাকটিশের অধিকারি এবং তাদের উপার্জন কিছুটা বেশি। বাকীরা নন-প্র্যাকটিশিং, বেতনই সম্বল—এমনকি এইসব ডাক্তারদের ঘুষ খাওয়ার সুযোগও নেই। ১৯৮১ সাল থেকে ডাক্তাররা যে বর্ধিত বেতন পাচ্ছেন, কলেজ শিক্ষকরা তার ৫ বছর আগে থেকেই ঐ বেতন পাচ্ছেন এবং সম্প্রতি তারা আরো বেতনবৃদ্ধির আন্দোলনে নামছেন। WBCS অফিসাররা দুবার প্রমোশন পাবেন ৬ বছর ও ১৩ বছর পরে। ডাক্তাররা পাবেন ১২ বছর ও ১৭ বছর পরে এবং তাও শতকরা ৩৮ জন পাবেন। এ সত্ত্বেও ডাক্তাররা এখনো বেতনবৃদ্ধি ও প্রমোশনের সুযোগবৃদ্ধির দাবি করেননি।

জরুরী বিভাগ বন্ধ করে ধর্মঘট সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে যে এই রাজ্যে ধর্মঘট-হরতালের তীব্রতম দিনগুলিতেও পশ্চিমবঙ্গ অচল হলেও হাসপাতালকে আওতার বাইরে রাখা হয়েছে এবং মানবিকতার তাগিদে হাসপাতাল কর্মচঞ্চল থেকেছে; ১৯৭৪ সালে ডাক্তাররা ৪১ দিন কর্মবিরতিতে জরুরী বিভাগ বন্ধ

করেন নি। ১৯৭৪ সালে ৪১ দিন জরুরী চিকিৎসা চালু রেখেছিলাম কারণ তখন আমাদেরও বিশ্বাস ছিল যে সরকার-আমলা-রাজনৈতিক দল—গণসংগঠন-বুদ্ধিজীবী-মস্তান সকলেরই অমানবিক হবার অধিকার আছে কিন্তু ডাক্তারদের মানবিক হতেই হবে। সেই বিশ্বাসেই ১৯৮১ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি এবং ১৯৮৩ সালে ২১-২৭শে সেপ্টেম্বর জরুরী চিকিৎসা চালু রাখা হয়েছিল। ফলে সরকার আলোচনা শুরু করতেই রাজী হন নি। ১৯৮৩ ৭ই অক্টোবর, আমরা ধর্মঘট করেছিলাম জনপ্রিয় সরকারের আত্মরক্ষাকারী পুলিশের তাণ্ডবের বিরুদ্ধে। তখন আমাদের স্থির বিশ্বাস ছিল যে জরুরী চিকিৎসা চালু রাখলে মানবিক সরকার উপেক্ষা করবেন—কথা বলতেও রাজী হবেন না। তাই জরুরী বিভাগ বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

ওষুধের বিষয়ে মন্তব্য—"রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ব্র্যাণ্ড নেম-এর পরিবর্তে উপাদানগত নাম (generic name) ব্যবহার করে একটি জীবনদায়ী ওষুধের তালিকা তৈরি করা হলে অনেক প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক সেটি মেনে নিতে অস্বীকার করেন।" এই মন্তব্যকে অসত্য না বলে মিথ্যা বলাই সঙ্গত। উল্টোটাই সত্য। জেনেরিক নাম সরকারি ক্ষেত্রে চালু করার জন্য হেলথ সার্ভিসেস এ্যাসোসিয়েশন বারবার দাবি জানিয়েছে। এতে কোম্পানীগুলির কাছ থেকে আরো কম দামে ওষুধ পাওয়া যাবে এবং চুরিও কমবে কারণ দোকানদাররা জেনেরিক নামের চোরাই ওষুধ কিনবে না। এটা করতে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতির

প্রয়োজন নেই। কিন্তু রাজ্য সরকার কিছুতেই এটা চালু করতে রাজী হচ্ছেন না।

স্থানাভাবে হেলথ সার্ভিসেস এ্যাসোসিয়েশনের দাবিগুলির উল্লেখ ও আলোচনা করছি না। মূল সমস্যা হচ্ছে—স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলির দৃষ্টিভঙ্গি, নীতি ও কার্যাবলী। এরা এখনো স্বাস্থ্যকে ব্যক্তির সমস্যা হিসেবে দেখেন। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার আর্থ-সামাজিক ভিত্তি ও তাৎপর্য সম্পর্কে এদের কোন দৃষ্টিভঙ্গি নেই—ফলে নীতিও নেই। এবং কার্যাবলীর লক্ষ্য তাই রয়ে গেছে চ্যারিটি ও জনকল্যাণ হিসেবে। ফলত, রোগ নিবারক-প্রতিষেধক কার্যক্রম এবং পুষ্টি ও স্যানিটেশনের বিষয় এখনো গুরুত্ব পায়নি—একমাত্র চিকিৎসার ক্ষেত্রেই সরকারি উদ্যোগের বিকাশ ঘটেছে। অন্য দিকে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি, বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক কালচার—এই সবের টানাপোড়েনে যখন চিকিৎসা ব্যবস্থাতেও বিপর্যয় ঘটছে, চিকিৎসা ব্যবস্থাকে কি করে কিছুটা জনমুখী করা যায় তার কোনো হদিশ পাচ্ছেন না—তখন, বিপ্লব হলেই সব সমাধান হবে কিংবা সমাজতন্ত্র না হলে কিছু করা যাবে না—ইত্যাদি শ্লোগানের আড়ালে আশ্রয় নিতে চেষ্টা করছেন।

এই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে কি করণীয়—তা আমরা বিস্তৃত আকারে রাজ্য সরকারের কাছে রেখেছি। অতি সংক্ষেপে কিছুটা বলি। এটা সত্যি কথা—একমাত্র রাষ্ট্রের দায়িত্বেই জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নয়ন সম্ভব এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ব্যতীত অন্য কোনো রাষ্ট্র সেই দায়িত্ব যে পালন করেন না, বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতা আমাদের তা শিখিয়েছে। কিন্তু বর্তমান সমাজব্যবস্থায় চিকিৎসার গুরুত্ব কোনক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না। জনগণের খাদ্য-বস্ত্র-আশ্রয়-পানীয় জল-স্যানিটেশনের সমস্যা না মিটিয়েও শুধুমাত্র চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্যে বেশ কিছু রোগ নির্মূল করা যায় (যেমন বসন্ত রোগ) এবং বহু পরিহার্য মৃত্যু রোধ করা যায়। তার জন্য বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র পর্যন্ত অপেক্ষা না করলেও চলে। সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে পুরোপুরি সংরক্ষিত রাখতে হবে সেই লোকেদের জন্য যারা দারিদ্রসীমার নীচে বাস করেন। অপেক্ষাকৃত সচ্ছল গোষ্ঠীর জন্য সমবায় ও বীমাপ্রথার

সাহায্যে স্বতন্ত্র চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। ধনীরা বেসরকারি চিকিৎসার আওতায় থাকবেন। সব শ্রেণীর জরুরী রোগীদের চিকিৎসা সরকারি হাসপাতালে হবে কিন্তু ধনী ও সচ্ছলদের মূল্য দিতে হবে।

স্বাস্থ্যখাতের বাজেট বরাদ্দ নিয়ে অজেয়া সরকার যা লিখেছেন তাতে কিছু ফাঁকি আছে। রাজ্যের বরাদ্দ থেকে কেন্দ্রীয় অনুদানের অংশটুকু বাদ দিয়ে শতকরা হিসেবটা কষলে আসল চিত্র পাওয়া যেত। রাজ্যের বরাদ্দের কতটা আসলে চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় হয়, কেন্দ্রীয় অনুদানের কত অংশ ফেরত যায় ইত্যাদি বিষয় জানা গেলে তবেই কৃতিত্বের প্রশংসা করা সঙ্গত হবে। কিন্তু এইক্ষেত্রে মুখ্য বিষয় হচ্ছে অগ্রাধিকারের প্রশ্নটি অজেয়া সরকার দুঃখ করেছেন, "ভিটামিন এ-র অভাবে অন্ধ হয়ে যাওয়া শিশুর সংখ্যা বছরে ৪০ হাজার।" এই ভিটামিন এ-র খরচ পড়বে শিশুপ্রতি মাসে ১০ পয়সা।

হাসপাতালে ডাক্তারদের কর্তব্য সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা হয়েছে এবং আমরা আরো অনেক কথা শুনেও থাকি। কিন্তু এ নিয়ে আজ পর্যন্ত কিছু করা হলো না—করার কথা কোনো সরকার ভাবেন নি। এমন কি—এ নিয়ে একটা তথ্যানুসন্ধানী তদন্ত পর্যন্ত হলো না। ডাক্তাররা কর্তব্যে অবহেলা করেন সুতরাং রাজ্য সরকারের দুর্নীতি ও অপচয়ের অধিকার আছে—এ যুক্তিটা নিশ্চয়ই অসঙ্গত। কিন্তু বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে এটা বলা যায় যে হাসপাতালই একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান যেখানে কিছুটা সত্যিকারের কাজ হয়। যে আউটডোরে ১০০ রোগীর চিকিৎসার সংস্থান আছে সেখানে ৩০০ রোগীর চিকিৎসা হচ্ছে। যে ইনডোরে ১০০টি শয্যা আছে সেখানে গড়ে ১৫০টি রোগী ভর্তি থাকেন। জানিনা এমন কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান আছে কি না যেখানে সামর্থ্যের অর্ধেক কাজও হয়। অবশ্য এই অবস্থায় চিকিৎসার মান কি দাঁড়ায় তা সকলেই অনুমান করতে পারেন। অজেয়া সরকারকে যিনি বলেছেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভালোভাবে কাজ চালাতে গেলে ২জন ডাক্তার, ৩জন নার্স, ৩/৪ জন স্বাস্থ্যকর্মী চাই—তার মন্তব্য ভুল ও অজ্ঞতাপ্রসূত। কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শয্যা ১টি থাক বা ৫০টি থাক—ভালোভাবে কাজ চালাতে গেলে ন্যূনপক্ষে ৪জন ডাক্তার, ৪জন নার্স, ১জন পাবলিক হেলথ নার্স ও ৮ জন স্বাস্থ্যকর্মী চাই। ডাক্তাররা প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টাই কাজে নিযুক্ত থাকবেন এবং ক্যালেণ্ডারের লাল দাগ তাদের জন্য নয়। কিন্তু যার কোনো নির্দিষ্ট duty hours নেই সে ঠিক সময়ে হাসপাতালে আসে না—এ অভিযোগটা কি সঙ্গত? আসলে হাসপাতাল পরিচালনা বিষয়ে কোন লক্ষ্য ও নীতি নেই। কোন হাসপাতালে কি কি বিভাগ থাকবে, কতজন কর্মী থাকবে, কতজনের চিকিৎসা হবে, কার কর্তব্য কি ও কতটা—এসব কথা কেউ জানে না। কোন referral systemও নেই। হাসপাতাল নিয়ে এত হৈ চৈ কিন্তু হাসপাতালের সমস্যা দেখাশোনা করার জন্য কোনো অফিসার মহাকরণে নেই। তবে কি কোন প্রশাসন নেই। আছে। প্রশাসনের নীতি নির্ধারণ ও হুকুমজারীর ক্ষমতা সচিব পর্যায়ের অ-ডাক্তার আমলাদের হাতে। এই সচিবরা আসেন, যান। স্বাস্থ্যদপ্তরে থাকাকালীন তারা সরকারি খরচে বিদেশ যান স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার নানা বিষয়ে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে। এবং অর্জিত হলে ফিরে এসেই অন্য দপ্তরে বদলি হয়ে যান। বিশ্বাস করুন—কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট উভয় আমলেই এই চলছে। ডাঃ অশোক মিত্রের নেতৃত্বে 'প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি' চিকিৎসকের হাতে প্রশাসনিক দায়িত্বভার দেবার জন্য সুপারিশ করেছেন এই সুপারিশ কার্যে রূপায়িত হলে খুব অবাক হয়ে যাব।

অজেয়া সরকারের অভিযোগ যে তার দুটি প্রশ্নের উত্তর কোনো ডাক্তার দিতে পারেননি (১) স্বাস্থ্যখাতের মোটা খরচটা গ্রামাঞ্চলে ও শহরের বস্তিতে রোগ প্রতিষেধে হওয়া উচিত, না কলকাতার বড় হাসপাতালে ২৪ ঘণ্টা ই.সি.জি. একসরে মেশিনের জন্য হবে? (২) যতদিন না স্বাস্থ্যকেন্দ্রে MBBS ডাক্তারের উপযুক্ত সাজ সরঞ্জাম দেয়া যাচ্ছে ততদিন ৩ বছরের সংক্ষিপ্ত ডাক্তার

দিয়ে সাধারণ চিকিৎসার কাজ চালাতে ক্ষতি কি?—এইসব পুরোনো প্রচলিত প্রশ্নের উত্তর কেন পাননি তা দুর্বোধ্য। যাই হোক, উত্তরটা শুনুন। আমাদের বক্তব্য—অগ্রাধিকার দিতে হবে জনস্বাস্থ্যের কাজে এবং অবশ্যই গ্রামাঞ্চল ও শহরের বস্তির দরিদ্র মানুষের প্রয়োজনে। তাই আমরা দাবি করছি যে সরকারি চিকিৎসা শুধুমাত্র দরিদ্রদের বিনামূল্যে দিতে হবে এবং ফলে যে অর্থের সাশ্রয় হবে তা জনস্বাস্থ্যের কাজে লাগাতে হবে। তবে কি জুনিয়র ডাক্তারদের ২৪ ঘণ্টা ই.সি.জি, একস্‌রে-র দাবিটা ভুল? না, তাও নয়। ওগুলো দরকার উচ্চতর হাসপাতালে উচ্চমানের জরুরী চিকিৎসার জন্য এবং ঐ দরিদ্রদের জন্যই। সংক্ষিপ্ত ডাক্তার সম্পর্কে অজেয়া সরকারের তথ্য খুবই সীমাবদ্ধ। এ বিষয়ে রাজ্য সরকার প্রকাশিত পুস্তিকাটি অন্তত পড়ে দেখা উচিত ছিল। এতে বলা হয়েছে—গ্রামাঞ্চলে MBBS ডাক্তারের অভাবের জন্য সংক্ষিপ্ত ডাক্তার তৈরী করা হচ্ছে না—করা হচ্ছে তাদের দিয়ে জনস্বাস্থ্যের কাজ করানোর উদ্দেশ্যে। অথচ এই বক্তব্যের পরেও নানারকম মজার ও ভণ্ডামির ব্যাপার আছে। সংক্ষিপ্ত কোর্সে জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে যেটুকু শিক্ষা দেয়া হচ্ছে MBBS কোর্সে তার তিনগুণ শিক্ষা দেয়া হয়। বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমাদের বলেছেন যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজকর্ম এখন আর জনস্বাস্থ্যমুখীন করা সম্ভব নয়, কারণ করতে গেলে এম-এল-এরা চটে যাবেন। এম-এল-এরা চিকিৎসাটাই চান। সরকার আরো বলেছেন যে সংক্ষিপ্ত ডাক্তারদের জন্য Condensed MBBS কোর্স খুলবেন অর্থাৎ খিড়কীর দরজা দিয়ে সেই কুখ্যাত MBBS ডাক্তারই তৈরী করা হবে। এই সংক্ষিপ্ত ডাক্তাররা যে গ্রামেই চাকুরি নেবেন এমন কোন বাধ্যবাধকতাও নেই। এবং এই মুহূর্তে প্রায় তিন হাজার MBBS ডাক্তার যে কোনো গ্রামাঞ্চলে চাকুরির জন্য আবেদন করে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কারো নজরে আসেনি। সারা বিশ্বের স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা একবাক্যে বলেছেন যে জনস্বাস্থ্যের কাজের জন্য ডাক্তারের কোনো প্রয়োজন নেই—শিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীরাই তা করতে পারেন এবং করেন। কিন্তু রাজ্যসরকার ডাক্তারের সংখ্যাই বাড়িয়ে চলেছেন, স্বাস্থ্যকর্মী শিক্ষণ প্রসারের দিকে কোনো নজর নেই। চিকিৎসার ক্ষেত্রেও গ্রামদরদের একটা নমুনা দেয়া যায়। গ্রামে বাস করেন শতকরা ৭৫ জন লোক কিন্তু সরকারি হাসপাতালের শয্যাসংখ্যার শতকরা ৭৫টি শহরাঞ্চলে।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলির অজ্ঞতা ও অনীহা এবং জনসাধারণের বঞ্চনার চিত্রটি সকলের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন সংগঠিত চিকিৎসক সমাজ। আন্দোলনে ভুলত্রুটি থাকতে পারে কিন্তু ঘুনধরা মানবিকতার দোহাই তুলে চিকিৎসক সমাজের নিন্দা করে তিনকড়ি দাশ, হারাধন নস্কর, রওসন আলি বা পরান মণ্ডলদের জন্য কিছু করা যাবে না। এদের সত্যিই কিছুটা উপকার হবে যদি ১ কোটি টাকা দামের CAT-Scanner মেশিন ভি-আই-পিদের জন্য পি জি হাসপাতালে না বসিয়ে ঐ টাকায় ২০০টি পোর্টেবল এক্সরে মেশিন গ্রামাঞ্চলে বসানো হয়।

শরীরের ডাক্তার, তোমার মন নাই? আছে, আছে। তাইতো ডাক্তাররা চিরকাল মানবিক কাজকর্মে যুক্ত থাকেন। অতি অর্থপিশাচ ডাক্তারও প্রতিদিন বিনামূল্যে কিছু রোগীর চিকিৎসা করেন নানা চ্যারিটেবল, সমাজকল্যাণ মূলক কাজে লেগে থাকেন। কিন্তু সেই মন দিয়েই আজ বুঝতে পারছি ভেজাল মানবিকতার অবেদনে কখনো কোনো বড় কাজ হয়নি, আজও হবে না। সেই মনটাই সাহায্য করেছে অজ্ঞতাকে চিনে নিতে, ভণ্ডামির মুখোসকে উন্মুক্ত করতে। আবেগের প্রলেপে আজ আর কোনো কাজ হবে না। বাস্তবকে চিনে নিয়ে, নির্ভয়ে অপ্রিয় কাজ করার সাহস রেখে পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতে হবে সংগঠিত মানুষের সাহায্য নিয়ে। তবে যদি কিছু হয়।

ডাঃ সুজিত কুমার দাশ
ভাইস-প্রেসিডেন্ট
হেলথ সার্ভিসেস এ্যাসোসিয়েশন, ওয়েষ্ট বেঙ্গল

রঘনাথ রায়না

আমদানী-রপ্তানী নীতি

কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমদানীর ক্ষেত্রে, বিশেষ করে নতুন প্রযুক্তি ও 'ক্যাপিটাল গুডস'-এর বেলায়, এবারকার ১৯৮৪-৮৫ সালের আমদানী-রপ্তানী নীতিতে বড় রকম সুবিধে দেওয়া হয়েছে। এমনটাই আশা করা গিয়েছিল। এই উদার আমদানী নীতি ছ'বছর আগে চালু করা হয়েছিল, শেষ দুবছরে তা আরও গতি পেয়েছে।

এই নীতিতে ত্রুটি যাই থাকুক না কেন, সরকারেরও এ ছাড়া কোনো রাস্তা নেই। বর্তমান পরিকল্পনায় শিল্প বিকাশের হার লক্ষ্যের অনেক পেছনে। এই বিকাশের হারকে দ্রুত করতে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। বর্তমান নীতি তৈরি করবার আগে সরকারকে উৎসাহিত করেছে বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারের উন্নতি ও বার্ষিক বাণিজ্যিক ঘাটতির হ্রাস।

বর্তমান নীতি নির্ধারণে তাই নতুন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা আবিষ্কারের চেষ্টা আছে, যেসব এলাকাতে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে 'ওপন জেনারেল লাইসেন্স' অনুযায়ী প্রযুক্তি আমদানী করার অনুমতিও দেওয়া হবে বলে জানা গেছে। 'ওপন জেনারেল লাইসেন্স'-এর সুবিধে নিয়ে যে ১৫ টি বিভিন্ন ধরনের জিনিস আমদানী করা হয়, তার বাইরেও আরও নানা রকমের দ্রব্য আমদানী করা যাবে। যেমন ইলেকট্রনিক শিল্পের জন্য মেশিনপত্র, ল্যাম্প বানাবার নানা উপকরণ, সিনেমার বিভিন্ন জিনিস, এবং বস্ত্র ও হোসিয়ারি শিল্পের মতো রপ্তানী-নির্ভর ও কিছু ক্ষুদ্র শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানীর সুবিধে হচ্ছে বর্তমান নীতিতে।

যেসব কোম্পানী উৎপাদনের বেশির ভাগই রপ্তানী করে থাকে, তাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানী করা সহজ হবে ; বৈদেশিক মুদ্রা আয়কারী সংস্থাগুলো আমদানী করা কাঁচা মাল পাবে এবং প্রতিষ্ঠিত রপ্তানীকারকদের 'ক্যাপিটাল গুডস' আমদানীর সীমাও বাড়ানো হচ্ছে। রপ্তানী বাড়াবার জন্যও নানা ব্যবস্থা আছে এই নতুন নীতিতে। এই সুবিধেগুলো প্রধানত কম্পিউটার সংক্রান্ত মাল ও গয়নাগাঁটির কারবার যাঁরা করেন, তাঁদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই দেওয়া। ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতির জন্য এখন ন্যাশনাল স্মল-স্কেল ইনড্রাসট্রিজ করপোরেশন ও স্টেট স্মল ইনড্রাসট্রিজ ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনকে মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য 'ক্যাপিটাল গুডস' আমদানী করবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

শিল্পের বিকাশ ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সব উপাদানই বর্তমান আমদানী-রপ্তানী নীতিতে আছে। এখন যে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা চলছে, তাতে এই নীতি অনুসরণ করলে উৎপাদন ও রপ্তানীর নানা চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। সমস্যা হলো, অতীতে শিল্পজগৎ এধরনের সুযোগ সুবিধে কাজে লাগায় নি। এবার কি তারা এই নীতিকে ঠিকভাবে ব্যবহার করবে ?

বড় ব্যবসার ব্যর্থতা

স্বয়ং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এমন একটা ধারণা তৈরি করেছেন। ৬ এপ্রিল, ফিক্কি-র মিটিঙে ভাষণ দেবার সময় প্রণব মুখোপাধ্যায় কাউকেই ছেড়ে কথা বলেন নি। দেশে অনুকূল অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও সরকারের সব রকম সাহায্য সত্ত্বেও শিল্পক্ষেত্রে কাজকর্ম ভালো হচ্ছে না বলে তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। গত চার বছর ধরে, তিনি বলেন, বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে সরকার সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উৎসাহিত করবার চেষ্টা করছেন। বিশেষ বিশেষ শিল্পের বিশেষ ধরনের সমস্যা মেটাতেও আলাদা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। লাইসেন্স দেবার পদ্ধতি এখন অনেক উদার ও সহজে ঋণও পাওয়া যায়।

তবুও শিল্পোৎপাদনের হার বাড়ছে না—১৯৮১-৮২ সালে ৮·৬ শতাংশ থেকে কমে তা ১৯৮২-৮৩ সালে হয়েছে ৩·৯ শতাংশ। ১৯৮৩-৮৪ সালে এই হার সামান্য বাড়লেও তা লক্ষ্যের অনেক পেছনে। শ্রী মুখোপাধ্যায় মনে করেন, সাহায্য ও অনুদান দেওয়া সত্ত্বেও এই ব্যাহত বৃদ্ধির কারণ প্রধানত পুরোনো ও নতুন শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে বর্তমানে অচল প্রযুক্তির ব্যবহার। এটা কিন্তু অনেকগুলো কারণের ভেতর একটা। অর্থমন্ত্রীর অন্য কারণগুলোও বলা উচিত। আরও দুটো বিষয় অবশ্য তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, যদিও একচেটিয়া ব্যবসার ওপর নিয়ন্ত্রণ ভালো না, কিন্তু অর্থনীতির সমস্ত লাভ মাত্র কিছু হাতে জমা না হবার বিশ্বাসের ওপরই সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভরশীল—অন্তত ভারতবর্ষের মতো দেশে এমন বিশ্বাস ছাড়া উন্নতি সম্ভব নয়। এছাড়াও, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সংস্থাগুলোর কাজকর্মের প্রতি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো উদাসীনও থাকতে পারে না। তাদের কাজ তো শুধু অর্থ যোগান দেওয়া নয়। দৈনন্দিন কাজে নাক না গলালেও সাধারণ মানুষদের স্বার্থরক্ষা করতেই হবে এই সংস্থাগুলোকে।

ঘাটতি বাজেটের বিপদ

কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নিজে জনগণের স্বার্থ দেখছেন তো ? তাঁর নিজের দলের সরকারের ঘাটতি বাজেট পরিকল্পনা দেখলে তা মনে হয় না। গোটা ষষ্ঠ পরিকল্পনায় মোট ঘাটতির আনুমানিক পরিমাণ ধরা হয়েছিল ৫,০০০ কোটি টাকা। কিন্তু কেন্দ্র, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর মোট ঘাটতির পরিমাণ ষষ্ঠ পরিকল্পনার প্রথম দুবছরেই ৫,৯৭০ কোটি টাকায় দাঁড়ায় অর্থাৎ পুরো পাঁচ বছরের ঘাটতির চেয়ে ১,০০০ কোটি টাকা বেশি।

ঘাটতি বাজেটেই অর্থনীতির এই ক্ষতি হচ্ছে। অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাওয়ায় জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। এই যোগান বৃদ্ধির পরিমাণ ১৯৮০-র ৪৭,২২৬ কোটি টাকা থেকে ১৯৮৪-র জানুয়ারি পর্যন্ত ৮৩,৮৬৫ কোটি টাকা। অন্যদিকে জি· ডি· পি· বেড়েছে ১৯৮০-৮১ সালে ৫০,৬০৩ কোটি টাকা থেকে ১৯৮২-৮৩ সালে ৫৪,১৮৭ কোটি টাকায়। ১৯৮৩-৮৪ সালে জি· ডি· পি· বেড়ে ৫৭,৭০৯ কোটি টাকা হবে বলে অনুমান। শ্রী মুখোপাধ্যায় যদি তাঁর নিজের দপ্তরের অর্থনৈতিক সমীক্ষাটি আর একবার দেখেন, তো বুঝতে পারবেন বোধ হয় যে, সার্ভে বলছে, ভবিষ্যতে সরকারি পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোতে উদ্বৃত্ত আরও বাড়াতে হবে। বর্তমান সুযোগ সুবিধেগুলো ও সংস্থান সপ্তম পরিকল্পনাতে আরও বেশি করে কাজে লাগানো দরকার। মূলধন খুব একটা লাগবে না এমন দ্রুত সম্পন্ন করবার মতো ও উচ্চ উৎপাদনশীল প্রকল্পে হাত দেওয়া খুব প্রয়োজন। সরকারি সংস্থার শিল্পোদ্যোগের মূল কাঠামোকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। কৃষি উৎপাদন ও বিকাশের গুরুত্ব অপরিসীম। অসুস্থ শিল্প সংস্থাগুলোকে তুলে দেওয়াই ভালো। এবং দক্ষ পরিচালনায় ও· এন· জি· সি·-র মতো সরকারি সংস্থার সুফলগুলোকে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে।

ইস্পাত বিষয়ক

অর্থনৈতিক সমীক্ষার এই প্রস্তাবগুলো যে ঠিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না, তার প্রমাণ ইস্পাত শিল্পের চেহারা। স্টীল অথরিটি অব ইণ্ডিয়া (সেইল) বোধ হয় ১৯৮৩-৮৪ সালে গত বছরের ১০৫ কোটি টাকা ক্ষতির দ্বিগুণ ক্ষতি দেখাবে। এর কারণ অবশ্য ভিলাই ও বোকারোয় বিরাট সম্প্রসারণ ও রাউরকেল্লায় সিলিকন প্রকল্প বসাবার সিদ্ধান্ত। এগুলো থেকে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে এই বিশাল ক্ষতির পরিমাণ অবশ্য কমেই আসবে। শুধু কয়লার দাম বাড়ছে বলেই উৎপাদন ব্যয় বাড়ছে—একথা ঠিক না, আরও কারণ আছে—অপ্রচলিত উৎপাদন পদ্ধতি, বেশি মাত্রায় লোক নিয়োগ ও অবৈজ্ঞানিক পরিচালনা।

১৯৮৩-৮৪ সালের সংশোধিত লক্ষ্যের (৪·৫ মিলিয়ন টন) মাত্রা ছাড়িয়ে ইস্পাত উৎপাদন ৪·৭ মিলিয়ন টন ছুঁয়েছে বলে অনেক কথা বলা হয়। মনে রাখা দরকার যে মূল লক্ষ্য কিন্তু ছিল ৫·৪ মিলিয়ন টন। সে লক্ষ্যে পৌছুতে ৯৬ শতাংশ ক্ষমতা ব্যবহার প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে না পৌছুলে লাভের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। □

রথীন মিত্রের কলকাতা
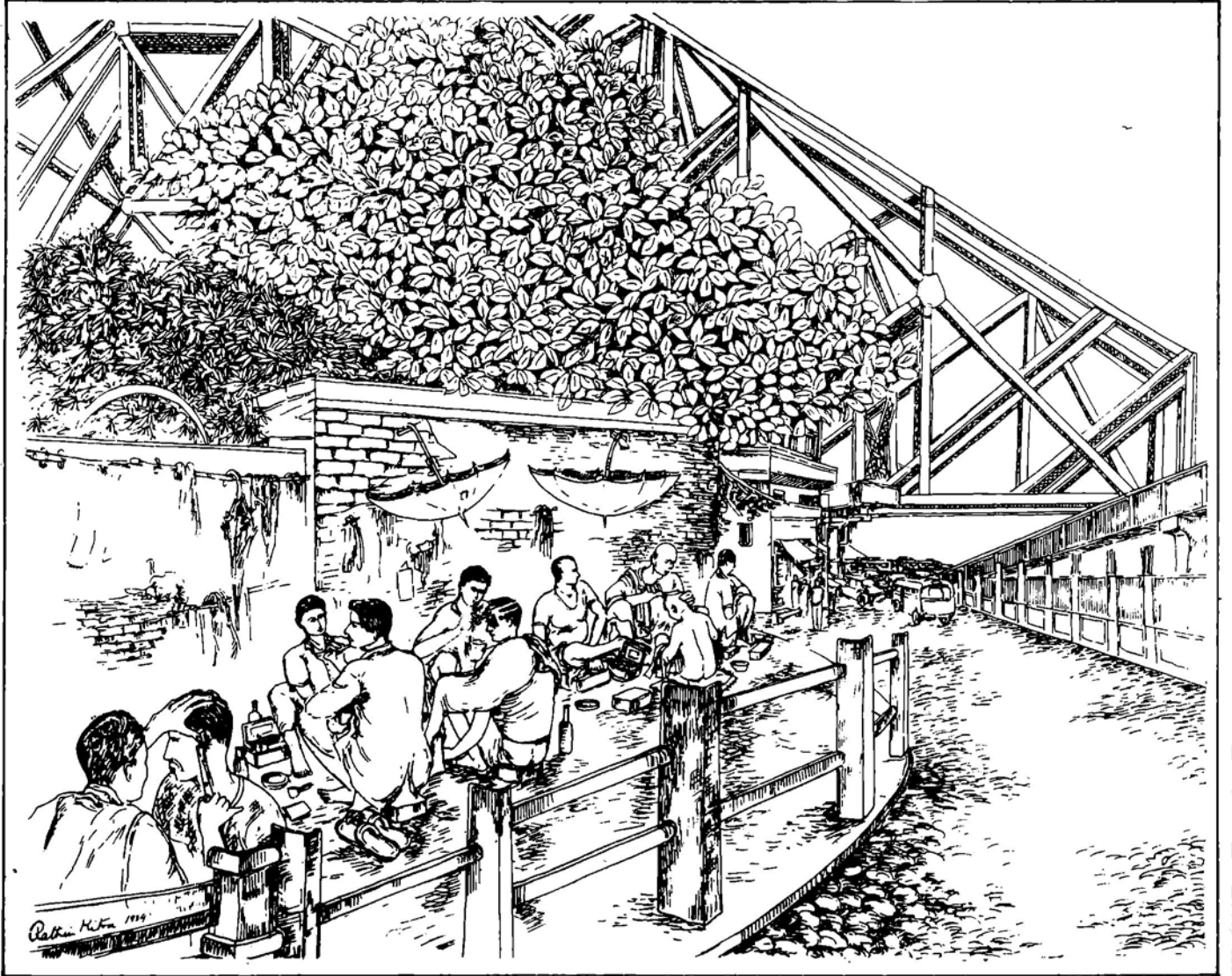
হাওড়া পুলের মুখে, বড়বাজারের উড়াল-পুলের চারপাশে প্রায় সব সময়েই যান-জট। কিন্তু কোনো ছুটি-ছাটার দিনে এসে পড়লে আপনার চোখে পড়বে ইটের উপরে বসা নাপিতের সারি। রসিকজনেরা যাদের নাম দিয়েছেন-ইটালীয়ান বারবার। কলকাতার এই এক মস্ত গুন। হাতে-কলমে কারু কোনো কাজ জানা থাকলে রুজি-রোজগারের হাজার রাস্তা খোলা। এই ইটালীয়ান বারবারদের দিকেই তাকানো যাক। সরঞ্জাম বলতে কি আর এমন। ক্ষুর, কাঁচি, চিরুনি, সাবান, ব্রাশ, আর খানিকটা ডেটল-গোলা জল আর ছোট্ট একটা হাত-আয়না। না, বাকি রয়ে গেছে আরো একটা আসবাব। থান ইট। বড়বাজারের মল্লিক ঘাটের কাছে ফুটপাতে ঢালাও ব্যবসা। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ, এসব উপলক্ষ তো আছেই। জামাইষষ্ঠীতে ট্রেন-ধরার জন্যে ছুটন্ত জামাইরাও ঐ থান ইটে বসে পড়ে কখনো কখনো। রেট সেলুনেরই গা-ছোঁয়া। দাড়ি কামালে ৫০ পয়সা। চুল কাটতে দু'টাকা। দুটো এক সঙ্গে হলে খানিকটা দরদস্তুর খাটে।

দূরে, পটভূমিকায় হাওড়া পুল। এই ক্যান্টিলিভার ধরনের পুলটির গড়া শুরু হয়েছিল ১৯৩৭-এ। শেষ ১৯৪৩-এ। গঙ্গার এপার-ওপার মিলিয়ে হাজার পেশার এমনই ঘনঘটা, তুলি ক্যানভাস নিয়ে দাঁড়ালেই চমৎকার সমাজচিত্র। □

কাজে ফাঁকি : একটি জাতীয় প্রবণতা

প্রয়াত যুবনেতা সঞ্জয় গান্ধী বিখ্যাত হয়েছিলেন একটি স্লোগানে—'কথা কম কাজ বেশি'। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সরকারি কর্মচারীদের কাজের ক্ষেত্রে অনীহা প্রকাশে বিব্রত হয়ে, কিছুদিন আগে এক রুষ্ট বিবৃতি দিয়েছেন। দিল্লির নিজস্ব দপ্তর থেকে এবং দেশব্যাপী বিভিন্ন জনসমাবেশ ও সেমিনারে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীর কাছে ঠিকমতো কাজ করার জন্য, আরও পরিশ্রম করার জন্য, প্রায়ই আহ্বান জানান। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন ক্ষেত্রেই কাজে উৎসাহদায়কপদ্ধতি ও পরিকল্পনার অভাব নেই এদেশে। কিন্তু চারদিকে কাজের আহ্বান থাকা সত্ত্বেও আমরা মূক, বধির এবং কাজে অনীহা প্রকাশে তৎপর। তাই দুকোটি নথিভুক্ত বেকারের দেশ ভারতবর্ষেও কাজে ফাঁকি দেওয়াটা এক অন্যতম সমস্যা শুধু নয়, আরও অসংখ্য সমস্যার জনক। যেকোনো কাজের ক্ষেত্রে অপরকে দায়ী করাই আমাদের প্রাথমিক কাজ। অন্যের সাহায্য প্রত্যাশায় আপাদমস্তক অভ্যস্ত আমাদের জীবনে আত্মনির্ভরশীলতা এখন বিবাহের বেনারসী, কালেভদ্রে যার উপলব্ধি ও প্রকাশ। এই সাহায্য প্রত্যাশী মনোভাব পারিবারিক ও সামাজিক দুটি ক্ষেত্রকেই যেমন জর্জরিত করে, তেমনি জাতীয় জীবনের দিকেও মেলে ধরে তার অলুক্ষুণে থাবা। সন্দেহ নেই এই মনোভাবের মূলে রয়েছে এদেশের ধর্ম ও সনাতন ধ্যানধারণা। যা কিছু নিজে করবার তার সব দায় ঈশ্বরের ওপর চাপিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত ও নিদ্রিত। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, দেশের নেতারাও এই প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন না। 'জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি'—এই বাক্য আফিমের মতো আমাদের জীবনবোধকে আচ্ছন্ন করে, আমাদের নিষ্কর্মা করে। 'ওপরওয়ালাই সব করেন ও করান'—এই ভ্রান্তবিশ্বাস জন্মলগ্ন থেকেই আমাদের শিরায়-শোণিতে প্রবিষ্ট হয়ে যায়, আমরা কাজে ফাঁকি দিই। আত্মনির্ভরশীলতার বদলে ছোটবেলা থেকেই আমাদের সবচেয়ে বড় শিক্ষা—গুরুজনকে মান্য করার শিক্ষা। আমার উদ্দেশ্য নয় বয়স্কদের আদেশ অমান্য করার কথা বলা। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই গুরুজনদের মুখের দিকে চেয়ে থাকার ওই প্রবণতা মৃত্যুশয্যাতেও আমাদের সঙ্গ ছাড়ে না। এদেশের একান্নবর্তী পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠ কেউ থাকলে কোনও ব্যাপারে এমনকী বয়স্করাও নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। তা নাকি অসৌজন্যের প্রকাশক। বাড়ির কর্তাদের থাকা চাই একজন করে গুরু। কোনও কাজে হাত দেবার আগে গুরুর চরণস্পর্শ করা এদেশের জননেতাদেরও নিত্য ও অবশ্যকর্ম। এভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আত্মনির্ভরশীলতার বীজটাই।

ধর্মীয় ও সমাজরীতির এই অশুভ ঐতিহ্যের প্রভাব জনমানসে অসীম। সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর আজানুলম্বিত ছায়ার বিস্তার। রাজনীতির দিক থেকে বিচার করলেও, এদেশে, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা অসহযোগ আন্দোলনের যত তাড়াতাড়ি গড়ে ওঠা, গঠনমূলক আন্দোলনের ঠিক ততটাই অসাফল্য। সম্পাদনায় আমাদের যে পরিমাণ পরমুখাপেক্ষা এবং অক্ষমতা প্রকাশের নগ্নতা, সমালোচনায় আমাদের মগ্নতা তার চেয়ে অনেক বেশি। এ ধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে, অফিসে দপ্তরে নিযুক্ত কর্মচারীরাও যে কাজে ফাঁকি দেবেন এতে আর আশ্চর্যের কি আছে? অপব্যবহৃত সময়ের পরিমাণ কর্মব্যস্ত সময়ের চেয়ে বেশি হয়ে গেলেও, সব দোষই কর্মচারীদের দেওয়া যায় না। প্রথমত সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব, দ্বিতীয়ত জলবায়ুর প্রভাব আমরা অস্বীকার করতে পারি না। প্রথমটির সঙ্গে সমাজবিপ্লবের প্রশ্ন জড়িত কাজেই সে আলোচনা থাক। কিন্তু ভৌগোলিক অসুবিধা দূর করতে বহু জায়গায় তাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ব্যবহার করা সত্ত্বেও স্বভাবের তেমন পরিবর্তন হচ্ছে কই? কর্মপদ্ধতির আধুনিকীকরণকেও আমরা প্রাণ খুলে স্বাগত জানাচ্ছি না। এর জন্য দায়ী যেমন কর্তৃপক্ষের পুরাতনের প্রতি অনুরাগ, তেমনি নতুনের ব্যাপারে

আতঙ্ক। স্বাধীনভাবে কাজ করার মানসিকতাকে এদেশে আদৌ প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। 'যেমন চলছে তেমনি চলুক, কি দরকার ঝামেলা করে'—এই মনোভাব এদেশের মাটির তলায় গড়ে নিয়েছে শক্ত ভিত। গতানুগতিকতা, কাজকে রসহীন নিরানন্দময় করে তোলার ফলে কর্মচারীরা উৎসাহ হারায়, কাজের মধ্যেও যে বৈচিত্র্যজনিত আনন্দ আছে এবং সেই পথেও যে ফাঁকির প্রবণতা দূর করা সম্ভব, এটা ভাবেন কজন?

কাজের পরিবেশকে সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর এবং অবকাশকে সুষম করাও দরকার। বাতাসকে পরম সূর্যকরোজ্জ্বল তো রাখতেই হবে। দিনের অধিকাংশ সময় যেখানে কাটাব, তার পরিবেশ সম্পর্কে উদাসীন থাকা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আর ঠিক এই দিকটি বিবেচনা করেই তো কর্মী-মানুষ আর কলুর বলদের মধ্যে উপমাগত পার্থক্য রেখাটি টানা হয়। কর্মচারীদের মনে স্বত্ববোধ জাগানোও এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। 'এ জিনিস আমার'—এই মনোভাব গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গিতে আসে মৌলিক পার্থক্য। যে সংস্থায় মানুষ কাজ করে তার উন্নতি-অবনতির সঙ্গে, পরিচালনার সঙ্গে যদি সে নিজেকেও যুক্ত মনে করে, তবে সেই সংস্থার উন্নতির জন্য সে নিজেই সচেষ্ট হবে। একাজ শুধু বিজ্ঞাপনের দ্বারা সম্ভব নয়। এছাড়া একটু মর্যাদা ও যথাযথ ভূমিকা পালনের জন্য কমবেশি প্রত্যেক মানুষই প্রত্যাশী। এটাও যথাযথ বজায় রাখা প্রয়োজন

বর্তমানের জটিল সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে, গভীর গভীরতর অসুস্থতায় কোনও সমস্যারই সহজ সমাধান আশা করা ভুল। কিন্তু সামগ্রিক পরিস্থিতি সচেতন হলে এবং পরিবর্তনকে মেনে নেবার মানসিক সুস্থতা থাকলে কোনও সমস্যাই অনতিক্রম্য থাকে না। কাজে ফাঁকির সমস্যাটিরও সমাধান হবে। আজ এখুনি না হলেও ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে।

অনিশ্চয় চক্রবর্তী

আমার ভোরবেলা

আমার বাবার নাকি 'ভোরের দয়েল পাখি' ছিল। হয়ত 'শ্যামার নরম গান' শুনেছিলেন। মেঘনার চরে বালিহাঁসের ঝাঁক শুনে তাঁর বাল্য-কৈশোর কেটেছে। মা-ও বলতেন সেই চৈতালি দুপুরের কথা। সেই নদীতীর-নির্জন গ্রাম, মানুষ সেখানে নাকি অনেক বেশি মানুষ ছিল। আমার যখন জন্ম হলো তখন চীন-ভারতের যুদ্ধ চলছে জোরদার। কবির ভাষায়, 'জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি'। মধ্যরাতের কালো শহরে আতঙ্ক, উত্তেজনা, সীমান্তে পাঁজর ফাটানো চিৎকার, এ সবই হয়ত ছিল। আর এই অশান্তি, অস্থিরতার মাঝেই ধীরে ধীরে আমার চোখ ফুটল, মুখ ফুটল। কলকাতা শহরের ধুলোভরা বাতাস আর ধোঁয়াটে ময়লা আকাশ দেখতে দেখতে তিনতলার উপর দশ বাই বারোর একটা ঘরে বসে আমার মা প্রায়ই বলতেন, আমার নাকি এখানে থাকার কথা নয়। কেন ? তা অবশ্য আমি প্রশ্ন করিনি। বাধ্য ছেলের মতো শুধু শুনে যেতাম, পদ্মা নামে নাকি একটা বিরাট চওড়া নদী আছে, তার ওপারে সে অনেক দূরে একটা গ্রাম, একটা জামরুল গাছ, তার ছায়ায় তুলসিতলা, পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নার লুটোপুটি, কতফুল···পাখি···গান···। দশ বাই বারোর সেই ঘরের কাছেই একটা কারখানা ছিল। ওখানে নাকি গুলি-বন্দুক তৈরি হয়। পরে জেনেছি ওর নাম 'গান

এণ্ড শেল ফ্যাক্টরি'। সেই গোলা বারুদের কোম্পানির ভোর বেলাকার বিশ্রী আর্তনাদে আমার ঘুম ভাঙত রোজ। পেছনের মজা পুকুর, লোকে যাকে বলে হাবু গুণ্ডার পুকুর, তাতে একদল বাসন-মাজিয়ে আর যত রাজ্যের কাকের চিৎকার-চেঁচামেচি দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে আমার সেইসব ভোরবেলা আরও কিছুটা এগিয়ে যেত। ইট বালি-সিমেন্টের সেই ছোট্ট কুঠুরিতে বসে আমার দাদা সুর করে দুলে দুলে পাতা মুখস্থ করত

'পুকুর, মরাই, সবজি-বাগান, জংলা ডুরে শাড়ি,
তার মানেই তো বাড়ি,
তার মানেই তো প্রাণের মধ্যে প্রাণ
নিকিয়ে নেওয়া উঠোনখানি রোদ্দুরে টান্‌টান্।'

মনে ছিল হিজলের ছায়া, হট্টিটি পাখিদের গান। চোখে ছিল ধুলো, ধোঁয়া, সার সার ইটের পাঁজর। দুইয়ের মধ্যে ছিল বিরাট ফারাক। আর এই মস্তবড় ফারাক নিয়েই আস্তে আস্তে আরও কয়েকটা বছর কেটে গেল। এবার শুরু হল পালা বদল। একদল নাকি কীসব করতে চাইছে, আর একদল তাতে বাধা দিচ্ছে প্রাণপণে, তখন আমার সাত কি আট। খুন, রক্ত, লাশ আর গুণ্ডাবাজি, এদের সঙ্গে আমার পরিচিতি সেই বয়স থেকেই। সেই সময়েই একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে আমি মানুষকে প্রথম ছুরি চালাতে দেখি। চকচকে ফলাটার কিছুটা নরম মাংসের ভাঁজে লুকিয়ে পড়ল টুপ করে, অদূরে বোমা পড়ল দু-চারটে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল। আমি সেই ছোট্ট ছেলেটা কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরলাম। মা এখনও হেসে হেসে বলেন, এরপর নাকি দু-একদিন কিছু খেতে পারতাম না ভালো করে। ঘুমের মধ্যে চমকে জেগে উঠে দু-একদিন নাকি কেঁদেও ফেলেছি। সত্যিই, কী যে ভীতু ছিলাম। আর, সেই ভয়-মাখা দিনগুলো কিছুটা যেতে না যেতেই একদিন সকালে উঠে দেখি, জানলার কাছে বাবা খবরের কাগজ ঘাঁটছেন। বয়স তখন নয়-দশ। জানতে পারলাম, এবার নাকি ইছামতী-র ওপারে আবার যুদ্ধ লেগেছে। নির্দেশ এসেছে, রাত্রে শহর অন্ধকার করে দিতে হবে, ঘরের আলো যেন বাইরে না যায়। বোমা পড়তে পারে যে কোনো সময়। অন্তত আমাকে তাই বোঝানো হয়েছিল। তাই কাল্পনিক আতঙ্কে সন্ধের পর থেকে সময় কাটত এক পা এক পা করে। ভেসে উঠত সেই দৃশ্যটা—নির্জন রাস্তায় একটা রক্তমাখা লোক যন্ত্রণায় ছটফট করছে, আর একটা বাচ্চা ছেলে তাই দেখে ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

যাই হোক, অবশেষে একদিন বারুদের গন্ধ গা থেকে মুছে, ফুলদানিতে রজনীগন্ধা গুঁজে, মিঠে রোদে পিঠ রেখে বসতেই চমকে উঠে লক্ষ করলাম, আমার বাল্য-কৈশোর হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে।

কলমের আঁচড়ে সেই দিনের যে ছবি আঁকার চেষ্টা করলাম তা অবশ্য আমার ছেলেবেলার একমাত্র ছবি নয়। এর মাঝেই হয়ত কোনোদিন মেহগিনি গাছে নীলটুনি পাখি দেখেছি। আজ মনে নেই, হয়ত কোনোদিন ধনেফুলে মৌমাছির গানও শুনেছিলাম। কিন্তু গুটিকয় ফ্যাকাশে-ধূসর ছবি বাদে সেই সোনালি সৈকতের স্বপ্নিল সময়ের প্রায় সবটাই দুঃস্বপ্ন আর আতঙ্কের মাঝে কেটেছে। সর্বজনীন হিংসা, অবিশ্বাস যার ফলশ্রুতি হিসেবে অমানবিকতা আর নীচতার মধ্য দিয়ে আমি বড় হয়েছি।

এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আমি বা আমরা যদি চিৎকার করে বলি, তোমরা কেউ আমাদের একটা শান্ত শিশিরভেজা শৈশব ফিরিয়ে দাও, পারবে কি কেউ ? পারবে না। জীবন একটাই। শৈশব কৈশোরও একটা করে। তাই জানি মায়েরা যেমন স্বপ্নে ডুবে ভিজে গন্ধের সকাল আনত দু-একটা করে, আমাদের কেউ কোনোদিন আগামীদের কাছে সেরকম সবুজ চোখে বলতে পারবে না, 'আমার একটা নদী ছিল, আমার একটা পাহাড় ছিল।'

অর্জুন ভট্টাচার্য

সুদীপ্তা সেনগুপ্ত

'আমার দক্ষিণমেরু অভিযান

মেরুবিজয়িনী সুদীপ্তা সেনগুপ্ত
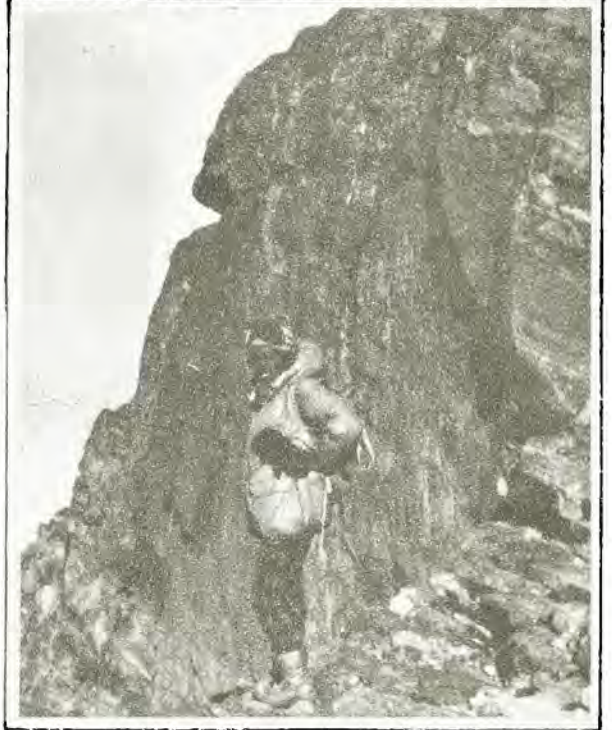
দক্ষিণ মেরুর পাথরের চরিত্র সন্ধানে ভারতের ভূতত্ত্ববিদ

নবনীতা দেবসেন

চায়ের প্লেটের চাইতে এক সাইজ বড় কোয়ার্টার প্লেট আপনার চোখ থেকে হাত খানেক দূরত্বে রাখলে যেমন দেখবেন, ২৫,০০০ মাইল ওপরে, আকাশের ওপারের আকাশ থেকে,নভশ্চররা পৃথিবীকে অবিরত তার নানা বিচিত্র অর্ধাংশে ঐ আকারেরই দেখতে পান।

দেখা যায়, পৃথিবীর 'ছাদ' উত্তর মেরুর মাঝখানে আর্কটিক মহাসাগরকে ঘিরে রেখেছে চারদিকের স্থলভূমি আর পৃথিবীর 'তল', দক্ষিণ মেরুর মাঝখানে আন্টার্কটিক মহাদেশকে ঘিরে রেখেছে চারদিকের মহাসমুদ্র। ইয়োরোপের স্থলভাগের চাইতেও আকারে বড় এক জনহীন ও প্রায় প্রাণীহীন এই হিমমহাদেশের সব দিগন্তেই সমুদ্র। সেই সমুদ্রদিগন্ত পেরিয়ে হাজার-হাজার মাইল দূরে তিন মহাদেশের আভাস। ২,৩৫০ মাইল পশ্চিমে লাতিন আমেরিকার দক্ষিণতম বিন্দু কেপ হর্ন আর ৩,৮০০ মাইল দূরে দক্ষিণতম শহর—বুয়েনস আয়ার্স। একই দূরত্বে ঈশানকোণে দক্ষিণতম আফ্রিকা, উত্তমাশা অন্তরীপ, কেপ টাউন বন্দর ও আফ্রিকার স্থলভাগের শুরু। অগ্নিকোণে নিউজিল্যাণ্ডের ক্রাইস্ট চার্চ ও তাসমানিয়ার হোবার্ট দক্ষিণ মেরুর নিকটতম দুই শহর—৩,২০০ মাইল দূরে।

দক্ষিণ মেরু ঘেরা এই সমুদ্র সারা বছরই প্রচণ্ড ঝঞ্ঝায় তোলপাড়। সমুদ্র তোলপাড় ঢেউয়ে-বরফে আর আকাশ তোলপাড় ঝড়ে।

সমুদ্র বা আকাশ জাহাজ বা প্লেনের জন্যে ব্যবহৃত হয় না।

এই ভয়ঙ্কর নির্বাসিত মহাদেশে তৃতীয় ভারতীয় অভিযাত্রী দলের সঙ্গে গিয়েছিলেন আমাদের কলকাতার সুদীপ্তা সেনগুপ্ত। তাঁর সেই অভিযানের কাহিনী তিনি 'প্রতিক্ষণ'কে বলেছেন।

কাগজে যেই দেখলুম তৃতীয় দক্ষিণ মেরু অভিযাত্রী দলে একজন মেয়েকে নেওয়া হয়েছে অমনি গর্বে আর হিংসেয় বুক ফেটে গেল। তারপর যখন শুনলুম সে মেয়ে বাঙালিনী, কলকাতারই বাসিন্দে, তথা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা, তখন বুঝলুম, হ্যাঁ লোকটা আমিই এবার হিংসের কিছু রইল না, এবার কেবলই গর্ব

একটু গর্ব, একটু ভয়, একটু উদ্বেগ, একটু ভালোবাসা মেশানো চোখে টেলিভিশনে 'ফিন পোলারিস-'এর যাত্রারম্ভ দেখছি—হঠাৎ দেখি সুদীপ্তা সেনগুপ্ত টি ভি সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। বাঃ এককথায় কেবল এই শব্দটিই মনে হয়েছিল। খুব সহজ, স্বচ্ছন্দ, প্রায়-কিশোরীর মতো অল্পবয়সী দেখতে, সত্যিই সুদীপ্তা বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, আত্ম প্রত্যয়ে দীপ্ত, অথচ নিরহংকার, স্বাভাবিক বিন্দুমাত্র দম্ভের চিহ্ন নেই এই প্রকৃত বিদুষী, প্রকৃত বিনয়ী তরুণী বিজ্ঞানীর মধ্যে। সুন্দর, সুস্থির ভাবে উত্তর দিলেন সব প্রশ্নের। খুব ভালো লাগল।

এইটুকুনি মেয়ে, সে কিনা নির্ভয়ে ওই কোন বিজন বিভূমে সুদূর কুমেরু মহাদেশে পাড়ি দিচ্ছে? মনে মনে একান্তভাবে প্রার্থনা করলুম, সুদীপ্তার বৈজ্ঞানিক তথ্য সন্ধান যেন সফল হয়। সুদীপ্তার শরীর যেন ভালো থাকে। ভারতবর্ষের মেয়ে, বাংলার মেয়ে, আমাদের সুদীপ্তার জয় হোক। তার যাত্রা শুভ হোক।

সেদিন ঠিক হলো ফ্যাকালটি ক্লাবে দক্ষিণ মেরু প্রত্যাগত সুদীপ্তা সেনগুপ্তকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে, যাদবপুরের শিক্ষক সভার পক্ষ থেকে। সুদীপ্তা এদিকে শুনে বলেছে সংবর্ধনা নিতে সে পারবে না, তার লজ্জা করবে। বরং কিছু স্লাইড দেখাবে সে। সুদীপ্তা যে নির্বিঘ্নে ফিরেছে দক্ষিণ মেরু জয় করে, সে খবর কাগজে পড়েছি।

আমাদের চেয়ে অনেক জুনিয়ার সুদীপ্তা, আমাদেরই সতীর্থ বন্ধুরা তার শিক্ষক ছিলেন যাদবপুরে। ইতিমধ্যে সকলের মুখেই শুনেছি সুদীপ্তার প্রশংসা। এতদিন কেন যে ওর কথা জানতুম না, তাই ভাবছি। যদি দক্ষিণ মেরুতে সে নাও যেত, তবুও সুদীপ্তা খুবই অসাধারণ মেয়ে। তাকে জানা উচিত ছিল, সহকর্মী হিসেবে সংবর্ধনা গ্রহণে তার সবিনয় অসম্মতি আরেকবার তার চরিত্রগুণ প্রকাশ করল

ফ্যাকালটি ক্লাবে গিয়ে দেখি গোলাপি শাড়ি, রং মেলানো জামায় রুমালটি পর্যন্ত গোলাপি, ঝাঁকড়াচুল ছোট একটি মেয়ে কিছু স্লাইড নাড়াচাড়া করছে আমাদের বন্ধু আনন্দদেব মুখোপাধ্যায় আলাপ করিয়ে দিলেন—"সুদীপ্তা, নবনীতা তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে ব্যাকুল। ওকে বলে দাও কী করে দক্ষিণ মেরুতে যেতে হয়।"

না, না, মোটেই হাসির কথা নয়। আমি সত্যি সত্যিই ভেবে রেখেছিলুম সুদীপ্তাকে জিগ্যেস করব কোনো উপায় আছে কিনা অভিযাত্রীদলের সঙ্গী হবার। রাঁধুনি-টাধুনি চাই না?

আনন্দ এভাবে ঠাট্টা করে বলায় সেটা আপাতত ভেস্তে গেল।

সুদীপ্তা কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে বললে, অনেকদিন আগে থেকেই সে আমার কথা জানে। আমার বাল্যবন্ধু বেবি, সুজয়া গুহ-র (যে ভারতীয় প্রথম নারী পর্বত অভিযাত্রীদলের নেত্রী হয়ে নন্দাঘুন্টি শিখরে যাচ্ছিল, পথে দুর্ঘটনায় মারা যায়। কমলা নামে আরেকটি মেয়েও সেই দুর্ঘটনায় চিরতরে হারিয়ে যায়) মুখে আমার গল্প অনেক শুনেছে সেই দুর্ঘটনার মধ্যে সুদীপ্তা নিজেও ছিল, কিন্তু ঈশ্বরকৃপায় বেঁচে যায়। সুদীপ্তা ভারতীয় মেয়ে-অভিযাত্রীদলের প্রথমযুগের এক উৎসাহী পার্বতী ছিল। সেই সূত্রেই নাকি তার দক্ষিণমেরু যাবার ইচ্ছে।

স্কটের জীবনী পড়েই সুদীপ্তার আগ্রহ জন্মায়, বিজ্ঞানী হিসেবে ততটা নয়, অভিযাত্রী হিসেবে যতটা।

সুদীপ্তার নিজের কথায় "অ্যাডভেঞ্চারের নেশাটাই বেশি ছিল" যেজন্যে সে নিজে থেকেই ভলান্টিয়ার করে দিল্লিতে ডঃ কাশিমের কাছে চিঠি লিখে জানিয়েছিল যে তৃতীয় কুমেরু অভিযানে যদি মেয়েদের নেওয়া হয়, তাহলে যেন সুদীপ্তার কথাটা ভাবা হয়। তার নিজের বায়োডেটাও সে পাঠিয়ে দিয়েছিল। যাদবপুরেরই অধ্যাপক ডঃ সুবীর দাসের পরামর্শে সুদীপ্তা দিল্লিতে ন্যাশনাল ফিজিকাল লেবরেটরিতে ডঃ এ· পি· মিত্রের সঙ্গে কথা বলে। তিনিই ঠিকানা দেন, যেখানে সুদীপ্তা আবেদনপত্র পাঠায়। এসব ঘটনা ৮২র মার্চে।

হঠাৎ তিরাশির জুনে চিঠি এল ইন্টারভিউ-এর ডাক দিল্লিতে। সুদীপ্তার মন নেচে উঠল। ইন্টারভিউতে জানা গেল আশিভাগই স্থির যে ওকে নেওয়া হবে। এখন মেডিক্যাল ইত্যাদি কিছু পরীক্ষা বাকি। তাতেও পাশ করে গেল সুদীপ্তা। এবারে হাই-অলটিচ্যুড ট্রেনিং ক্যাম্পে যেতে হবে।

ছোট ছোট তিনটি দলে ভাগ হয়ে লাদাখের মাচোই গ্লেশিয়ারে ক্যাম্প করে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় মিলিটারিদের মতন কড়া ট্রেনিং দেওয়া হল লেবরেটরিগতপ্রাণ বিজ্ঞানী মশাইদের।

সুদীপ্তা তো পাঁচ ছ'বার হিমালয়ে গেছে, গ্লেশিয়ারের অভিজ্ঞতা তার আছেই। তাছাড়া সুদীপ্তার পকেটে আরো মারাত্মক এক অস্ত্র আছে যে সে যখন সুইডেনের উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা করছিল, তখন International Geo-dynamics Project-এর গবেষণার জন্য বিজ্ঞানীদের একটি দল সুমেরু অভিযানে যায় উপসালা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সুদীপ্তাকেও সেই দলে তারা সুমেরুতে নিয়ে গিয়েছিল।

যে মেয়ের উত্তর মেরু ঘোরা আছে, এবং হিমালয়ে আরোহণ-অবরোহণের সরগম উত্তমরূপে রেওয়াজ করা আছে, দক্ষিণ মেরু অভিযানের পক্ষে তার চেয়ে যোগ্যতর আর কে

ভাবা যায়? দক্ষিণ কলকাতার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে সুদীপ্তা, সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল থেকে ১৯৬২তে সসম্মানে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে যাদবপুরে জিওলজি পড়তে ঢোকে। আগাগোড়া প্রথম

শৈলশিলার গায়ে এসে ভেঙে পড়েছে হিমবাহের কিনারা

শ্রেণী পেয়ে ১৯৬৭তে এম-এস-সি পাশ করে। পড়াশুনোর পর জিওলজিকাল সার্ভে অব ইনডিয়াতে বহুদিন রিসার্চ করেছে। ইতিমধ্যে পাঁচ বছর ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৮ সুদীপ্তার বিদেশে কেটেছিল, প্রথমে লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজে তিন বছর; তারপর সুইডেনের উপ্সালাতে 'ডোসেন্ট' (রীডারের সমতুল) পদে দু'বছর সেই সময়েই সুমেরু যাত্রার সুযোগ হয়েছিল তার। এত অল্প বয়সে এত আশ্চর্যভাবে পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ দুটি মেরুকেই চিনে ফেলার সুযোগ ক'জনের হয়?

সুদীপ্তার সঙ্গে গল্প করতে করতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলছিলুম—'তোমার মতো এমন দুর্লভ অভিজ্ঞতা কজন বাঙালি মেয়েরই বা'—তারপর শুধরে 'ভারতীয় মেয়েরই বা'—তারপর শুধরে 'ক'জন মেয়েরই বা'—তারপর শুধরে 'ক'জন মানুষেরই বা হয়?' বলতে বাধ্য হলুম। মেয়ে, বাঙালি, ভারতীয়, এসব বাদ দিলেও এমন অসামান্য অভিজ্ঞতা মানবসভ্যতার এই পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে ক'জন মানুষের হয়েছে? কে জানে আর ক'জন মেয়ে আছে সুমেরু-কুমেরু দুই মহাপর্বতেই যার লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ পড়েছে

আলাপ হবার পরে সুদীপ্তাকে আপনি বলতে পারি নি। মনে মনে, যথেষ্ট সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা সত্ত্বেও, একটা স্নেহ জড়িয়ে গিয়েছে। চোখেমুখে যে কিশোরী সুলভ স্বাচ্ছন্দ্য আছে, তাতে চট্ করেই সুদীপ্তাকে নিজের জন, কাছের মানুষ বলে মনে হয়। তাই সুদীপ্তাকে নিঃসঙ্কোচে গবেটের মতো প্রশ্ন করতে পেরেছি, সুমেরুর সঙ্গে কুমেরুর তফাৎ কী? একটা কেন সু, অন্যটা কেন কু?

কত সহজেই সুদীপ্তা বুঝিয়ে দিলে, সুমেরুর মাঝখানটা সমুদ্র। চারপাশে স্থলভাগ, Arctic circleটা গেছে নানান দেশের ওপর দিয়ে। মাঝখানে সুমেরুর হৃৎপিণ্ডতে দেশের ওপর দিয়ে। মাঝখানে সুমেরুর হৃৎপিণ্ডতে জল বলে, ঠাণ্ডাও কম। দক্ষিণ মেরু মহাদেশটিই মাঝখানে, চারিদিকে সমুদ্র ঘেরা। জমাট বরফের মহাদেশ। মাটি থেকে দুকিলোমিটার পর্যন্ত বরফ জমে আছে। যদি কোনোদিন দক্ষিণ মেরু গলে যায়, পৃথিবীর ওয়াটার লেভেল ৫০০ ফুট উঠে যাবে। সব বন্দরগুলি ডুবে যাবে। পৃথিবীর যত পানীয় জল, তার নব্বই ভাগই বরফ হয়ে জমে আছে ওই কুমেরু মহাদেশে। আর এদিকে কত সাহারা, কত থর, কত গোবি। শুনে মনে হলো, ঈশ্বরের সৃষ্টিতে সত্যি কোনো সুবিচার নেই। বেহিসেবি নিয়ন্তা হলে যা হয়, তাই হয়েছে জগৎটার এখানে মরু, ওখানে মেরু।

সুদীপ্তার সঙ্গে গল্প করতে করতে মনে মনেই বেড়িয়ে এলুম দক্ষিণ মেরু। ৩রা ডিসেম্বর ১৯৮৩ গোয়া থেকে রওনা হয়ে মরিশাসে চারদিন থেমে, ফিন-পোলারিস জাহাজ সোজা ভেসে গেল দক্ষিণ মেরুর দিকে। সুদীপ্তা আমাদের স্লাইড দিয়ে দেখালে ঠিক কোথায় নোঙর করেছিল জাহাজ ২৭শে ডিসেম্বর। স্থল থেকে তিন কিলোমিটার দূরে। ঐ জায়গায় শক্ত বরফে ঢাকা ছিল তখন সমুদ্র।

জাহাজে প্রথম প্রথম জন দশবারো যাত্রী সমুদ্রপীড়ায় কষ্ট পেলেও আবার ঠিক হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ওই যে দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি দুটি ভয়ংকর অঞ্চল আছে না, 'রোরিং ফরটিজ' আর 'স্ক্রীমিং ফিফ্টিজ', যেখানে সব জাহাজই নড়বড়ে মাস্তুলে, ভয়ে ভয়ে ঈশ্বরের হাত ধরে জল পার হয়—সেইখানে অনেকেই সী-সিক হয়েছিলেন। ওখানে জলের স্রোত ও বাতাসের বেগ একই সঙ্গে এত প্রবল যে মানুষের পক্ষে প্রায় অসহ্য। দুর্বার, দুরন্ত, এবং ঘূর্ণিভরা। প্রচণ্ড শব্দ করে ঝোড়ো হাওয়া ছুটছে—সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মূর্তি,—যেন নরকের বর্ণনা (এত কথা সুদীপ্তা বলে নি, কিন্তু আমার মনের চোখে যা ফুটল তাই লিখছি)।

জাহাজে যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যে ৮৩ জন অভিযাত্রী আর জন পঁচিশেক নাবিক। ৮৩ জনের মধ্যে আবার ৪০ জনই সেনাবাহিনীর লোক, যাঁরা কুমেরুতে গিয়ে প্রথম দফায় জীবন বিপন্ন করে বিজ্ঞানীদের জন্যে বাসস্থান নির্মাণ করবেন, camping ground বেছে রাখবেন। Army Engineer force তাঁরা। তিনজন Military doctorও আছেন সঙ্গে— Army Navy ও Airforce এর। Navy -র ডাক্তারটি বঙ্গসন্তান। ডাক্তার ব্যানার্জি। তিনি সুদীপ্তাদের সঙ্গে ফেরেন নি থেকে গিয়েছেন বারো জনের একটি Winter team-এর সঙ্গে, দক্ষিণ মেরুর প্রচণ্ড শৈত্য প্রবাহ সহ্য করবার ঝুঁকি নিয়ে (মাইনাস সত্তর ডিগ্রিতে নামে) এবং তিনমাস অন্ধকারে থাকার তীব্র মানসিক চাপ মেনে নিয়ে। দুমাস তো রাত্রিই থাকবে। সূর্য তো উঠবেই না—দিবালোকও থাকবে না।

দক্ষিণ মেরুর মাঝখানে কোনো প্রাণী নেই, জীবজন্তু নেই। শুধু একেবারে সৈকতে সৈকতে আছে পেঙ্গুইনরা আর স্কুয়া পাখি, আর পেট্রেল পাখি। আর আছে দু রকমের সীল মাছ—ক্রাবইটার সীল, আর লেপার্ড সীল। প্রথম দল মাছখেকো, দ্বিতীয় দল পাখিটাখি যা পায় সাবাড় করে। মাংসভুক তারা। এমনকি শৈবালও দেখা যায় না ভেতরদিকে গেলে। কিছু কাচের মতো হ্রদ আছে গরমকালেই মাত্র তাদের আয়ু। তাদের তীরে তীরে অল্প কিছু শৈবাল আছে, পাথরে। কিন্তু ভেতর দিকে ঘন বরফ, একেবারে প্রাণশূন্য, শাদা, বর্ণহীন। শুধু নানা ধরনের নীল, আর ঝকঝকে চোখ ঝলসানো শাদা। সবসময় চোখ ঢেকে রাখতে হয় বরফ গগল্স্ পরে, নইলে ওই নিশ্ছিদ্র রজত-শুভ্রতায় দৃষ্টিহীন হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

আর কী বেগ বাতাসের দক্ষিণ মেরুতে। ঘণ্টায় ত্রিশ কিলোমিটার বেগে শুরু

পেঙ্গুইনরা গাঁশুদ্দু উজাড় করে মেরুবিজয়ীদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে

দক্ষিণমেরুর স্কুয়া পাখী

হয় ব্লিজার্ড (তুষারবাত্যা—কিন্তু আকাশ থেকে তুষার পড়ে না, তুষার ওড়ে মাটি থেকে), ক্রমশ দৃষ্টি একেবারেই অকর্মণ্য হয়ে পড়ে, visibility nil হয়ে যায়। ঘণ্টায় আশি কিলোমিটার পর্যন্ত বাতাসের বেগ মানুষ সহ্য করতে পারে।

সুদীপ্তা বললে, "—হাওয়ায় উড়ে যাই নি কেউই, কিন্তু দেড়শো কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগটা বাড়ে। তখন মানুষ কেন, তাঁবুও টেকে না।"

"তাহলে তোমরা রইলে কেমন করে?"

"স্পেশাল তাঁবু নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, ব্রিটেনের কাছে কিনে, Wind resistant তাঁবু। সেগুলোর কিছু হয় নি।"—

ভারতীয় তাঁবু ছিল না?"—

"ছিল"

—"ব্লিজার্ডে সেগুলো কী হল?"

এবারে সুদীপ্তা রীতিমত লজ্জা পেয়ে গেল বলে মনে হলো।—"ওগুলোও খুবই ভালো, মাউন্টেনিয়ারিং-এর পক্ষে বেশ স্টার্ডি, কিন্তু দক্ষিণ মেরু তো অন্য ব্যাপার? ওই হাজার হাজার মাইলব্যাপ্ত খোলা বরফের মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে আসা বাতাস, ওটা তো পাহাড় পর্বতে থাকে না, হিমালয়ে দিশি তাঁবুগুলো চলে দিব্যি।"

—"কিন্তু দক্ষিণ মেরুতে?"

—"ওই ব্লিজার্ড হবার আগে ঠিকই চলছিল। ব্লিজার্ডে উড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওখানে আমরা শুতাম না। ও তাঁবু অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হত।"

সুদীপ্তার স্লাইডে দেখলুম ব্রিটিশ তাঁবুগুলি টুকটুকে লাল, রেড-ইনডিয়ানদের তাঁবুর মতন দেখতে সরু গড়নটা। আমাদের তাঁবু আরো চওড়া, শাদা।

একটি স্লাইডে একটা চমৎকার কুকুর দেখে আমি মহা উৎসাহিত। তবে যে বললে জীবজন্তু নেই? এই তো কি সুন্দর কুকুর।

সুদীপ্তা হেসে ভুল ভাঙিয়ে দেয়—"ওটাও তো অভিযাত্রী! রুশ দলের সঙ্গে এসেছিল। রুশ দলের বেস্‌ক্যাম্প তো আমাদের পাশেই বলতে গেলে, মাত্র ৬০ কিলোমিটার।"

ম্যাপে দেখিয়ে দেয় 46 A লেখা পয়েন্টটি—ওটাই রুশ বেস্‌ক্যাম্প, "নোভোলাজারাস্কায়া"—ওরই গায়ে বসবে ভারতবর্ষের বেস্‌ক্যাম্প "দক্ষিণ গঙ্গোত্রী"।

—"দক্ষিণ গঙ্গোত্রী কেন? কে নাম দিল?"

—"ডাঃ কাশিম। ওঁর মনে হয়েছে ওখানে ওই উঁচু বরফ আর নিচে জল ঠিক যেন গোমুখের মতো—গঙ্গোত্রীর উৎসমূলের মতো দেখতে। নেহাৎই দৃশ্যগত সাদৃশ্যের জন্যে। যাক—যেহেতু নিজে হিন্দু নন, সেই কারণেই অত সহজে নাম দিয়ে ফেললেন একটা হিন্দু তীর্থস্থানের। ডঃ কাশিমই তৃতীয় দক্ষিণ মেরু অভিযানের নেতা।

'ফিন-পোলারিস' একটা আইস-ব্রেকার জাহাজ। ফিনল্যাণ্ডের কাছ থেকে চার্টার করা। সেই জাহাজের নাবিকরা সবাই ফিন। বাকিরা ভারতীয়। তাঁবুর মতো, পোশাক পরিচ্ছদও কিনতে হয়েছে নরওয়ে আর ব্রিটেনের কাছে। দক্ষিণ মেরুর ঠাণ্ডাটা তত আহামরি কিছু নয়, গ্রীষ্মকালে—মাইনাস তিন থেকে ত্রিশের মধ্যেই থাকে। —"আমরা তো নর্থ আমেরিকাতেই শীতে মাইনাস থার্টি পেয়েছি—"

হ্যাঁ, শান্ত স্বরে সুদীপ্তা জানায়—প্রায় মেরুর মতই তাপমাত্রা হয় ওসব অঞ্চলে শীতে। কিন্তু দক্ষিণ মেরুতে ভয়াবহ হচ্ছে বাতাস। ওই দুঃসহ ঝোড়ো বাতাস। মুখ নাক যেন ছুঁচ বিঁধিয়ে ছুরি ফুটিয়ে ফালা ফালা করে দেয়। সহ্য করা অসম্ভব। টুপি দিয়ে প্রায় সবটা মুখই অবশ্য ঢাকা থাকে, চোখটাও, তবু যেটুকু খোলা থাকে সেটুকুও, মনে হয় সাড় নেই। ব্রিটেন আর নরওয়ে থেকে যে পোশাক পাওয়া গেছে তা প্যাডেড। ট্রাউজার্স, জ্যাকেট, সবই।

সুদীপ্তা স্লাইড দেখাল। সব্বাই নীল কোট আর লাল পেন্টুলুন, বা লাল কোট নীল পেন্টুলুন পরে। চোখে কালো চশমা। মাইল মাইল শুভ্রতা, শূন্যতা, আর শৈত্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একমুঠো অদ্ভুতুড়ে মানুষ। তাদের মধ্যে একজন একটু ছোট্টখাট্টো। তার টুপির নিচে দুটি খুদে বিনুনি ঝুলছে। সেই আমাদের নায়িকা, সুদীপ্তা সেনগুপ্ত।

লাল, নীল, গোবদা-গাবদা ওই জ্যাকেটের নাম অন্নপূর্ণা জ্যাকেট। অন্নপূর্ণা অভিযানের সময়ে আবিষ্কার হয়েছিল বোধহয়। ওগুলি দিয়েছে নরওয়ে। জুতোও বলা বাহুল্য, স্নোবুট। হাতেও দস্তানা।

কিন্তু সুদীপ্তা বললে, ওদের কাজকর্মের সময়ে প্রায়ই খালি হাতে কাজ করতে হতো। পাথর ঘাঁটা, পাথরের খাঁজ দেখা চেনা, এটা শুধু হাতের স্পর্শে যেমন সহজ দস্তানা পরে তা হয় না।

তিনজন জিওলজিস্ট গিয়েছিলেন ভারতের তিন প্রান্ত থেকে। কেউ কাউকে চিনতেন না (তিনজনে প্রথমে তিনটে প্রজেক্ট দিয়েছিলেন। তারপর সিলেকটেড হয়ে যখন পরিচয় হলো, ওঁরা সলাপরামর্শ করে একটিই প্রজেক্ট ঠিক করে ফেললেন। তারপর একসঙ্গে ফিলড্‌ওয়ার্ক। রবীন্দ্র সিং জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার লোক, মদন লাল ও· এন· জি· সি-র। আর আমাদের সুদীপ্তা, যাদবপুরের। ভাবতেই আরেকবার গৌরবে স্ফীত হই।

—"ক্যাম্পে কতজন থাকতে তোমরা মোট?"

Had we lived I should have had a tale to tell of the hardihood, endurance & courage of my companions which would have stirred the heart of every Englishman. These rough notes & our dead bodies must tell the tale but surely, surely a great rich country like ours will see that those who are dependent on us are properly provided for R. Scott

জনগণের প্রতি স্কটের ঐতিহাসিক বার্তার অন্তিম পরিচ্ছেদ

মহাপ্রস্থান

দক্ষিণ মেরু অভিযানের সঙ্গে স্কটের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত—তাঁর কীর্তির জন্যে-নয়; তাঁর মৃত্যুর জন্য। স্কটের মেজাজ ছিল দুঃখবাদী দার্শনিকের, জীবন-মৃত্যু-নিয়তি নিয়ে ছিল তাঁর নিয়ত ভাবনা। কড়া মেজাজ ও অনুভূতির তীব্রতায় তিনি যেন খানিকটা অযোগ্যই ছিলেন এরকম অভিযাত্রী দলের নেতৃত্ব দেওয়ার কাজে। কিন্তু একটি অমোঘ গুণ সব দোষ ঢেকে দিয়েছিল। সহযাত্রীদের প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত। আর সহযাত্রীরাও সে আনুগত্য ফিরিয়ে দিয়েছেন তুলনাহীন ভাবে। স্কট তাঁর অনুভবের মূল্য বোধহয় দিয়েছিলেন জীবন দিয়েই। মেরু অভিযানে শ্লেজগাড়ি টানায় কুকুরদের যেভাবে ব্যবহার করা হয় স্কট ছিলেন তাঁর তীব্র বিরোধী। অনেকে মনে করেন কুকুর ব্যবহার না করে স্কট প্রায় আত্মহত্যাই করেছিলেন। ৪৬ বৎসর বয়েসে শরীরের দিক থেকে খানিকটা কাবু স্কট ১৯১২ সালের ১২ জানুয়ারিতে তাঁর শেষ অভিযানে দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছেছিলেন। পৌঁছে দেখেন নরওয়ের আমুণ্ডসেন আগেই সেখানে পৌঁছে পতাকা গেড়ে গেছেন।

তারপর শুরু হয় মরুদেশের ৮০০ মাইল ব্যাপ্ত তুষার প্রান্তরে এক হতাশ প্রত্যাবর্তন। ২৪ জানুয়ারি থেকেই আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু করে। ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাস জুড়ে চরম তুষারপাত ও হিমবাত্যার মধ্যে একজন সহযাত্রী মারা গেলেন, অন্যরা ক্রমাগত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। স্কট সেই মৃত্যুর আশংকার মধ্যে একের পর এক চিঠি লিখে যাচ্ছেন তাঁরই সহযাত্রীদের কারও স্ত্রী, কারও মা, কারও বন্ধুদের কাছে। তাঁর নিজের স্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন, সম্বোধন, 'আমার বিধবার প্রতি'।

তিনি 'জনসাধারণের উদ্দেশ্যে' একটি চিঠি লিখে যান, তাতে বলেন 'এই যাত্রার চরম বিপদে আমার নিজের জন্য আমার কোনো দুঃখ নেই। এই যাত্রা প্রমাণ করল একজন ইংরেজ এখনও অতীতকালের মতই দুঃখ সহ্য করতে পারে। একে অপরকে সাহায্য করতে পারে। পরম ধৈর্যের সঙ্গে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে পারে। আমরা অনেক ঝুঁকি নিয়েছি, জেনেশুনেই নিয়েছি, সব কিছুই আমাদের বিপক্ষে চলে গেছে। তাই আমাদের অভিযোগের কোনো কারণ নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছা আমরা মেনে নিলাম।

'আমরা যদি বেঁচে থাকতাম, তাহলে আমি আমার সহকর্মীদের কঠিন শ্রম, ধৈর্য ও সাহসের এমন এক কাহিনী বলতে পারতাম, যাতে প্রত্যেক ইংরেজের হৃদয় চঞ্চল হত। আমাদের এই সব কাগজপত্র এবং আমাদের মৃতদেহই আমাদের কাহিনী বলবে…।'

সে বছরের নভেম্বরে লেফটেনান্ট এ্যাটকিনসনের নেতৃত্বে একদল অনুসন্ধানে বেরিয়ে স্কটের শেষ ক্যাম্প খুঁজে পেল। তিন অভিযাত্রী তাঁদের তাঁবুতে বরফে প্রায় সমাধিস্থ। মাঝখানে স্কট, তাঁর এক হাত পাশে বন্ধু উইলসনের শরীরের ওপর রাখা। তাঁদের শ্লেজগাড়িতে তখনও পঁয়তিরিশ পাউণ্ড ওজনের ভূতাত্ত্বিক সংগ্রহ। সেই মেরুদেশের নিঃসঙ্গতায় এ্যাটকিনসন ও তাঁর দলবল ভূতগ্রস্তের মত স্কটের তাঁবুর দড়িগুলোকে কেটে দিলেন। সেই মেরুযাত্রীদের শবদেহ ঢেকে গেল।

আমেরিকার বৈজ্ঞানিকরা গবেষণা করে দেখেছেন, সেই কবর এখন বরফের তলায় পঞ্চাশ ফুট চলে গেছে। বরফের ওপর স্তরের নিচে যে আইস শেলফ আছে, তার পনের মাইল কাছে। দূর ভবিষ্যতে মেরু প্রদেশের অন্তঃশীল কোনো তুষারপর্বত এই মৃতদেহগুলোকে ঠেলে নিয়ে যাবে আণ্টার্কটিকের সমুদ্রে।

'সিমাচার' বা দক্ষিণ গঙ্গোত্রী শৈলশিরাতে কাজের ফাঁকে বিশ্রাম

—"মাউন্টেনসাইটে ? মোট সাতজন করে থাকা হতো। আমরা ভূতাত্ত্বিক তিনজন পুরো পঁচিশ দিনই ছিলাম। আর অন্য চারজন পালা করে আসতেন। তবে আবহাওয়াবিদ, ডাক্তার, ফিজিসিস্ট আর বায়োলজিস্ট এই চারজনই সাধারণত বেশি থেকেছেন। Winter team- ও তো থেকে গেছেন এঁদের তিনজন—আবহাওয়াবিদ্ সৈয়দ্ রিজভি, বায়োলজিস্ট মতোন্দকর, ইনি এইবার নিয়ে তিনবার দক্ষিণ মেরুতে গেলেন, আর ডাক্তার ব্যানার্জি। লখনৌয়ের হিন্দিভাষী বাঙালি ইনি।"

—"আচ্ছা সুমেরুতে তুমি কতদিন ছিলে "?

—"মাসতিনেক সুইডেনের অঞ্চলেই কাজটা করছিলাম আমরা, ১৯৭৮-এ সে যাওয়া আলাদা। এটা অন্যরকম।"—

"ফিল্ডওয়ার্কের সময়ে ওই লাল লাল তাঁবুতে থাকতে তো ? আচ্ছা, তাঁবুতে তো বাথরুম থাকে না ? কী করতে ?" সুদীপ্তা সামান্য লজ্জা পেয়ে বলে, "মাঠেই যেতে হতো ? যখন পাহাড়ী অঞ্চল, তখন এরিয়া ভাগ করে নিতাম। একটা ছেলেদের দিক, আর একটা আমার। আর সমতলে থাকার সময়ে ছেলেরা নিজেদের জন্যে একটা বরফের পাঁচিল তুলেছিল, আমার জন্য তিনদিক ঘিরে দিব্যি বরফের কামরা বানিয়ে দিয়েছিল। তুষারকুঠার সঙ্গে নিয়ে যেতে হতো, গর্ত খুঁড়ে নিয়ে, বরফ চাপা দিয়ে আসা নিয়ম ছিল। কিন্তু ব্লিজার্ডের মধ্যে যখন যেতেই হোতো, একা পথ চিনে তাঁবুতে ফেরাই তখন দুরূহ এক অভিযান।"

—"তাঁবুর মধ্যে ঘুমোতে শীত করতো না?"

—"স্লিপিং ব্যাগগুলো খুব গরম, তার ভেতরে একবার ঢুকে পড়ে Zip জিপ বন্ধ করে ফেললে আর শীত করে না।"

—"তাঁবুতে আগুন জ্বলাতে না ?"

"সাধারণত না। কখনো কখনো আগুন জ্বালা হলেও শোবার আগে নিবিয়ে দেওয়া হত। ওখানে আগুন জ্বেলে ঘুমের কী দরকার, ওখানে তো বন্য জন্তু নেই। ভাল্লুকটাল্লুক কিছু নেই।"

—"আলোর কী ব্যবস্থা ছিল রাত্রে ?"

—"আলো ?" খিলখিল্ করে হেসে ওঠে সুদীপ্তা। "সবসময়েই তো আলো। সূর্য তো প্রথম প্রথম সারা দিনরাত মাথার ওপরেই থাকত। ঘুরত। তারপর আসার আগে দিগন্তের কাছাকাছি কিছুটা নামল। তবু যথার্থ সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত দেখি নি আমরা। সূর্য তো অস্ত যাবে শীতকালে। জুন জুলাই দুমাস আর সূর্য উঠবেই না। আমরা সাতাশে ডিসেম্বর পৌঁছেছি, আর ১লা মার্চ ফেরৎ রওনা হয়েছি। তখন তো ভরা গ্রীষ্মকাল দক্ষিণ মেরুতে। দেশে এসে পৌঁছেছি ২৯শে মার্চ।"

—"আলোয় ঘুমুতে কষ্ট হোতো না ?"

—"আর কষ্ট ! আমরা সকাল ৮টা থেকে রাত বারোটা, ষোল ঘণ্টা কাজ করতাম। তারপর শুলেই ভোঁস ভোঁস নিদ্রা। শরীর খুব ক্লান্ত থাকতো তো"

—"শরীর খারাপ হয়নি কারুর ? ষোলঘন্টা খাটতে পারতে ?"

—"না না, সবাই খুব শক্তপোক্ত ছিলাম, আমরা। কারুর কিচ্ছু অসুখ করে নি ওখানে।"

বলবনা-বলবনা করেও বলে ফেলি একসময়ে—"একসঙ্গে থাকতে, কাজ করতে, একা মেয়ে বলে কোনো অসুবিধে হয়নি তো ?"

সুদীপ্তা উত্তর দেবার আগেই আনন্দদেব আমাকে ধমক দেন—"অসুবিধে আবার কী ? কিস্যু হয় না। সায়েনটিস্টরা সায়েনটিস্ট, ছেলেও নয় মেয়েও নয়। সুদীপ্তা আমাদের পাহাড়ে চড়া মেয়ে, ওর ওসব ছেলে-ফেলেতে কিসসু অসুবিধে নেই।"

সুদীপ্তাও বলে—"বিন্দুমাত্রও অসুবিধে হয় নি মেয়ে বলে। প্রত্যেকেই অত্যন্ত স্নেহশীল, টীমের স্পিরিটটা ছিল পরিবারের মতো। কাজ করতে তাই খুবই সুবিধে হয়েছে।"

"—সুবিধে মানে ?"—আনন্দদেবের আবার বিস্ফোরণ "বিশ্বাস করবেনা, ওরা কী পরিমাণ কাজ করেছে ? মাত্র পঁচিশ দিন ওয়ার্কিং ডে, তার মধ্যে ওরা যে-কাণ্ডটা করে ফেলেছে, সেটা ধারণার বাইরে। ভারতের যা রিসার্চ এরিয়া, মোট পঁয়ত্রিশ বর্গ কিলোমিটার জায়গা, তার কমপ্লিট জিওলজিক্যাল এবং স্ট্রাকচারাল ম্যাপ তৈরি করে এনেছে 1=25000 স্কেলে। এর আগে মাত্র চার বর্গ কিলোমিটারের ম্যাপ হয়েছিল দু'টি অভিযানে। এ যে কী অসাধ্যসাধন, তা ঠিক লাইনের লোক না হলে বুঝবে না !

সুদীপ্তার অধ্যাপক আনন্দদেবের চোখমুখে আমার প্রতি স্পষ্ট অবজ্ঞা। লাইনের লোক নই বলে রীতিমত অপরাধ বোধ করতে থাকি। কথার মোড় ঘোরানোর উদ্দেশ্যে বলি—"আচ্ছা, মোট ক'জন বাঙালি ছিলেন ?"

—"আলোক ব্যানার্জি ছিলেন নেভির ডাক্তার, আর এল· কে· মণ্ডল ছিলেন এয়ারফোর্সের টেকনিশিয়ান, আর আমি, ব্যাস। মোট তিনজন ছিলাম তিরাশিজনের মধ্যে।"

—"আচ্ছা শঙ্কর চ্যাটার্জি যে গিয়েছিলেন, তাঁকে আপনি চিনতেন ?"—সুবীরের প্রশ্ন।

—"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, তিনিও তো যাদবপুরের, আমাদের বিভাগেরই। শঙ্করদা গিয়েছিলেন ইউনাইটেড স্টেট্‌সের বিজ্ঞানীদলের সঙ্গে।"

ইতিমধ্যে আরেকটা প্রশ্ন জেগেছে আমার মনে—"এই অভিযাত্রীদলে শুনেছি আরেকটি মেয়েও ছিলেন ? তাঁর ছবি দেখছি না কেন ?"

সুদীপ্তা বলে, "হ্যাঁ, তিনি মেরিন বায়োলজিস্ট, পুনার মেয়ে, নাম অদিতি পন্থ। আমার অন্য স্লাইডে তাঁর ছবি আছে, সব স্লাইড তো এসে পৌঁছোয় নি এখনও। এগুলো সব ক্যাম্পসাইটে, বেস্‌ক্যাম্পে, কি মাউণ্টেনসাইটে তোলা ছবি। অদিতির গবেষণার কাজ সমুদ্রের জলে, তিনি ছিলেন তাই জাহাজে। স্থলে আমাদের ক্যাম্পে থাকছিলেন না তো। আমাকে একাই থাকতে হয়েছিল ক্যাম্পে। উনিও একা মেয়ে ছিলেন জাহাজে।"

—"অদিতির বয়েস কীরকম ? তোমার মতই ?"

—"আমাদের চেয়ে, দুয়েক বছরের বড় হবেন হয়তো। বছর চল্লিশেক কি একচল্লিশ।" (শুনে খুব খুশি হই। তাহলে এমন কিছু দেরি হয় নি ? ট্রাই নেওয়া যাবে এখনো ?) —"জাহাজ থেকে তোমরা হেঁটে হেঁটে সাইটে গেলে ?"

—"না, প্রথমে যখন নামি তখনও বরফ শক্ত ছিল। আমরা একটা মস্তবড় গাড়ি করে সাইটে যাই। গাড়িটা জার্মানি দিয়েছে।"

স্লাইডে দেখাল সুদীপ্তা—একটা বিরাট ক্যারাভানের মত। তার পিছনে অতি দীর্ঘ লটবহর ভর্তি একটা ভেলাজাতীয় ব্যাপার। সুদীপ্তা বললে ওই গাড়িটার সঙ্গে সত্যি ক্যারাভানের মতো ক্যাবিন আছে, সেন্ট্রালি-হীটেড, তার মধ্যে বসবাস আহারনিদ্রার ব্যবস্থা আছে। আর পশ্চাদের ওই বিপুল বোঝা টানছে স্লেজ-ক্যারিয়ার। রেইনডিয়ারকে কুকুরের বদলে বিপুল মোটর গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে—সেই অতিকায় স্লেজের লরি।

—"কিন্তু পরের বার ওটা করে যাওয়া যায় নি ?"

সুদীপ্তা বলে—"তুষারে ফাটল দেখা দিল আর গাড়ি চালানো নিরাপদ রইল না। তারপর থেকে হেলিকপটারে করে মানুষ আর মালপত্র সবই আনা নেওয়া হতে লাগল।"

স্লাইডে দেখাল, দু'টি হেলিকপটার। এখন ভুলে গেছি কোনটি কোথায় তৈরি, তবে দুটি দু'দেশে এবং একটিও ভারতে নয়। জাহাজের ওপরেই কি সুন্দর হেলিপ্যাড। আমি তো মুগ্ধ।

সুদীপ্তা বললে, খুব সুন্দর হলেও যথেষ্ট প্রশস্ত, যথেষ্ট পরিসরযুক্ত ছিল না। অনেক সময়ে, একটি হেলিপ্যাড নামছে, আরেকটি সদ্য উড়ছে—এমন অবস্থায় বেশ সমস্যায় পড়তে হয়েছে। একবার তো দুর্ঘটনাই ঘটে গেল। এক কোণা দিয়ে নামতে গিয়ে কী গড়বড় হল, হেলিকপটার জাহাজে না নেমে, পড়ল গিয়ে এপাশে, সমুদ্রের জলে। ভাগ্যিস জলে পড়েছিল ! তাই পাঁচজন যাত্রীই প্রাণে বেঁচেছিল। বিস্ফোরণ হয় নি। যদি এপাশে না পড়ে, প্লেনটি জাহাজের অন্যপাশে পড়ত বরফের ওপরে, স্থলভাগে, তাহলেই ঘটত প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। বিস্ফোরক দ্রব্য ছিল ওতে। একজনেরও প্রাণরক্ষা হত না। জাহাজেরও ক্ষতি হত। ভগবৎ কৃপায় তা ঘটেনি। যাত্রীদের একজন জানলা ঘুঁষি মেরে ভেঙে জলের মধ্যে বেরিয়ে আসেন, অন্যরাও পিছু পিছু, জলের তাপমাত্রা তখন মাইনাস পাঁচ। তাঁদের হাত পা জমে যাবার যোগাড় হয়েছিল, তবু কোনো স্থায়ী ক্ষতি হয় নি। কিছুদিন শুশ্রূষার পরে তাঁরা প্রত্যেকেই যে যার কাজে ফিরে গিয়েছিলেন।

এ আড্ডা হচ্ছে জিওলজি বিভাগে। শ্রোতাদের মধ্যে তুলনামূলক সাহিত্যের

সুবীর আর অর্থনীতির সৌরীন খুব কুকুরে ভয় পান।

সুবীর বলে ফেললেন, "সেই যে রুশ কুকুরটার ছবি দেখালেন, তার কী হল ? ওই বিশালবপু নিয়ে সে যদি এখনো ওখানে থাকে, তাহলে ভাই আমাদের আর দক্ষিণ মেরু যাওয়া হবে না !" সৌরীন বলল—"সে আপনাদের দলে ভিড়ল কী করে ?"

সুদীপ্তা বলে, "আমাদের ফিলডওয়ার্কের সময়ে চলে এসেছিল। তিন চারদিন পরে ওদের ক্যাম্পে ওকে রেখে এলাম। খাওয়াদাওয়ার অভাবে রোগা হয়ে যাচ্ছিল।"

—"কেন ? কেন ?"

—"আমরা তো সুজির বরফি, আমসত্ত্ব এই সব লাঞ্চ খেতাম ? ওর তা ভাল লাগবে কেন ? প্রথম প্রথম তাই খেত, তারপর খাচ্ছিল না। মাংস না হলে ওর হবে কেন ?"

—"তোমরা সবাই নিরিমিষ খেতে ?"

—"তা নয়। সকালে ব্রেকফাস্টে ডিম, কর্নফ্লেক খেতাম। রুটি থাকত না, বরফে জমে এমন কড়কড়ে হয়ে যেত খাওয়া যেত না। তাই স্যাণ্ডউইচ নয়, সুজির হালুয়া। pre-cooked ছিল সঙ্গে ঠাণ্ডা খেলে বরফি, গরম করে নিলেই মোহনভোগ। সাইটে ওই দিয়েই লাঞ্চ। রাত্রে ফিরে গিয়ে ইনডিয়ান ডিনার। ভাত, ডাল, সব্জি সবই রান্না হত। Frozen food ছিল সঙ্গে কিছু, Canned food কিছু, pre-cooked food কিছু, আর চাল ডাল ছিল। একবছরের খাদ্য সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। সব রেখে এসেছি। বারোজনের winter team রয়ে গেল না ? জাহাজ তো চলে এসেছে।" ওরা তার মানে এখন stranded ? অত বিশাল মেরুভূমিতে মাত্র বারোজন শীর্ণ শীতকাতুরে ভারতীয় হালুয়া আর আমসত্ত্ব খেয়ে দেড়শো মাইল বেগে মাইনাস সত্তর ডিগ্রির বাতাস সহ্য করছেন—এটা ভাবতেই হাত পা অসাড় হয়ে গেল আমার।

তার মধ্যে একজন আবার বাঙালি, ডাক্তার আলোক ব্যানার্জি। দক্ষিণ মেরুর শীত তো শুরু হল বলে। ওই জনপ্রাণীহীন বিপুল মহাদেশে প্রাণী বলতে মাত্র বারোটি ভারতীয় অভিযাত্রী—

—"না, না, ওরাই একা থাকবে কেন ? সব দেশেরই তো বেস্ক্যাম্প আছে। সেখানে ক্যাম্প রক্ষা করতে winter team থাকেই। মিলিটারিরই লোক যদিও প্রধানত। আমাদের দলে দুজন বিজ্ঞানীও আছেন। বায়োলজিস্ট, আর আবহাওয়াবিদ্। পাশেই তো রুশ ক্যাম্পে লোক আছে। নোভোলাজারাস্কায়া-তে।"

—"যাক্", সুবীর নিশ্চিন্ত "প্রতিবেশী আছে।"

—"কিন্তু তাঁরা ইংরিজি জানেন তো ?" সৌরীনের প্রশ্ন।

—"দুজন জানে। আরো অনেক বেসক্যাম্প আছে।" সুদীপ্তা জানায়। সব দেশ থেকেই তো অভিযান হয়েছে। ১৯৫৯-এর treatyতে ঠিক হয়েছে যে একমাত্র বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যে ছাড়া অভিযান করতে দেওয়া হবে না। তা, কম দেশ লোক পাঠায় নি। ব্রিটেন, ইউনাইটেড স্টেট্স, রাশিয়া, ফ্রান্স, ওয়েস্ট জার্মানি এবং দক্ষিণ আফ্রিকা, চিলি-আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যাণ্ড, নরওয়ে-সুইডেন, জাপান, কত দেশেরই লোক রয়েছে বেস্ক্যাম্প করে। চিলি আর্জেন্টিনার তো ঘরের কাছেই !"

—"সবাই মেয়েদের পাঠিয়েছে ?" একটু সলজ্জ সবিনয় হেসে সুদীপ্তা বলে, "ভারতবর্ষের আগে একমাত্র ইউনাইটেড স্টেটস অভিযাত্রীদলে একজন মেয়ে সদস্য ছিলেন। তিনি বোধহয়, মিলিটারির লোক, আমার যতদূর মনে পড়ছে।"

—"Winter teamএ মেয়ে নেই। আমাদের তো দুজন মেয়েই বিজ্ঞানী, তাঁদের কাজ করার উপায় নেই শীতে। কিন্তু বাড়িটা যা আরামের হয়েছে ওখানে, না বেরুলে হয়তো বোঝাই যাবে না কিছু। তবে সর্বক্ষণ রাত্রি থাকবে জানলার বাইরে।"

হ্যাঁ, বাড়িটা দেখবার মতো বটে। মাত্র পঁয়ষট্টি দিনে তৈরি করেছেন চল্লিশজন ভারতীয় আর্মি এনজিনিয়ারে মিলে। প্রচণ্ড শীতে, ঠাণ্ডা বাতাসে জমে, সভ্যতার কোনোরকম সুবিধে না পেয়ে। Prefabricated অবশ্যই, বিরাট বাড়ি। প্রথমে বরফ খুঁড়ে বিশাল কাঠের ভিত্তি তৈরি করেছে বারো ফুট, বাড়িটার যত পরিধি, তার চেয়ে দু'মিটার চওড়া করে। সেই গর্ত শক্ত বরফ দিয়ে বুজিয়েছে। তার ওপরে হয়েছে এই মেরুনরঙের কাঠের মতো দেখতে (কাঠের নয় সিন্থেটিক মেটিরিয়ালের) বাড়িটা। তার মাঝখানের একটি অংশ ভারতীয় পতাকার রঙে রং করা। বহু দূর থেকেও যাতে চেনা যাবে, গৈরিক শুভ্র স্থান। উঁচু প্রাচীর-ঘেরা বাড়ি, মাঝখানে ওই গোল সিলিণ্ডারটা বোধহয় বয়লারের চিমনি, তাও ত্রিবর্ণ। বাড়িটার দুটি ভাগ। একদিকে সার্জারি, কিচেন, দোতলায় বারোজনের শোবার ঘর, অন্যদিকে ল্যাবরেটরি ইত্যাদি। অতি আধুনিক সার্জারিতে জরুরি অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা পর্যন্ত রয়েছে।

বরফ জমা সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে চলেছে ফিন পোলারিস

'প্রতাপ' দক্ষিণমেরুর পক্ষীরাজ

বেডরুমগুলিতে বাংক সিস্টেম। বাথরুম, টয়লেটের সিস্টেমও সুদীপ্তা আমাদের ব্যাখ্যা করে দিল। তার মধ্যেও প্রচুর বৈজ্ঞানিক কেরামতি রয়েছে। ওই বাড়ির প্রত্যেকটি খণ্ডই বিদেশে তৈরি বটে, কিন্তু কারিগরি পুরোই স্বদেশী। এত অল্প সময়ে এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ, শক্তপোক্ত মজবুত বাড়ি তৈরি করা, এটায় নাকি বিশ্বরেকর্ড করে ফেলেছি আমরা। সুদীপ্তা খুব আনন্দ করে জানালো, এত অল্প সময়ে দক্ষিণ মেরুতে আর কোনো বেস্‌ক্যাম্প তৈরি হয়নি

—"শেষে তাঁবুর মতো উড়ে যাবে না তো?"—ভয়ে ভয়ে বলেই ফেলি "ব্লিজার্ড এসে যখন সেই নেকড়ের মত বলবে "আই'ল হাফ্‌ অ্যাণ্ড আই'ল পাফ্‌ এ্যাণ্ড আই'ল ব্লো ইওর হাউস অ্যাওয়ে"—

—" না না, কোনো ভয় নেই," সুদীপ্তা হৈহৈ করে সান্ত্বনা দেয়। "তার টেস্ট হয়ে গেছে। ফিরে আসবার কয়েকদিন আগে আমরা দেখতে গিয়েছিলাম, 'দক্ষিণ-গঙ্গোত্রী' বাড়িটা কেমন হলো। গিয়ে সবাই মিলে এক ভীষণ ব্লিজার্ডে আটকা পড়ে গেলাম। বেশ কয়েকদিনের মতো অতজনের রান্না করার মতো বড় কিচেন তো ছিল না, অন্য একটা ঘরকে (কোন ঘরটা বলল? মেশিনটুলসের ঘরটাই বোধহয়!) কিচেন বানিয়ে রান্নাবান্না হতে লাগল লঙ্গর খানার মতো। সেই প্রচণ্ড ব্লিজার্ডে বাড়ির কিছু ক্ষতি হয় নি।" শুনে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

রঙিন স্লাইডে সুদীপ্তা আমাদের ওই বাড়িতে নিয়ে গেল। কি সুন্দর ঝকঝকে বিলিতি রান্নাঘর থরে থরে ভাঁড়ার। কি অপূর্ব সাজানো খাবার ঘর। ডাইনিং টেবিলের শাদা ধবধবে চাদরটির ইস্ত্রির ভাঁজটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে (নন্‌ আয়রন মেটিরিয়াল নিঃসন্দেহে!)। সাইড টেবিল, বাসনের আলমারি সব আছে। বিদেশবিভুঁয়ে, জনমনিষ্যিহীন, পাণ্ডববর্জিত অমেরু-কুমেরু স্থানে পড়ে থাকবে বলেই যে লাইফ স্টাইলে ঘাটতি থাকবে, তা নিশ্চয় হতে পারে না। দু'ধরনের হীটিং সিস্টেম আছে, সুদীপ্তা বোঝাল, হট এয়ার পাস করিয়ে একটা, আরেকটা সেন্ট্রাল হীটিং। সবচেয়ে মজা লাগল কীভাবে জল তৈরি হয় তাই দেখে। বালতি বালতি বরফ কুপিয়ে খুঁড়ে একটা জানলা দিয়ে একটি ঘরের মধ্যে ফেলা হচ্ছে। সেটি একটি চৌবাচ্চা। তা থেকে নিচে অন্য চৌবাচ্চায় যাচ্ছে, যেখানে হীটিং পাস করিয়ে, বরফ গলিয়ে জল তৈরি হচ্ছে। ওখানকার জল খুব ভালো, পলিউশনের প্রশ্ন নেই। পাথর নিয়ে ভূতত্ত্বের কাজকর্ম করতে করতে তেষ্টা পেলে সুদীপ্তারা কী করে? একটা হাতুড়ি নিয়ে লেকের কাছে যায়, ওপরের বরফটা ভাঙে, নিচে থাকে স্বচ্ছ নীল, সুস্বাদু, সুপেয় অসূর্যম্পশ্যা বীজাণুমুক্ত জল।

মুশকিল হচ্ছে অঞ্জলিতে তুলে খাওয়াটা। গেলাস ডুবিয়ে নিলেই হল। হাতুড়ি তো ভূতাত্ত্বিকের জপমালা, সঙ্গের সাথী, তেষ্টা পেলেই হাতুড়ি মারো।

দক্ষিণ মেরুতে অনেক পাহাড় আছে। সত্যিই পর্বত—খুব উঁচুও—শুধু শৃঙ্গটুকু কোথাও কোথাও জেগে আছে গড়ে দু'কিলোমিটার গভীর বরফের উপরে। বরফ কখনও তিন চার—সাড়ে চার কিলোমিটার পর্যন্ত গভীর আছে। পাথরগুলি পরীক্ষা করে দেখা গেছে সেগুলো আমাদের দেশের পাথরের মতোই। বিশেষ করে ধারওয়ার অঞ্চলে যেসব পাথর পাওয়া গেছে, সেই জাতের। খুব পুরোনো জাতের পাথর। এরকম পাথর আরো কোথাও কোথাও পাওয়া গেছে, আফ্রিকা সাউথ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ডে। এতে বোধহয় বিজ্ঞানীদের সেই প্রচলিত 'গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড'এর থিওরি পুনঃপ্রমাণিত হয়। ড্রিফট থিওরি তো আছেই। দক্ষিণ মেরু নিয়ে কাজ করতে করতে সেটি আরো বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়, যে আগে একসঙ্গে ('গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড' এই কল্পিত নামে) একটি বিশাল ভূখণ্ড ছিল যা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, সমুদ্রের জল এসে ভরেছে ফাঁকগুলো

যদি মন দিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রের দক্ষিণ মেরুর দিকের রূপরেখা পরীক্ষা করে দেখি, দেখব, প্রায় জিগ্‌-স-পাজ্‌লের মতো জোড়া লেগে যাচ্ছে যেন। সুদীপ্তা বললে, চিলি আর্জেন্টিনার দিকেই কুমেরু মহাদেশের প্রধান মানুষবসতি। সত্যি, ম্যাপে দেখলুম ওঅডেলস সাগরের তীরে এক জায়গায় গিজগিজ করছে বেস্‌ক্যাম্পের পয়েন্ট। ভারতের ক্যাম্প যেখানে, সেখানে অবশ্য খুব বেশি নেই। উল্টোদিকে, রস্‌ সমুদ্রের দিকে তো বসতি আরোই কম বেশিরভাগ ক্যাম্পই ওই ওপাশে।

"মজা কি জানেন" সুদীপ্তা বলে, "মনে হচ্ছে রস্‌ সমুদ্র আর ওঅডেলস সমুদ্র এককালে এক ছিল, মাঝখানে দ্বীপপুঞ্জের মতো পাথুরে জমির মালা, সেতুবন্ধ বেঁধেছে। এখন প্রচুর পুরু বরফের নিচে সবটা ঢাকা তো, তাই বোঝা যায় না।" সৌরিন বললে,—"এটাও যদি বরফ ঢাকা হয়, ওটাও বরফ ঢাকা, তবে এটাকে স্থল ওটাকে জল বলেন কী উপায়ে সুদীপ্তা বললে, "মাপতে গেলে বোঝা যায়। একটার নিচে মাটি পাওয়া যায়—অন্যটার নিচে মাটি নেই। আরো বহু নিচে সমুদ্রপৃষ্ঠ পাওয়া যায়

আনন্দদেব এই সময়ে একটা দারুণ স্লাইড হাজির করে, তাতে ওই ড্রিফটের থিওরি দিব্যি জলের মতো আর মাটির মতো সোজা বোঝা যায় দেখতে দেখতে গরম চা-ও এসে পড়ে।

সুদীপ্তা বললে দিল্লি যাচ্ছে শিগ্গির! আমি তো হাতে চাঁদ পেয়ে যাই। চা খেতে ভুলে গিয়ে বলি, "ভাই, আমার কথাটা মনে রেখো। দিল্লি গিয়ে তোমার ডঃ কাশিমকে কি ডঃ এ পি মিত্রকে যদি একটু বলে দাও, আমার কথাটা! দক্ষিণ মেরুতে কি কবি-টবি দিয়ে কোনো কাজই নেই? নিদেনপক্ষে কুকুর? ঐ রুশেদের, কি যুধিষ্ঠিরের মতো, একজন বিশ্বস্ত ধার্মিক সহযাত্রী? না হয় ভারতই প্রথম পাঠাবে একজন কবিকে?" □

মহামারী আন্ত্রিক

চিকিৎসা, বিশেষজ্ঞতা ও আমলাতন্ত্র

আন্ত্রিক মহামারীর প্রকৃত চেহারা কী তা জানার জন্যে আমাদের রিপোর্টাররা উত্তরবঙ্গের কোচবিহার-জলপাইগুড়ি জেলা থেকে কলকাতার পাশে হাওড়া পর্যন্ত দূরের দূরের গ্রামে তন্ন তন্ন করে ঘুরেছেন।

সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা ঘোষণা করছি এই শিগেলা জীবাণুর আক্রমণকে 'অপ্রতিরোধ্য' বলে যে রটনা করা হচ্ছে তা ঠিক নয়। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এই জীবাণু নিজেই মারা যায় যদি রোগীর শরীরের ভিতরের জলের পরিমাণ দিন তিনচারও ঠিক রাখা যায়। অর্থাৎ রোগের শুরু থেকেই চিনি, নুন ও খাবার সোডা পরিমাণমতো মিশিয়ে খাওয়ালে শতকরা নব্বই জন রোগীকে বাঁচানো যেত।

এই সব শেখানোর জন্যে ১৯৮৩-র অগাস্ট মাসে জলপাইগুড়িতে একটি সেমিনার হয়েছিল— জলপাইগুড়ির সি-এম-ও-এইচ্-এর আহ্বানে। তাতে বিশেষজ্ঞরা পেপার পড়েন কিন্তু সেই সব কথা হেলথ সেন্টারের ডাক্তারদের জানানো হয় না। রাজ্যের স্বাস্থ্যবিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন, হেলথ সার্ভিসের ডিরেক্টর ছিলেন, কলেরা ইনস্টিটিউটের পরিচালকরা ছিলেন—কিন্তু এঁরা ত রোগীর চিকিৎসা করেন না। অনুপস্থিত ছিলেন শুধু তাঁরা—যাঁরা রোগীর মুখে জল আর হাতে সুচ দিয়ে তাকে বাঁচাবে।
এই সেমিনারে গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তারদেরও ডেকে যদি হাতে-কলমে রোগের সময় পানীয় জল তৈরি শেখানো যেত—তা হলেও বোধহয় বহু বহু রোগীকে বাঁচানো যেত। আন্ত্রিক মহামারী আমাদের জনসংযোগহীন বিশেষজ্ঞতার শিকার।

এই আন্ত্রিক মহামারীতে দেখা গেল কলকাতায় মন্ত্রীরা ও বিশেষজ্ঞরা তাঁদের করণীয় কাজ করতে পারেন নি অথচ আক্রান্ত জেলার ও অঞ্চলের রাজনৈতিক কর্মী, ডাক্তার, পঞ্চায়েতসদস্য ও সরকারী কর্মচারী মিলিত ভাবে এই রোগপ্রতিরোধে এগিয়ে এসেছেন।

বিশেষত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও জেলা হাসপাতালের ডাক্তাররা অসামান্য ধৈর্য ও সাহস নিয়ে প্রায় যুদ্ধ ক্ষেত্রের পরিস্থিতিতে রোগীদের চিকিৎসা করেছেন। তখনও তাঁদের কাছে বিশেষ ওষুধ পৌঁছয় নি, স্যালাইন যায় নি। তাঁরা স্যাম্পেলের ওষুধ সংগ্রহ করে হাসপাতালের ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের এই চেষ্টার সঙ্গে যদি কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞদলের ও রাজ্য সরকারের চেষ্টা যথাসময়ে মিলত তা হলে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কম হত।

গঙ্গার পাইপের জল কলকাতার গরিব মানুষজনের জীবনযাপনের প্রায় একমাত্র অবলম্বন। গ্রীষ্মের মাঝখানে বরাবর কলকাতায় কলেরা মহামারী হিশেবে দেখা দিত। গত কয়েক বছরে কলকাতার সেই বিখ্যাত মহামারী তার 'খ্যাতি' হারিয়েছে। তার জন্যে সরকার, জনস্বাস্থ্য বিভাগ ও কলেরা-ধরনের রোগ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। অনেকে রসিকতা করে বলেন, গঙ্গার পাইপের জলে ক্লোরিন দিয়েই কলেরা ঠেকানো গেল—এই ক্লোরিন এতদিন কোথায় ছিল?

কিন্তু এবারের 'আন্ত্রিক' মহামারী সরকারকে, জনস্বাস্থ্য বিভাগকে ও এমনকি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকেও বিমূঢ় করে দিয়েছে। প্রথমত, খবর অনেক পরে পৌঁছেছে। দ্বিতীয়ত, ব্যাপারটা বুঝে উঠতেও একটু সময় গিয়েছে। মনে হচ্ছিল—বর্ষার আগে গরমের সময় ত এ-রকম হয়েই থাকে। তৃতীয়ত, ব্যাপারটা বুঝে ওঠার পর সেটা সামলানোর ব্যবস্থা করতে সময় লেগেছে।

সরকারের এই হতচকিত অবস্থা সবচেয়ে ভালো বোঝা যায় মন্ত্রীদের বিবৃতিতে। প্রতিদিনই প্রায় বিশেষজ্ঞ দল আর স্টাডি টিম তৈরি হচ্ছে আর প্রতিদিনই আর এক বিশেষজ্ঞ দলের বিবৃতি পড়া হচ্ছে। আমরা সংক্ষেপে এ রকম একটা হিশেব বের করেছিলাম

২৩ এপ্রিল— বিশেষজ্ঞদের মিটিং

২৪ এপ্রিল—জেলাতে বিশেষ টিম পাঠানো হয়েছে।

২৮ এপ্রিল—জেলাতে চিকিৎসকদল পাঠানো হয়েছে।

৩০ এপ্রিল—রাইটার্সে বিশেষজ্ঞ সভায় তিনটি স্টাডি গ্রুপ ও চারটি ডাক্তারদল তৈরি হয়েছে।

৩ মে—৮টি আক্রান্ত জায়গায় স্পেশ্যাল টিম পাঠানো হয়েছে। ডাক্তার সীতেশ লাহিড়ী (ডিরেক্টর অব হেলথ) বলেন—পেটের সব অসুখ শিগেলা থেকে হচ্ছে না।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠতে পারে—এইসব মিটিং কলকাতায় হচ্ছে কেন ও রাইটার্সেই বা কেন। এই অসুখ কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ ও হাওড়ায় পর পর ছড়িয়েছে। গ্রামের হেলথ সেন্টারে, মহকুমার হাসপাতালে ও জেলার হাসপাতালে ওষুধপত্র, যন্ত্রপাতির অভাব সত্ত্বেও, আলোহীন বাতাসহীন অবস্থাতেও ডাক্তাররা প্রাণপণে লড়াই করে রোগীদের জীবন বাঁচাচ্ছেন। মিটিং যদি হতেই হয় তবে হওয়া উচিত ছিল এই সব জায়গায়। এর চাইতে দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে যে দুর্গত এলাকায় যাওয়ার জন্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রীদের অপেক্ষা করতে হল বিনয় চৌধুরীর নির্দেশের জন্যে।

এ হয়ত আমাদের কলকাতাকেন্দ্রিক মানসিকতার এক বিকার। কলকাতায় ও রাইটার্সে মিটিং না হলে কোনো সমস্যা মিটবে মনে করা যায় না। এই আন্ত্রিক-মহামারীর প্রথম পর্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনসংযোগ বিভাগ এক ইংরেজিতে ছাপানো নির্দেশ জেলা ও ব্লকের ডাক্তারদের কাছে পাঠান। এই নির্দেশাবলি দেয়া হয়েছিল ছ-জন ডাক্তারের স্বাক্ষরে—এন. আর. এস. হাসপাতালের ডাঃ এ. কে. রায়চৌধুরী, আর. জি. করের ডাঃ এইচ. কে. পাল, এস. এস. কে. এমের ডাঃ ডি. এন. গুহমজুমদার, মেডিক্যাল কলেজের ডাঃ ডি. কে. বাগচী ও ডাঃ আর. এন. রায় এবং ট্রপিক্যালের ডাঃ কে. কে. মল্লিক।

এঁরা প্রত্যেকেই খুব বড় ডাক্তার। স্ব-স্ব ক্ষেত্রে

এঁরা নিজগুণেই স্বপ্রতিষ্ঠ। কিন্তু এই বিশেষ মহামারীতে এঁদের বিশেষজ্ঞতার প্রমাণ আছে বলে আমরা জানি না। এঁরা প্রত্যেকেই কলকাতার মেডিক্যাল কলেজগুলির প্রফেসর বা হাসপাতালের ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ। কিন্তু এঁরা কী পরামর্শ দিলেন ?

সেই নির্দেশাবলিতে 'বিশেষজ্ঞ-সুপারিশ' দেয়া হয়েছে—অ্যাসপিমিলিন-ও ফুরাজোলিডন ব্যবহার করার জন্যে আর মলত্যাগ করে হাতে সাবান দেয়ার জন্যে।

বিশেষজ্ঞদের নামে এই সুপারিশ কি সেই ডাক্তারদের পক্ষে অপমানজনক নয়—যাঁরা গ্রামে-গঞ্জে-শহরে অসামান্য ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে রোগীদের বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। আমরা একটু অবাক হয়েই ভাবছি—এই বড় ডাক্তারবাবুরাই বা তাঁদের নামে এ রকম একটা বিবৃতি বের করতে দিলেন কী করে ?

কিন্তু বিবৃতির বিভ্রাট শুধু এখানেই নয়।

শিগেলা-জীবাণু নিয়ে প্রায় অনুপ্রবেশের মামলা রুজু করা হয়েছে। অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ-এর ডাঃ এ কে চক্রবর্তী বলেছেন—এই বীজাণু নাকি ত্রিপুরা হয়ে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকেছে।

ঢুকতে পারে। জীবাণুর ভ্রমণপথ আবিষ্কার জনস্বাস্থ্যের একটি প্রধান কাজ। কিন্তু ডাক্তার চক্রবর্তীর ত উচিত ছিল—এই ভ্রমণপথটিই যে সত্য তা প্রমাণ করা। খবরের কাগজের বিবৃতিতে ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ সারা যায় না।

আমাদের মনে হয়েছে এই শিগেলা-জীবাণু নিয়ে বিভ্রাট এত বেশি হয়েছে যে স্থানীয় কারণ গুলি সম্পর্কে এমন কি বিশেষজ্ঞরাও অন্ধ থেকেছেন। আমরা গত সংখ্যাতে লিখেছিলাম ক্ষেতে ব্যবহৃত কীটনাশক জলের সঙ্গে মিশে এ-রকম অসুখ হতে পারে। পরে দেখলাম, সরকারের বিশেষজ্ঞরাও এ-কথা বলছেন। তেমনি, দেখা দরকার কোন্ কোন্ বিশেষ জায়গায় এই অসুখ হচ্ছে। কেন একই জেলার সর্বত্র হচ্ছে না, কতকগুলি জায়গায় হচ্ছে।

সেই সব জায়গায় অধিবাসীদের খাদ্যাভ্যাসের কোনো বিশিষ্টতা আছে কি ? এই কোনো প্রশ্নের উত্তরই বিশেষজ্ঞরা এখনো আমাদের দেন নি।

কিন্তু এরই বিপরীতে, বিভিন্ন জেলায় ডাক্তাররা, পঞ্চায়েত কর্মীরা ও অফিসাররা তাঁদের সমস্ত শক্তি দিয়ে এই মহামারী রোধের চেষ্টা করছেন। আমাদের সরেজমিন রিপোর্টে সে-কথা জানা যাবে।

অজেয়া সরকার

সরেজমিন রিপোর্ট : বাগনান-সাঁকরাইল

সাঁকরাইল হাসপাতালের বারান্দায় মাইক লাগিয়ে প্রচার চলছিল। বাগনান তখন জ্বলছে। এ প্রচারটা অন্য সময় হলে হাসপাতালের বাইরে গঞ্জের যে মানুষদের ভীড় তাদের ভ্রূ একটু কুঁচকে যেত বইকি। হাসপাতালের বাইরের তাসারূপ প্রচারটা মন দিয়েছে শুনছে। হাটুরে মানুষ চাঁপাতলা বাজারের দিকে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে একটু সময় দেয়। কিম্বা উল্টো দিক থেকে স্টেশনের দিকে যেতে যেতে অফিস যাত্রীরা থমকে ভেবে নেয় বাগনান থেকে সাঁকরাইল কত দূর।

তখনও সাঁকরাইল ব্লকে এ রোগ শুরু হয়নি। বাগনান আন্ত্রিক মহামারীর কবলে বিপন্ন। অন্যান্য জেলা থেকে রোজ মৃত্যুর খবর আসছে। বাগনান ফেরত ডাক্তারবাবুটি ডেন্টাল জি ডি এ সোমনাথকে ডেকে বলেন একটা কাগজে লিখে ফেলতে এখন গ্রামের মানুষের কি কি করণীয়। সোমনাথবাবু সেটা কাগজে লিখে হাসপাতালের সামনে লাগিয়ে দেন। তারপর মাইকে প্রচার শুরু করা হয়। সাঁকরাইল হাসপাতালে প্রচারটা ছিল এইরকম

পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় যে আন্ত্রিক মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে তা থেকে হাওড়া জেলা কিন্তু নিষ্কৃতি পায়নি। আপনারা শুনেছেন বাগনান, শ্যামপুর ব্লকের অবস্থা খুব খারাপ। সাঁকরাইলের জনসাধারণ এখন থেকে সাবধান না হলে কিন্তু সাঁকরাইলও বিপন্ন হবে...

(১) দয়া করে পুকুরের জল খাবেন না। যেখানে সেখানে এবং পুকুরের পাড়ে পায়খানা করবেন না। পুকুরে গবাদি পশু চান করাবেন না। প্রত্যেকবার সাবান দিয়ে হাত ধোবেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার চেষ্টা করুন। বাসনপত্র পরিষ্কার জলে ধোবেন।

(২) বাজারের কাটা ফল খাবেন না। তেলেভাজা খাবেন না। রাস্তায় বিক্রি করা জল, আইসক্রীম খাবেন না।

(৩) কুয়োতে ও পুকুরে ব্লিচিং পাউডার ছড়ান। টিউবওয়েলের জল ফুটিয়ে খান।

(৪) রক্ত আমাশা বা পাতলা পায়খানা, পেটে ব্যথা শুরু হলেই নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করুন। হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে যাবেন না।

রোগীরা হাসপাতালে আসছিলেন তার পরদিন থেকেই। এটা দু সপ্তাহ আগের কথা (এপ্রিল কুড়ি একুশ তারিখ)। রোগ শুরু হতেই যাঁরা আসছিলেন তাঁরা সংখ্যায় তখন খুবই কম। গাঁয়ের এইট পাস হাতুড়ে কিম্বা আধা ডাক্তারি পাস ডাক্তার দেখিয়ে চোখ ওল্টানো (Collapsed Condition) রোগীরা আসছিলেন সব। তবে শুক্রবার ৪।৫।৮৪ পর্যন্ত সাঁকরাইল হাসপাতালে আসা কোন রোগী মারা যায় নি। সাঁকরাইলে মাসিলা গ্রামের যে দুজন মারা গেছেন তাঁরা বাইরে চিকিৎসা করিয়েছেন।

গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা ব্যবস্থা, গ্রামবাসীর সাধারণ জীবনযাপন, স্বাস্থ্যজ্ঞান, অর্থনৈতিক জীবন, এবং রোগ সম্পর্কিত প্রাথমিক জ্ঞান ইত্যাদি পর্যালোচনার আগে আসুন অসুখটার চেহারাটা দেখে নেওয়া যাক। আমাদেরও খানিকটা ধারণা হোক।

প্রিভেনটিভ মেজার নিতে বলার জন্য স্বাস্থ্য সেবিকা মিসেস রায় কাছাকাছি স্কুলগুলোতে গিয়েছেন। হেড মিসট্রেসের সঙ্গে কথাও বলেছেন। সামনের রঙিন জলের দোকান, ফুচকা এবং কাটা ফলওয়ালাদের বিক্রি বন্ধ করতে বলা হয়েছে। বড়দি ক্লাস নাইন-টেনের মেয়েদের সঙ্গে সিস্টারকে কথা বলতে নিয়ে গেছেন। সবাইকে ভালোভাবে বোঝান হয়েছে। প্রত্যেককে স্কুলে আলাদা করে জল নিয়ে আসতে বলা হয়েছে। তখনও ব্লিচিং পাউডার, হ্যালোজেন ট্যাবলেট এসে পৌঁছয়নি। পরিস্থিতির সুযোগ অনেকেই নেবে—হ্যালোজেন ট্যাবলেট বাজার থেকে উধাও। দুটাকা দশ পয়সার Zeoline এখন নতুন ছাপ লাগিয়ে কোম্পানি পাঁচ টাকায় বিক্রি করছে। দুটাকা চল্লিশের Purin এখন তিন টাকা, তাও পাওয়া যাচ্ছে না কলকাতাতেই।

প্রদেশ স্বাস্থ্যদপ্তর তিন মিলিয়ন হ্যালোজেন ট্যাবলেট, পাঁচ লাখ Oral rehydration salt packs পেয়েছেন UNICEF থেকে বৃহস্পতিবার। বৃহস্পতিবারই স্যানিটারি ইনসপেকটর বললেন আমার অফিস ব্লক থেকে লোক এসে ব্লিচিং পাউডার, হ্যালোজেন চাইছেন। পঞ্চায়েতের লোকজনও বলছেন শোধনের কাজ ব্লিচিং-এর অভাবে...। তারপরই গাড়িতে করে হাসপাতালে ওষুধ আর ব্লিচিং পাউডার এলো। ব্লিচিং পাউডার দু টিন। তিন হাজার হ্যালোজেন ট্যাবলেট, ফুরাজলি ডিন তিনশ ট্যাবলেট, সেপট্রান তিন হাজার, কিছু টেট্রাসাইক্লিন এবং অ্যাম্পিসিলিন ক্যাপসুল। একশ বোতল নরমাল স্যালাইন। ওরাল হাইড্রেক্স পাঁচশ প্যাকেট।

প্রয়োজনের তুলনায় ওষুধ হয়তো কম। তবে এও যথেষ্ট। খুব গরীবদের ওষুধ জুগিয়ে উপকার করা যাবে।

শুক্রবার ৪মে, যা দেখা হল

শুক্রবার ৪মে ভোর পাঁচটা থেকে আটটার মধ্যেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সাঁকরাইলের হাওয়াপোতা গ্রাম থেকে আসা ছয় জনের চিকিৎসা করতে হয়েছে। তার মধ্যে তিনটি শিশু। তাদের কাউকেই স্যালাইন চালানো হয় নি। ওষুধ দেওয়া হয়েছে এবং সবাই বেঁচে যাবে। বৃহস্পতিবার সারাদিনে জনা দশেকের মতো রোগী এসেছে। দুজনকে I.V.drip দেওয়া হয়েছে। বাকিরা মুখে oral rehydration পাউডারের জল খেয়েছে।

এরপর বাগনান। বাগনান স্টেশনের পরিচিত তেলেভাজার দোকানটি যথারীতি রমরমা। ভাগ্যিস কাটা ফলের দোকান চোখে পড়ল না। বামা চরণের মিষ্টির দোকানে একটি কর্মচারী রসগোল্লার কড়াইয়ের ওপর অহর্নিশ পাখা নেড়ে নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছে। ওকে নাকি মাছি তাড়ানোর জন্যই

কক্ষে রাখা হয়েছে। বাগনান হাসপাতালে থাকতে থাকতেই তিনটে রোগী এল। একজনকে স্যালাইন দিতে হবে। রান্নার লোকটি ছুটে এসে বলল শুরু হয়েছে, পেট কামড়াচ্ছে সকাল থেকে চারবার। ওষুধ লেখা হল। বাগনান হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মী অশোক ভট্টাচার্য এবং তার ছেলে হাসপাতালে ভর্তি আছেন। বাচ্চাটির নাকি দুদিন আগেও অসম্ভব পেটে যন্ত্রণা হচ্ছিল। বছর পাঁচেকের বাচ্চাটি আটচল্লিশবার রক্ত আমাশা পায়খানার পর এখন সুস্থ। বাগনানের ডাক্তারবাবুদের প্রশংসা করতেই হবে। অশোকবাবু তাদেরই এক আক্রান্ত আত্মীয়ের বাড়ি গিয়ে অনিচ্ছায় খেয়েছিলেন। তখন তাদের বাড়িতে অবশ্য রোগ সেরে গেছে। তারা খুব পরিষ্কার করেই খেতে দিয়েছিলো। ফিল্ডে ঘুরে অশোকবাবুরও নাকি খিদে পেয়েছিল। সাংঘাতিক অনিচ্ছায় খেয়ে পরের দিন ছিয়ানব্বুইবার! বাগনান স্টেশনে, হাসপাতালে আসবার পথে কয়েকটি পোস্টার চোখে পড়ল। 'রুরাল হাসপাতালের ডাক্তারবাবু বদমেজাজি'। 'ডাক্তারবাবু প্রাকটিশ করে'। 'ডাক্তারবাবু অভদ্র আচরণ করেন'। ডাঃ চক্রবর্তী আমাদের জানালেন, এখানে এক অক্ষম সাংবাদিক আছেন। যার পাঠানো খবর কলকাতার একটি কাগজে শেষ পৃষ্ঠার শেষ কলমে খুব ছোট্ট হরফে কোন কোন দিন হয়ত বের হয়—তার স্বভাব হল রাজ্যের রোগী এনে নিজের বলে ডাক্তারবাবুকে অসময়ে বিরক্ত করা এবং কিছু হলেই কাগজে তুলে দেবে বলে তিনি হাসপাতালের সবাইকে চমকান। ডাঃ চক্রবর্তী কি কারণে তাকে বকেছিলেন। এখন কাগজ বন্ধ। সাংবাদিক দুধের সাধ ঘোলে মিটিয়ে বাগনানের পথে পোস্টার লাগানর ব্যবস্থা করেছেন। শুক্রবারই মহাকরণ থেকে আসা ডাঃ দত্ত বাগনান থেকে ফিরে যাচ্ছেন। বাগনানের সবাই সাংঘাতিক লড়েছেন। বাগনান হাসপাতালের বড়বাবু শ্যামল ঘোষ জানালেন উনিশ জনের মত মারা গেছে। আর· জি· কর· থেকে সেদিন দুজন ইনটার্ন এসেছেন ডাঃ চক্রবর্তীদের সাহায্য করার জন্য। অবশ্য মহামারী এখন পড়তির দিকে।

পর্যালোচনা

বাগনানের নামী ডাক্তার ডেন্টাল সার্জন ডাঃ হাজরাও বললেন, মশাই আপনারা তো কাট মারলেন। বাচ্চাদের যদি ড্রিপ দিয়ে যেতেন তবে কটা বাচ্চাকে আরও বাঁচানো যেত। বাচ্চাদের কাট ডাউন কি করে করব অথচ··· । এমনিতেই গ্রীষ্মে এবং বর্ষার শুরুতে প্রতি বছরই গঞ্জে কিছু গ্যাসট্রো এনটারাইটিস হয়। তিরাশি সালে বড় ঈদের ভোজের পরদিনই বাগনান হাসপাতালে তিরিশ জন চিকিৎসার জন্য এসেছিল। তাদের জনা দশেককে স্যালাইন চালাতে হয়েছে। সবাই বেঁচে গিয়েছিল। এটা নিশ্চয়ই মোট রোগাক্রান্তদের হিসেব নয় কিছু হাতুড়ে দেখেছে, কিছু রোগী প্রাইভেটে G.P.O. চিকিৎসায়ও ছিল। গত বছর এবং প্রতি বছরই পায়খানা বমিতে কিছু রোগী মারা যায়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কোন গ্রামে বাচ্চাদের রক্ত আমাশা, হাম শুরু হয়েছে। এবং এত সাংঘাতিক সে আক্রমণ যে দু এক দিনের মধ্যেই বাচ্চারা মারা গেছে। মহামারীর সঙ্গে হামের ঠিক

কথোপকথন ডঃ অম্বরীশ মুখার্জী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী

প্রতিক্ষণ : প্রতি বছরই বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত হন। রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি?

ডাক্তার মুখার্জি : দেখা গেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এদেশে শিশুমৃত্যুর কারণ ডায়েরিয়া। ২০০০ সালের মধ্যে প্রতি হাজার জন শিশুর মধ্যে মাত্র ৫০ জন বড় জোর মারা যেতে পারে—এরকম একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে ১৯৮২ সালে পশ্চিম বঙ্গ সরকার ও ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কলেরা অ্যাণ্ড এনটেরিক ডিজিজেস-এর পক্ষ থেকে রাজারহাটে প্রথম একটি স্টাডি টিম কাজ শুরু করে। কাজ তো এখনও চলছে।

প্রতিক্ষণ : কিন্তু এর ফলে রোগের প্রকোপ কি কিছু কমানো গেছে? বরং এ বছরের এরকম ব্যাপক আক্রমণ···

ডাক্তার মুখার্জি : না, ডায়োরিয়াকে নিশ্চিহ্ন করা যায় নি, তবে অন্যান্য বছরের সঙ্গে এ বছরের আক্রমণের তফাৎ হলো বিশেষ শিগেলা জীবাণুর উপস্থিতি, যেটি অন্যান্যবার নজরে আসে নি। এবারে রোগের দ্রুত প্রসারের কারণও এটাই।

প্রতিক্ষণ : এবারে সবাই কি শিগেলা জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত?

ডাক্তার মুখার্জি : না, তা নয়। সাধারণ ডায়েরিয়াও আছে। তবে সাধারণ ডায়েরিয়ায় আক্রান্তরা মরছেন না। কিন্তু তাদের সংখ্যাও যথেষ্ট।

প্রতিক্ষণ : যেসব পর্যবেক্ষক দল পাঠানো হয়েছিল, তাদের রিপোর্ট কি বলছে?

ডাক্তার মুখার্জি : এই মুহূর্তে বিস্তৃত রিপোর্ট দেওয়া যাচ্ছে না। পরে প্রকাশ করা হবে। তবে অনেকগুলো ক্ষেত্রেই শিগেলা জীবাণু রোগের কারণ হিসেবে ধরা পড়েছে। সচরাচর প্রচলিত অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধে একে কাবু করা যাচ্ছে না। তবে দেখা গেছে, রোদে এই জীবাণু ধ্বংস হয়।

প্রতিক্ষণ : কিভাবে এর মোকাবিলা করছেন?

ডাক্তার মুখার্জি : ওষুধপত্র তো প্রচুর পাঠান হচ্ছে—প্রতিষেধক এবং নিরাময়কারী ওষুধ। প্রতি জেলায় কন্ট্রোলরুম খোলা হয়েছে। ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মীরা ছাড়াও বিভিন্ন গণসংগঠন কাজ করছেন। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যনীতি মেনে চলার জন্য ব্যাপক প্রচার চালানো হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা এই রোগ মোকাবিলার জন্য একটা গাইড লাইন তৈরি করেছেন। চিকিৎসকদের কাছে সেগুলো পৌছনো হচ্ছে।

প্রতিক্ষণ : কোন কেন্দ্রীয় সাহায্য?

ডাক্তার মুখার্জি : কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ওষুধপত্র চাওয়া হয়েছিল। সব এখনও পাওয়া যায়নি। যেটুকু পাওয়া গেছে তাও রাজ্য সরকারকে কিনতে হয়েছে।
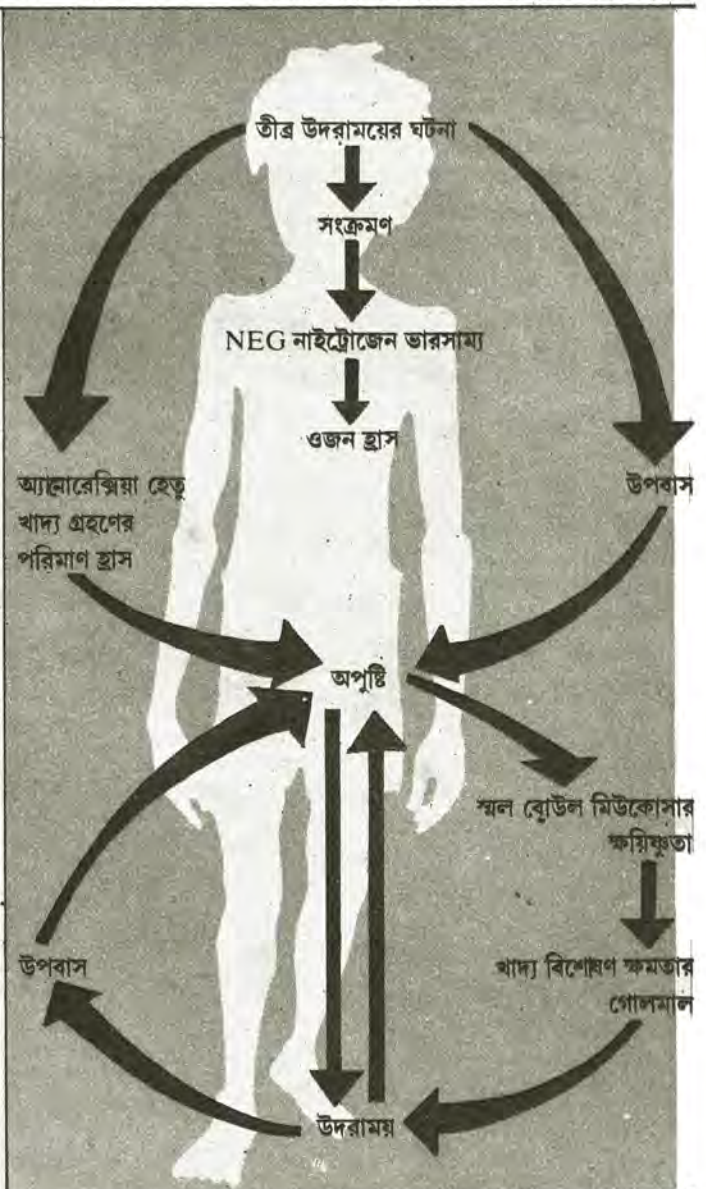
যোগাযোগ নেই এটা হতে পারে হাম বাচ্চার প্রতিরোধ ক্ষমতা আরও কমিয়ে দিয়েছে। এমনিতেই ম্যাল-নিউট্রিশনের শিকার আমাদের গঞ্জের শিশুদের ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি থাকেই, এর ওপর হাম… ।

সাঁকরাইল হাসপাতালে শুক্রবার অব্দি আসা কোন রোগীই মারা যায়নি। সবাইকে সারিয়ে তোলা হয়েছে। হাওড়া হাসপাতালেও কাউকে পাঠানো হয়নি। সাঁকরাইলে মাসিলা গ্রামে যাঁরা মারা গেছেন তাঁরা বাইরে চিকিৎসা করিয়েছেন। মাইকে প্রচারে ফল হয়েছে। ভয় পেয়ে কাছের মানুষরা শুরু হতেই এসেছেন, তাতে কাজের সুবিধে হয়েছে।

বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কথা হচ্ছিল রসপুর পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা বিভাগের চেয়ারম্যান শিক্ষক নিমাই মান্নার সঙ্গে। বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত লম্বা ধবধবে ফর্শা নিমাইবাবু কবি হিসেবেও যথেষ্ট পরিচিত। উনি বললেন বড় মহরার কিছু অংশে বিদ্যুৎ এসেছে। চাকপোতায় দুএক বছরের মধ্যে আসার কোন সম্ভাবনা নেই। ছোট মহরার মতোই চাকপোতায় টিউবওয়েল সর্বসাকুল্যে মাত্র চারটি। তিন হাজার মানুষের জন্য শুধু চারটি কল ? নিমাইবাবু বললেন, "আপনি তো তাও চারটি কল দেখছেন। কিছুদিন আগে তাও ছিল না। শেষ কলটা বসেছে ৭৮ সালে। চারটের মধ্যে দুটি এখন পরিত্যক্ত। আর দুটো কলের মধ্যে একটি প্রায় অকেজো—ঝিরঝির করে জল পড়ছে। অন্যটা তিন হাজার মানুষের ফুসফুসে ন্যূনতম বাতাসের সরবরাহ করে চলেছে।" এ সমস্যার সমাধান কিভাবে হবে ? "দেখুন আমরা গ্রামে থাকি, ভবিষ্যতেও থাকতে হবে। আমাদের সমস্যা আমাদেরই মেটাতে হবে।" তাঁর কাছ থেকে জানা গেল, পঞ্চায়েতের সাধ থাকলেও সাধ্য নেই, একটা টিউবওয়েল বসাতে খরচা পড়ে পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা। এখানে সাধারণ কল বসিয়ে লাভ নেই। ডিপ টিউবওয়েলের আধিক্যের জন্য জলের লেয়ার অনেক নীচে নেমে গেছে। এখানে দরকার সিলিণ্ডার কল। একটা সিলিণ্ডার কল বসাতে কয়েক হাজার টাকা লাগে। তাই ঠিক হয়েছে বর্তমান কলগুলিতেই সিলিণ্ডার পাইপ লাগানো হবে। এতে খরচ কম হবে, অর্থেরও সাশ্রয় হবে। রসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন এলাকায় সর্বমোট ন'টি সিলিণ্ডার কল বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চাকপোতার দক্ষিণপাড়া ও পুবপাড়ায় কাজ শুরু হয়েছে। আশু পানীয় জলের সরবরাহের জন্য পুকুরগুলিই ভরসা। পঞ্চায়েত থেকে পুকুরগুলি পরিষ্কার রাখবার জন্য আবেদন রাখা হয়েছে। মার্চের শেষ তারিখ পর্যন্ত ব্লিচিং পাউডার এসেছে মাত্র পাঁচ কেজি। তাই নেকড়ায় বেঁধে ঘাটের পাশে ডুবিয়ে রাখা হচ্ছে।

চাকপোতায় হোমিওপ্যাথির রেজিস্টার্ড ডাক্তার নেই। একজন কোয়াক ডাক্তার আছেন। উনি প্রয়োজনে স্যালাইন দেন। শুনে আঁতকে উঠতে হল।

সুমন সেন

সরেজমিন রিপোর্ট : হাওড়ার আমতা ব্লক

ইতিমধ্যেই আন্ত্রিক রোগের শিকার হয়েছেন ৪৫ জন। শিশুদের মধ্যে রোগের প্রকোপ বেশি হলেও বড়রাও বাদ যাচ্ছেন না। আক্রান্ত নারায়ণ ও নিমাই কর্মকারের তিরিশের বেশি বয়স। এই গ্রামের সাঁতরাপাড়া, কর্মকার পাড়াতেই রোগ ছড়িয়েছে। অন্য পাড়াগুলি থেকে এখনও কোন অসুস্থতার খবর মেলেনি। মাধ্যমিক পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে পরিক্ষার্থিনী বুলা সাঁতরা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। ওই এই রোগের প্রথম। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়ে ওকে সুস্থ করে তোলা হয়। কিন্তু পঞ্চু দলুই-এর চার বছরের মেয়েকে বাঁচানো যায় নি। দিন পনেরো রোগভোগের পর বাড়িতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। প্রবাস সাঁতরার দেড় বছরের ছেলে ও চার বছরের মেয়েকে আমতা সি· এইচ· সি'তে পাঠানো হয়েছে। ছেলের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক। খোশালপুরের এই দুটি পাড়ায় তপশিলী সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করেন বেশি। অপরিসর রাস্তা, দিনে অমাবস্যার অন্ধকারের মত বাড়ি, হাঁস মুরগি মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। এদের কারোর নিজের জমি নেই। কোন এককালে ছিল। এখন অন্যের জমিতে লাঙ্গল দিয়েই দিনগুজরান। এমনই একজন প্রবাস সাঁতরা, পঞ্চায়েতের পাকা অফিসে ওর সঙ্গে আলাপ হল। পঞ্চাশের বেশি বয়সের প্রবাস মিশমিশে কালো, বুকের প্রতিটি হাড় চরম দারিদ্রের প্রতিচ্ছবি। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে শরীর। অকালেই মাথার চুলে পাক ধরেছে। কাজকর্মের কথা জিজ্ঞেস করতেই করুণ হাসলেন। পরে বললেন, "এখন কোন কাজ নেই। জমি থেকে ফসল উঠে গেছে। এছাড়াও আমার মত আরো অনেকে আছে। দু মাস আগেও নিজের জমি ছিল চোদ্দ কাঠা, বড় মেয়ের বিয়ের জন্য চার হাজার টাকায় তাও বিকিয়ে গেল।" এখন প্রবাস সর্বস্বান্ত। দুপুরবেলা কি করে ভাত জুটবে তাই ও জানেনা, ওর কাছে ভবিষ্যতের ভাবনা আকাশ কুসুম কল্পনা।—এক লিটার জল ফুটিয়ে নিতে খরচ হয় পাঁচকিলো কাঠ। একটা হ্যালোজেন এক লিটার জলে, ব্লাকে বিক্রী হয় প্রতি ট্যাব দশ পয়সা। সমগ্র খোশালপুরে একটিই টিউবওয়েল, ডোবা বা পুকুরের দূষিত জল। খাদ্য নেই তার পচা বা বাসি—প্রবাস সাঁতরা, পঞ্চু দলুই, নিমাই কর্মকাররাই রোগে ভুগছেন। ওরাই আক্রান্ত।

চাকপোতার আর এক নিদর্শন

খোশালপুরের চার হাজার মানুষের জন্য বরাদ্দ কল সাতটি। এরমধ্যে চারটি কবে খারাপ হয়েছে কেউ বলতে পারল না। সাঁতরাপাড়ার কল থেকে সুতোর মত জল পড়ছে। ভালো আছে প্রাইমারি স্কুলের কলটি। গ্রামের মানুষ রাত এগারটা বারোটা পর্যন্ত লাইন দিয়ে জল নিচ্ছেন। অনেকের এ বালতি জল নিতেই এক দেড় ঘণ্টা চলে যাচ্ছে। কাজকাম প্রায় বন্ধ। চাকপোতার মতই এক দুপা এগোলেই ডোবা বা পুকুর, সবুজ কালোর অদ্ভুত মিশেল। কিছু বাড়ির মেয়েদের দেখলাম ওই জলেই বাসন ধুতে। পঞ্চায়েত সদস্য আব্দুল হামিদকে প্রশ্ন করতে বললেন পঞ্চায়েতের হাতে এমন টাকা নেই যা দিয়ে সব পুকুর সংস্কার করা চলে, এখন পর্যন্ত ব্লিচিং পাউডার এসেছে মাত্র পাঁচ কেজি। এ দিয়ে কি হয় বলুন। অন্তত একটি পুকুর কেন পানীয় জল হিসেবে ব্যবহারের জন্য সংস্কার করেন নি ? আব্দুল হামিদ এ প্রশ্নে একটু বিব্রত বোধ করলেন। স্বভাবতই কোন সদুত্তর পেলাম না।

দেবেন্দ্রনাথ প্রামানিকের সঙ্গেও কথা হল। উনি স্বাস্থ্য দপ্তরের হেলথ অ্যাসিসটান্ট হিসেবে নিযুক্ত আছেন। চারটি গ্রামের (খোশালপুর, চালতাখালি, রতনপোতা, দাঁড়াপুর) দশ হাজার মানুষের পা থেকে মাথা পর্যন্ত যাবতীয় অসুখের দেখভালের দায়িত্ব তাঁর উপর। তাঁকে একাজে সাহায্য করেন কম্যুনিটি হেলথ ওয়ার্কারেরা। উনি বললেন, দেখুন গ্রামের মানুষের আসল রোগটা হচ্ছে খিদের। ওটা মিটলেই অর্ধেক মুসকিল আসান, শুধু ওষুধ গিলিয়ে কী হবে। দেবেন্দ্রবাবুর কাছ থেকে জানা গেল কম্যুনিটি হেলথ ওয়ার্কারেরা পাঁচ হাজার মানুষ পিছু বছরে পান দুশো টাকার ওষুধ। "এই টাকায় বছরে একজন মানুষকে পাঁচটির বেশী হ্যালোজেনই তো দেওয়া যায় না। চিকিৎসা হবে কি দিয়ে বলুন।" চাকপোতার মতোই খোশালপুরের অভ্যন্তরে কোনো ডাক্তার নেই, একজন হাতুড়ে ডাক্তার অবশ্য আছেন।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্য :একটি নোটিশ

"আজ থেকে সমস্ত ওয়ার্ডে রোগী ভর্তি বন্ধ। যতদিন না পুনরাদেশ হয় ততদিন এই আদেশ বলবৎ থাকবে। ফিমেল ওয়ার্ডের জানলা খসে পড়ার জন্য এবং মেল ওয়ার্ডের সিলিং ভেঙে পড়ার জন্য এই আদেশ দেওয়া হচ্ছে।"

অনুমত্যানুসারে

২৫/৩/৮৪ সুমিত্র কুমার বিশ্বাস

খোশালপুরের সীমান্ত শেষে রামচন্দ্রপুরের শুরুতে খোশালপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। এই কেন্দ্রের ডাক্তার সুমিত্রবাবুকে এখনও ছাত্র বলা চলে। নীলরতন থেকে পাশ করে এখানে প্রথম পোস্টিং পেয়েছেন। এরকম নোটিশ কেন দিয়েছেন প্রশ্ন করতে বললেন, "এছাড়া দ্বিতীয় কোন রাস্তা থাকলে আমি অন্যভাবে ভাবতাম, ডাক্তারের ধর্ম আমি জানি, কিন্তু আমি নিরূপায়।"

প্রলয় চক্রবর্তী

জলপাইগুড়ি জেলায় আন্ত্রিক মহামারীর খতিয়ান

	ব্লকের নাম	প্রথম আক্রমণের তারিখ	প্রথম মৃত্যুর তারিখ
এক :	সদর মিউনিসিপ্যালিটি	নেই	নেই
দুই :	সদর ব্লক	২·৩·৮৪·	২·৩·৮৪
তিন :	ময়নাগুড়ি ব্লক	৭·৪·৮৪·	১৫·৪·৮৪
চার :	রাজগঞ্জ ব্লক	২১·৩·৮৪·	৫·৪·৮৪
পাঁচ :	ধূপগুড়ি ব্লক	২·৪·৮৪·	১১·৪·৮৪
ছয় :	মাল ব্লক	নেই	নেই
সাত :	মাটেলি ব্লক	২৪·৪·৮৪	২৭·৪·৮৪
আট :	নাগরীটা ব্লক	নেই	নেই
নয় :	আলিপুর দুয়ার ব্লক—এক	১০·৩·৮৪	২০·৩·৮৪
দশ :	আলিপুর দুয়ার ব্লক—দুই	৩০·৩·৮৪	৭·৪·৮৪
এগার :	সাতারিহাট ব্লক	২৫·৩·৮৪	৩০·৩·৮৪
বারো :	ফালাকাট্টা ব্লক	৫·৩·৮৪	১৭·৩·৮৪
তের :	কালচিনি ব্লক	নেই	নেই
চোদ্দ :	···· ব্লক	৫·৪·৮৪	১৫·৪·৮৪

—একটি বাড়িতে। সেখানে মীরা রায়কে তিনি দেখেন—প্রেসক্রিপশন লিখে চলে আসেন। কিন্তু খারিজা বেরুবাড়ির সাবসিডিয়ারি হেলথ সেন্টারকে তিনি কিছুই জানান না। অর্থাৎ সি-এম-ও-এইচ জানা সত্ত্বেও গ্রামের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে সতর্ক করা হয়নি।

শুধু তাই নয়। খারিজা বেরুবাড়িতে এই রোগের প্রাথমিক আক্রমণকে সীমাবদ্ধ করার কোনো চেষ্টাই হয় না। সেখানে কোনো সংগঠিত প্রচার করে লোকজনকে সতর্ক করা হয় নি, পানীয় জল ফুটিয়ে খাওয়ানোর জন্যে কোনো প্রচার করা হয় নি, ঘুঘুডাঙার হাটেও কোনো মিটিং-টিটিং হয় না।

রিজা বেরুবাড়ির স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ফার্মাসিস্ট কে-রায়চৌধুরী জানালেন, খারিজা বেরুবাড়ির যে-তিনটি গ্রামে এই আক্রমণ প্রথম ঘটেছে—সেই নীলফামারি, উদাপাড়া ও বরমতল গ্রামে কোনো ওষুধ, কোনো ও-আর-এম আক্রমণের প্রথম দিকে পৌঁছয় নি।

সি-এম-ও-এইচ অবিশ্যি এ-অভিযোগ স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, সব ওষুধই মজুত আছে ও যেখানে যা দরকার তা পাঠানো হচ্ছে।

কথা বলেই আমরা বুঝতে **পারছিলাম—সি-এম-ও-এইচ** একজন অফিসার **যিনি কাগজ** দেখে চিকিৎসা করেন, **মানুষের** চোখের দিকে তাকান না।

এরও প্রায় মাসখানেক পরে **ফালাকাটায় গিয়ে** দেখা যায় গ্রামে-গ্রামে **অবস্থা অত্যন্ত খারাপ কিন্তু সঙ্গী** ও সাহায্যের অভাবে ফালাকাটা **স্বাস্থ্যকেন্দ্রের** সরকারি ডাক্তারবাবু তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে পারছেন না। ডাঃ কুমারের নেতৃত্বে স্বেচ্ছা সেবকরা ক্ষীরের কোট, ডালিমপুর, মরু গাঁওয়ের

সরেজমিন রিপোর্ট : জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার

বাড়ি-বাড়ি ঘোরেন। তখনও সেখানে ওষুধপত্র

আন্ত্রিক মহামারীতে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত অঞ্চল—কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি। এর মধ্যে ফালাকাটার সংলগ্ন এলাকাটিকে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের সন্নিহিত এলাকাই বলা চলে। এই মহামারীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—একই সঙ্গে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে বটে কিন্তু সংলগ্ন এলাকাতেও অনেক সময় ছড়াচ্ছে না।

জলপাইগুড়ি শহর থেকে খারিজা বেরুবাড়ির দূরত্ব ছ-সাত মাইল। ঐ এলাকার ঘুঘুডাঙার হাট বেশ বড় হাট এই ঘুঘুডাঙা হাটেরই উল্টোদিকে হেলথ সেন্টার।

এই খারিজা বেরুবাড়িতেই সবচেয়ে প্রথম এ রোগের আক্রমণ ঘটে। জলপাইগুড়ি ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সম্পাদক সুব্রত সরকার জানান ২৫ মার্চ তাঁরা একজন ডাক্তারসহ খারিজা বেরুবাড়িতে যান। ২৭ থেকে ২৯ তারিখের মধ্যে তাঁরা ৬টি মৃত্যুর খবর পান।

এর আগে এই অঞ্চলে জেলার প্রধান স্বাস্থ্য আধিকারিক একজন 'বিশেষজ্ঞ'কে পাঠিয়েছিলেন পৌঁছয় নি, বা ও-আর-এমের প্যাকেট যায় নি। এই ২০ এপ্রিলেই গ্রামের ভিতর থেকে ফালাকাটা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজন বাচ্চাকে ভর্তি করার জন্যে প্রথম আনা হয়।

সরকারি প্রচার ও বিশেষজ্ঞদের সুপারিশে হ্যালোজেন ট্যাবলেট আর ORS প্যাকেটের জন্যে মারামারি চলছে। কিন্তু পরিবার পিছু একটা করে হ্যালোজেন ট্যাবলেটে ত মাত্র একটি দিনের সমাধান! জল ফুটিয়ে খাওয়া ও ORS বাড়িতে বানানো—এই দুটির প্রচার তার চাইতে বেশি দরকার।

জলপাইগুড়িতে এই রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ সংগঠনে আমাদের জন-চিকিৎসা ব্যবস্থার আমলাতন্ত্রও বড় বাধা। যেমন, খারিজা বেরু বাড়ির ২০,০০০ লোকের জন্যে ৪ জন মাল্টি পারপাস হেলথ ওয়ার্কার। মোট ২,১০,০০০ লোকের জন্যে ১ জন স্যানিটারি ইনস্পেক্টর থাকেন জলপাইগুড়ি শহরে। ১৯ এপ্রিল স্যানিটারি ইনস্পেক্টর তাঁর এলাকার জন্যে মাত্র ৩০ প্যাকেট পানীয় স্যালাইন কেনেন। প্রতি হেলথ ওয়ার্কার পান মাত্র তিনটি করে প্যাকেট। তার মানে হরির লুটের বাতাসার পদ্ধতিতে ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে এই প্যাকেটের জিনিশ রোগীদের মধ্যে বিলি করা সম্ভব নয়।

তদুপরি হেলথ ওয়ার্কাররা সিডিউল ড্রাগ ব্যবহার করতে পারেন না। ফলে যদি-বা ওষুধ শেষের দিকে পাওয়া গেছে সেটা ব্যবহার করার জন্যে রেজিস্টার্ড ডাক্তার পাওয়া দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়।

জনস্বাস্থ্যবিভাগের আমলাতন্ত্র ও বিশেষজ্ঞদের জনসংযোগহীনতার শিকার সাধারণ মানুষ এখন আকাশের বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আছে।]

প্রণবেশ ঘোষ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

জয় বাবা বিশ্বনাথ

পুজোর 'প্রতিক্ষণে' আমি একটি বিজ্ঞাপন পাঠিয়েছিলাম। সম্পাদক ভুলবশত সেটিকে গল্প বলে ছাপিয়ে দেন। শুধু তাই নয়, এতে পুজোর বাজারে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মতন গরিব ব্রাহ্মণ সন্তানের কিছু অর্থপ্রাপ্তিও ঘটে। সম্পাদকের ভুল বোঝার এই রমনীয় পরিণাম দেখে নাস্তিক হয়েও ঈশ্বরকে আমি মনে মনে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম।

বিজ্ঞাপনের আখড়ায় এক ওস্তাদের কাছে আমি কিছুদিন নাড়া বেঁধেছিলাম। সেখানে আমাকে কপি-লেখকের তালিম দেওয়া হয়। আমাদের দুপুরুষ আগে ইংরিজি হ্রস্ব আ-কার অনুসরণে যখন 'কালেজ' 'কাপি' লেখা হত তখন 'কপি' কথাটার কদর্থ হয়ে ল্যাং খাওয়ার ভয় তত ছিল না। কিন্তু কপি-লেখক হতে গিয়ে ইয়ারবন্ধুদের কাছে আমাকে বড়ই হেনস্থা হতে হয়েছে।

আপত্তি করায় একজন শব্দতাত্ত্বিক বন্ধু তো আমার চোখের ওপর ইংরিজি বাংলা নানা ডিকশনারি ঘেঁটে প্রমাণ করে ছাড়ল যে ইংরিজি আর বাংলা 'কপি'র উৎস আসলে এক। বলল ইংরিজি 'কপি'র অর্থ এককে অনেক করা, অর্থাৎ মূল থেকে নকল করা। আর ইংরিজি 'এক'কে ক্রিয়াপদে ব্যবহার করলে ল্যাজযুক্ত বাংলা 'কপি'র চেহারাটা অবশ্যই পরিষ্কার ফুটে ওঠে। এর নিকট জ্ঞাতি গ্রীকভাষার 'কেবোস' শব্দটি।

অতশত ভাষার ঘোরপ্যাঁচ আমার মাথায় না ঢুকলেও খোঁচাটা এমন গায়ে বিঁধেছিল যে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে কপি-লেখক হওয়ার আশা আমাকে ছাড়তে হয়েছিল।

ছেড়ে দিয়ে একপক্ষে ভালোই হয়েছে। কেননা লেগে থাকলে আমি যে কি রকম একজন ওঁছা কপি-লেখক হতাম, তার প্রমাণ পাওয়া গেল আমার লেখা বিজ্ঞাপনটি 'প্রতিক্ষণে' গল্প হিসেবে ছাপা হওয়ায়।

বিজ্ঞাপনের মূল কথাই হল, গল্পকে সত্যি বলে পাঠকদের খাওয়ানো। 'খাওয়ানো' কথাটা অভিজাত কাগজে ব্যবহার করতে হল বলে পাঠকদের কাছে মাপ চাইছি। শব্দটা নেহাৎ বাজারে। তবে বিজ্ঞাপনই বা কী এমন মহাভারত যে বাজারে শব্দ লাগালে তা অশুদ্ধ হয়ে যাবে!

খেই হারিয়ে ফেলার আগে এবার আসল কথায় ফিরে আসি।

আমাদের বাড়িতে দীর্ঘকাল ধরে

যাঁরা যাতায়াত করেন, তাঁরা গত দেড় বছরের বেশি দরজা দিয়ে ঢুকে সামনের দেয়ালে চোখ পড়তেই জানলার শিয়রে 'কী-যেন-নেই' 'কী-যেন-নেই' ধরনের একটা অস্পষ্ট শূন্যতা অনুভব করে থাকবেন।

সংক্ষেপে এই শূন্যতার ইতিবৃত্ত হল, দরজার রুজু রুজু জানলাটির শিয়রে দু দশকেরও বেশি সময়কাল ধরে শোভা পেয়ে আসছিল আমার বাবার একটি এনলার্জ-করা ফটো। তাও আবার হেঁজিপেঁজি লোকের তোলা নয়। স্বহস্তে সুনীল জানার তোলা। বছর দেড়েক আগে আমার বন্ধুপুত্র এক শিল্পীযশঃপ্রার্থী ছোকরা এসে আমাকে ধরে যে, বাবার ছবিটা তাকে দেওয়া হোক—ওটা দেখে সে একটা অয়েলপেন্টিং করবে। তার সময় লাগবে বড় জোর মাসখানেক।

শুধু বাবার নয়, আমার মা আর দাদাবৌদির ফটোও সে নিয়ে যেতে চায়। আমার আপত্তি ছিল না। শুধু ওর রোগা টিংটিঙে চেহারা দেখে আমার মায়া হচ্ছিল যে, বেচারা এমন গুরুভার একা বইতে পারবে তো!

অন্দরমহলে গিয়ে চুকলি করার লোকের অভাব হয় নি। সেটা বুঝতে পারলাম যখন বাড়ির ভেতরে আমাকে তলব করা হল। বাড়ির তিন পুরুষ এককাট্টা হয়ে জানিয়ে দিল যে, বাড়ির একটি ফটোও বাইরে যাবে না। আঁকতে হলে এখানে বসে আঁকুক।

কিন্তু আমি যদি একবার ওদের কথা মেনে নিই, পরে বাড়ির কর্তা হিসেবে আমার আর কোনো দাম থাকবে না।

তাই তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরে এসে বাবার ফটোটা খুলে নিয়ে ছেলেটির হাতে গছিয়ে দিয়ে এক রকম ঠেলেই ওকে রাস্তায় বার করে দিলাম।

সেই যে তার অগস্ত্যযাত্রা হবে কে জানত?

সময়কেও বলিহারি! কখনও কখনও সময় এমন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে যে, একটা পলক পড়তেই দেখা যায় কোথা দিয়ে দু'মাস তিনমাস পার হয়ে গেছে।

ফলে, বাড়িতে আমার যা অবস্থা হয়ে দাঁড়াল যে সে আর কহতব্য নয়। বউ মেয়ে ভাইপো ভাইঝি, মায় নাতি-নাতনিদের কাছেও আমি যেন চোরদায়ে ধরা পড়ে গিয়েছি।

লোকমুখে একে ওকে দিয়ে বার কয়েক খবর পাঠানো হল। কোনো উচ্চবাচ্য নেই।

ইতিমধ্যে যত দিন যায় আমার অবস্থা আরও করুণ হয়। ইহলোকে বাবার ঐ একমাত্র ছবি।

অগত্যা ফটো আর পাব না বলেই ধরে নিতে হল। খবর নিতে গিয়ে শুনলাম সুনীল জানাদের বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে। এখন একমাত্র উপায় নেগেটিভটা যদি উদ্ধার করা যায়।

কে একজন বলল টুনুদাকে বুড়ো বলের বাড়িতে খোঁজ করো। গেলাম বুড়ো বলের বাড়িতে। টুনুদা আছে? কে, সুনীল জানা? না, ও তো দিন দুই আগে চলে গেছে। কোথায়? আমেরিকায়। ছেলের কাছে। কবে ফিরবে? ও তো আর এদেশে ফিরবে না। আমেরিকা থেকে ফিরে যাবে লণ্ডনে। শোভা তো লণ্ডনেই প্র্যাক্টিস করছে। প্যাকাপাকিভাবে ওখানেই ওরা থাকছে। স্টুডিওটাও তুলে নিয়ে গেছে।

আমার চোখে তখন দেয়ালে ভেসে উঠেছে টুনুদার ছবি। সর্বংসহা মাসিমার মুখ। আমার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল দিল্লীতে।

ছেলেবেলা থেকে টুনুদা ছিল আমার কবিতার ভক্ত। জীবনে আমি প্রথম লজ্জাও পেয়েছিলাম টুনুদার কাছে। দুজনে আমরা তখন দুপার্টির লোক। হাজরা পার্কে সম্মেলন হচ্ছে। দলের নেতার প্ররোচনায় পবিত্র রাজনৈতিক কর্তব্যবোধে আমি জাল ভোটপত্র বিলোচ্ছি, এমন সময় অন্ধকারে টুনুদা এসে হঠাৎ আমার হাতদুটো ধরে যেই 'ছিঃ' বলেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু ফেলে দিয়ে রণছোড় হয়ে ছুটতে ছুটতে আমি সটান বাড়ি ফিরে এসেছিলাম।

সারা জীবনে টুনুদার এত স্মৃতি মনের মধ্যে জমে আছে। টুনুদা শেষকালে দেশ ছেড়ে চলে গেল?

তার মানে, বাবার ছবি পাওয়ার একমাত্র সম্ভাব্য সূত্রটাও নষ্ট হয়ে গেল। বাড়ির সবাই এমনভাবে আমার দিকে তাকাতে লাগল যেন আমি কুলাঙ্গার, বংশের মুখে চুনকালি মাখিয়েছি।

লেখার দোষে বা যে কারণেই হোক, গল্পের বকলমে আমার বিজ্ঞাপনটি মাঠে মারা গেল। যাকে আবেদন করে লেখা সে আমার কথায় কোনো কর্ণপাতই করে নি।

ফলে ইদানীং আমি অনবরত বাড়ি থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম।

সেদিন কাশী থেকে ফিরে সবে বাড়ির ভেতর পা দিয়েছি, এমন সময় বাড়িসুদ্ধ সবাই হৈ হৈ করে উঠল। 'বাইরের ঘরে একটা জিনিস, দেখেছ?' আমি বললাম। 'না, কী?' আমাকে টানতে টানতে বাইরের ঘরে এনে ওরা বাবার ফটোটা দেখাল। আমি আগে দেখি নি, কারণ এতদিনে বাড়িতে মাথা নিচু করে ঢোকাই আমার অভ্যেস হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আমি বললাম, 'দেখলে, আমি বরাবর বলছিলাম ছবিটা দিয়ে যাবে।'

'দিয়ে যাবে! পুনপুন গিয়ে গলায় রসুড়ি দিয়ে না আনলে বাবার ও ছবি আর পেতে হত না।' দাঁতে রেখে কথাটা কে বলল নিশ্চয় কাউকে বলে দিতে হবে না।

রান্নাঘর থেকে সুধা বলে উঠল, 'ভাগ্যিস কাশী গিয়েছিলেন। তাই ছবিটা পাওয়া গেল বাবা বিশ্বনাথের কৃপায়।'

কে জানে, হতেও বা পারে। □

শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

ছবিকে শব্দের কাছে

বৃষ্টি থেমে গেছে তাই চাঁদ উঠে এল
হারানো বাছুর যেন ফিরে এল মাঠে,
তিনটে নারকোলগাছ, পেছনে আকাশ
গগ্যাঁর ছবির মতো ফোড়া-পাকা আলো—
তোমার রচনা তুমি লিখে যাও অস্পষ্ট আলোয়।

ফ্রকপরা মেয়ে যেন ইশ্‌কুলে না গিয়ে
ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে যায় শেষ তারাগুলি
এদিকে বিশাল বাস হর্ন দেয় গেটে
ওকে বলে দাও, খুকু দু'দিন যাবে না—
তোমার রচনা তুমি লিখে যাও অস্পষ্ট আলোয়।

কলকাতার একমাত্র পাখি হোল কাক
এবার তাদের কথা শুরু হওয়া মানে
'কী খাই কী খাই' চোখে বেরোবে মানুষ
নীরব নির্জন রাস্তা লোকে ভরে যাবে—
ছবিকে শব্দের কাছে ঠেলে দাও অস্পষ্ট আলোয়।

টপাটপ বাতি নেবে, ধোঁয়া উঠে এল
চিলস্বরে বেজে ওঠে কারখানার বাঁশি।
শতাব্দীর গণতন্ত্র এঁকে চলেছেন
এম· এফ· হুসেন তাঁর অনবদ্য ছবির ফাঁকিতে।

ভোর নিয়ে

রামকেলি সুর সাধে বহুতল ফ্ল্যাটের কিশোরী
একটু দূরে বৃক্ষের শিখরে
হতবাক স্তব্ধ চিল
ভোরের প্রথম ট্রেন
ঐতিহ্য মাড়িয়ে চলে যায়।

এবং সন্ধ্যা

মোটরগাড়িরা হাঁটে গুটিগুটি ছারপোকার মতো
মোটরগাড়িরা ফেরে সন্ধেবেলা ছারপোকার মতো গুটিগুটি
ছাদ থেকে দেখি।
নিজের চারদিকে ঘোরে পৃথিবীও
খুব ধীরে ধীরে—
খুব ধীরে ধীরে সন্ধে হয়
ছাদ থেকে আমি তার অবসন্ন ঘর্ঘর ঘর্ষণ শুনতে পাই।

কুড়ি

বিপুল বলে ওঠে, 'ব্যাস, হয়ে গেল, বাবা হ্যাঁ বলেছে, দিদাও হ্যাঁ বলেছে, আর তোমার না করার উপায় নেই। কাল গিয়েই বলে দেবে'

'কাকে বলে দেবে'—লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করে।

'কৌশিককে, কৌশিকের বাবাকে',

'কী বলে দেবে'

'ঐ যে কৌশিক আর আমি এক জায়গায় থাকব—'

খাওয়া-দাওয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। ভাত দেয়া, ডাল দেয়া ইত্যাদি চলতে থাকে, সঙ্গে খাওয়া আর কথাও। বিপুলের কথায় লক্ষ্মী হো হো করে হেসে ওঠে, 'দেখো, ওর বুদ্ধি দেখো, ওকে আর কৌশিককে এক জায়গায় রেখে পড়ানোর জন্যেই কৌশিকের বাবা অস্থির হয়ে আছে'

অনুকূল ছেলের দিকে তাকিয়ে হাসে।

'তা হলে পিসিই সব ঠিক করে নেবে। আজ ত আমরা পিসির সঙ্গে চলে যাই, তারপর পিসি সব ঠিক করবে'

'সে ত ভালই হয়', পিসিমা হঠাৎ কথা শুরু করেন, 'তোমরা কও আমার দাদুর বুদ্ধি নাই, আমি ত দেহি অরই সবার থিক্যা বেশি বুদ্ধি'

অনুকূল আবার ছেলের দিকে তাকিয়ে হাসে। অনুকূলের হাসির জবাবে হাসি দিয়ে বিপুল বলে, 'দিদা থামলে কেন, চালিয়ে যাও, চালিয়ে যাও' অজ্ঞাতেই আপেক্ষা করে, কখন ঢোক গিলে পিসিমা বলবেন। পিসিমার ঢোক গেলার আওয়াজ বেশ জোরে হয়, যেন খুব বড় কোনো বাধা ঠেলে খাবারটাকেও ভিতরে পাঠাতে হয় পিসিমাকে।

'ঐ যে আমার সোনাদাদু যে কইল', পিসিমা আবার চিবুনোর শব্দ তোলেন, চিবিয়ে যান।

'তার থিক্যা দুই ছাওয়ালরে নিয়্যা ঝিমলি থাকুক', পিসিমা কথা শেষ করেন।

'সে ত এখানেও থাকতে পারে', লক্ষ্মী পিসিমাকে বলে।

'পারে ত পারব। সে ত ভালই হয়। সবাই এক জায়গায় থাইক্‌ল'

'তা হলে আর দুই ছেলে নিয়ে থাকবে কী করে ? আপনার নাতি কি গিয়ে ঐ বাড়িতে থাকবে ?'

'এইখানে থাইকলে ঐ এক বাড়িই হইল, এই দাদু যাইব, ঐ দাদু আইসবে, ঝিমলি আইসবে, মুক্তিও আইসবে। কিন্তু সে না কোন ইস্কুলে পড়ে— ?'

'কে', লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করে।

'ঐ যে ঝিমলির পোলাডা'

'হ্যাঁ, সে ত কলকাতায় পড়ে'

'তয় ? সে কি আর কইলকাতার ইস্কুল ছাইড়্যা এইখানে আইসবে'

'তাই ত বলছে, কলকাতাতেই ঝিমলি থাকুক' আপনার নাতিও গিয়ে কলকাতায় পড়ুক'

জীবনচরিতে প্রবেশ

দেবেশ রায়

চতুর্থ ভাগ / দুই

'চালাব আবার কী, আমি ত কথা কইত্যাছি সোনাদাদু'

'সেইটাই চালাও, থামছ কেন ?'

'তুমি ত ঠিকই কইছ দাদু। এদ্দিন পরে পিসি যদি ঐ বাড়িতে যায় তা পোলাডা থাকব কইলকাতায় আর ও কি ভূতের বাড়ি পাহাড়া দিবে ?'

পিসিমা থেমে যান। এমন কি বিপুলও কোনো কথা বলে না। এতক্ষণে ঝিমলির অবস্থাটার সত্য সবার সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ে। কৌশিক হস্টেলে থেকে পড়ছে, নামকরা ভাল স্কুল, হস্টেলে না থাকলে সেখানে পড়া যায় না। তা হলে, ঝিমলির ফিরে যাওয়ার মানে, মুক্তি বোসের সংসারে ফিরে যাওয়া। যেন, মুক্তি বোস আর ঝিমলি, কৌশিকের বাবা-মা, দুজনে মিলে শলা-পরামর্শ করেই কৌশিককে কলকাতার ঐ স্কুলে হস্টেলে রেখে পড়াচ্ছে, যাতে ছেলে পড়াশোনায় ভাল হয়, ভাল রেজাল্ট করে। তার যে কষ্ট, ছেলে ছেড়ে থাকার যে-কষ্ট সে ত দু জনকেই ভাগ করে নিতে হবে। এখন থেকে মুক্তি বোস আর ঝিমলি সেই কষ্ট ভাগাভাগি করে নেবে। এতদিনও কৌশিককে ছেড়ে থাকার কষ্ট মুক্তি বোস আর ঝিমলি সয়েছে—কিন্তু আলাদা আলাদা করে। ঝিমলি ছেলের মুখটুকু দেখতে পায় নি দশ-দশটা বছর। মুক্তি বোসের ত বলতে এক কৌশিকই আছে—তাকেও ছেড়ে থাকতে হয়েছে। কিন্তু, সেই কষ্টের মধ্যে উদ্বেগ ছিল অনেক বেশি। ঝিমলি কি কোনোদিনই আর কৌশিককে দেখতে পাবে না—এই উদ্বেগে কৌশিকের ওপর নিজের অধিকার কায়েম করতে চেয়েছে। মুক্তি বোস আগলে রাখতে চেয়েছে। এখন থেকে তারা একই রকম উদ্বেগ ও অধিকারে ভুগবে। কৌশিকের জন্যেই মুক্তি বোসের কাছে ফেরার অর্থ মুক্তি বোসের সঙ্গে সে থাকবে এখানে আর কৌশিক তার পড়াশোনার জন্যে যেখানে ছিল সেখানেই।

'তার থিক্যা ত এইডাই ভাল', পিসিমা থেমে যান। মনে হল, তিনি বিপুলের প্রস্তাবকেই ইঙ্গিত করে থামলেন।

লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করে, 'কোনটা'

পিসিমা উত্তর দেন না। কিন্তু তাঁর চিবুনোর শব্দ পাওয়া যায়। সকলে

'সে ত এক পায়ে খাড়া, এই বুদ্ধিটাই ত ভাল'

বলতে-বলতে পিসিমা তাঁর খাওয়ার বাটিটা নীচে রেখে উঠে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নেন। তাঁকে পেছনের খুঁটিটা একটু [illegible]তে হয়। এত বড় শরীর বলে ঘুরে ধরতে তাঁর একটু কষ্ট হয়। ঝিমলি বলে ওঠে, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান।' কিন্তু ঝিমলিরও এ-রকম লেপটে বসে খাওয়ার অভ্যেস নেই—উঠতে গিয়ে তাকে বসে পড়তে হয়। ততক্ষণে লক্ষ্মী গিয়ে বাঁ হাতে পিসিমার বাঁ হাতটা ধরে। তখন আর দরকার ছিল না—পিসিমা দাঁড়িয়ে গেছেন। লক্ষ্মী পিসিমার বাহুটা আলগা করে ছুঁয়ে থাকে আর পিসিমা অন্ধের মত তাঁর ঘরের দিকে হাঁটেন। ঝিমলিও ঐ দিকেই তাকিয়েছিল। বিপুল বলে ওঠে, 'তা হইলি দিদা, ঐ কথাডই থাইকল'—

বিপুল এমন আচমকা পিসিমাকে ভেংচে ওঠে যে সকলেই হেসে ফেলে, পিসিমাও হাসার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি তখন এদের দিকে পেছন ফিরে। ঘুরে আর এদিকে তাকান না। কিন্তু হেসে যান। লক্ষ্মী হাত ছেড়ে দেবে কিনা বুঝতে পারে না যেন এমনভাবে হাসে। পিসিমা বলে ওঠেন, 'আমারেও তোমার সঙ্গে নিয়া যাইও কিন্তু দাদু'।

পিসিমা নিজের ঘরের দিকে পা ফেলেন।

বিপুল তার বাবার দিকে তাকিয়ে বলে, 'বাবা, এবার তোমার—'

অনকূল একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে ওঠে, 'আমার আবার কী, আমি কিছু না, আমি না'

বিপুল চেপে ধরে, 'তা চলবে না বাবা, পর পর হবে, প্রথমে দিদা, তারপর তুমি'

লক্ষ্মী এসে বসে না। দাঁড়িয়ে থালাগুলো গুছিয়ে এঁটো পরিষ্কার শুরু করে।

ঝিমলি বলে ওঠে, 'এই দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি করছি'

লক্ষ্মী বলে, 'থাক, তোমাকে আর করতে হবে না, পিসিমাকে ধরার জন্যে উঠতে গিয়ে ত উঠতে পারলে না'—বলে লক্ষ্মী হেসে ফেলে, ঝিমলিও।

ঝিমলি বলে' 'সত্যি কী মোটা হয়েছি'

লক্ষ্মী বলে, 'মোটা আবার হয়েছ কোথায়' তুমি বরাবরই এ-রকম, অভ্যেস নেই ত করবে কী? তুমি ত ওর টেবিলেও খেতে পারো—'

'কী যে বলো না', বলে ঝিমলি ওঠে আর বিপুল 'মা' 'মা' বলে চিৎকার করে ডাকে। লক্ষ্মী তাকালে দেখা যায় বাঁ হাতে অনুকূলের ডান হাত চেপে ধরে আছে বিপুল, যাতে অনুকূল উঠে পড়তে না পারে, 'বাবাকে যেই বলেছি দিদার পরে এবার তোমাকে বলতে হবে অমনি বাবা কাটার তালে আছে। বাবাকে বলতে হবে'

'কি বলব'

'পিসি আমাকে আর কৌশিককে নিয়ে কলকাতায় থাকবে কি থাকবে না'

'সে ত তোর পিসি থাকবে, পিসি ঠিক করবে'

'না, তোমাকে একটা ভোট দিতে হবে'

লক্ষ্মী বলে ওঠে, 'যা ত মুখ ধুয়ে নে, এখন আর ভোট করতে হবে না'।

পিসিমা বিছানায় গড়িয়ে পড়েছেন, ঝিমলি মশারি গুঁজে দিয়েছে। ঝিমলির ইচ্ছে করছিল বারান্দায় বসে থাকতে। সে জানে, এখন গিয়ে শুলে তার কিছুতেই ঘুম আসবে না। কিন্তু সে ঘরে না গেলে পিসিমাও ঘুমোতে পারবেন না। বিছানায় শোবেন, ঝিমিয়েও পড়বেন, কিন্তু মাঝেমধ্যেই চমকে-চমকে উঠে ঝিমলিকে ডাকবেন।

ঝিমলি তাই পিসিমাকে শুইয়ে, পিসিমার মশারির পাশেই চৌকাঠে হেলান দিয়ে, পা ছড়িয়ে বসে। গল্পে-গল্পে পিসিমা যদি ঘুমিয়ে পড়েন আর তখনও যদি ঝিমলির বাইরে বসে থাকতে ইচ্ছে করে—সে বসে থাকতে পারবে।

শুয়ে পড়তে-পড়তে পিসিমা বলেন, 'মুক্তির এই বুদ্ধিটা হইছে ভালই, তাও ছেলেডারে দেখতি পারবি'

ঝিমলি জবাব দেয় না। কৌশিকরা ত মাত্র আজ এই সন্ধ্যাবেলাতেই এসেছিল। মাত্র দু-ঘণ্টাটেক আগে। কিন্তু, তার পর থেকে এ নিয়ে কথাবার্তা এমনই চলছে, মনে হয়—অনেক দিনের অনেক কিছুর পর আজ সন্ধ্যায় যেন একটা নিষ্পত্তি হয়ে গেল। কিন্তু, কাল যদি বিপুলের জন্যে অপেক্ষা না করে ঝিমলি বাসের জন্যে বেরিয়ে পড়ত, তা হলে মুক্তি বোসের সঙ্গে তার দেখাই হত না। তা হলে কৌশিকের সঙ্গেও তার দেখা হত না। কিন্তু তার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই ত মুক্তি বোস কৌশিককে কলকাতা থেকে চলে আসতে লিখেছে। যদি তা না-লিখত তা হলে কৌশিক ত আজ পৌঁছুতেও পারত না। তা হলে, যদি কাল, ঝিমলির সঙ্গে মুক্তি বোসের দেখা না হত, বা, ঝিমলিই যদি দেখা না করত, তা হলে, কৌশিককে নিয়ে মুক্তি বোস তার পেছনে-পেছনে ছুটত? শিলিগুড়িতে দাদাদের কাছে খোঁজ নিত? তারপর হলদিয়াতেও যেত? সেটা বংশীর বাড়ি বলেও যেত? নাকি, ঠিকানা জোগাড় করে নিয়ে, যেখানে ঝিমলি থাকত—সেখানেই যেত? পিসিমা ত সেই কথা বলেই কাল ঝিমলিকে মুক্তি বোসের সঙ্গে কথা বলতে পাঠালেন। কথা যখন বলতেই হয়, তা হলে ঝিমলির এই বাড়িতেই হোক।

মনে-মনে ঝিমলি প্রস্তুত হচ্ছিল, এই সব কিছু তাকে একবার বুঝে নিতে হবে, একা একা, কিন্তু মনে-মনে ঝিমলি এটাও মেনে নিয়েছিল, সব কিছু ত সে বুঝে নিতে পারবে না, একা-একাও।

ঝিমলির বিশ্বাস এসে গিয়েছিল, এক-দুই-তিন-চার করে ভেবে-ভেবে কিছু ঠিক করা যায় না। এক-একটা জিনিস আগে থাকতেই ঠিক করা থাকে। যেমন, সমুদ্রের ঢেউ। তুমি ডুব দিয়ে সেটাকে পার করে দেবে, নাকি, একটু লাফ দিয়ে সেটা পেরিয়ে যাবে—সেটুকুই মাত্র নির্ভর করে ঢেউয়ের আকার, গতি, বেগ ও তোমার ক্ষিপ্রতা, সাহস ও ইচ্ছের ওপর। কিন্তু ঐ টুকুই। এই দুইয়ের মধ্যে সব সময় যদি সংযোগ ঘটে যায় তা হলে কোনো সময়ই কোনো দুর্ঘটনা না ঘটতে পারে। যদি সংযোগ না ঘটে তা হলে দুর্ঘটনা ঘটতেও পারে। কিন্তু সেই না-ঘটা বা ঘটা দিয়ে—ঐ দুটো ঘটনার ভিতরে কোনো কার্যকারণ তৈরি করা যায় না। প্রত্যেকটি ঢেউ স্বাধীন, স্বতন্ত্র, সার্বভৌম, বিচ্ছিন্ন। সেই ঢেউয়ের সঙ্গে প্রত্যেকটি সংঘাত, স্বাধীন, স্বতন্ত্র, সার্বভৌম, বিচ্ছিন্ন। ঝিমলি এখন বুঝে নিতে চায়—তাকে কী করতে হবে।

কিন্তু, এটা ঝিমলির নিজেরও জানার বাইরে ঘটছে। গত দশ বছরের জীবন ঝিমলিকে এই রকম একটা বোধে এনে ফেলেছে। ঝিমলির ভিতরে-ভিতরে একটা প্রস্তুতি তৈরি হয়ে গেছে যে সে কোনো ঘটনা শুরু করতেও পারে না, কোনো ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করতেও পারে না, সম্ভবত কোনো ঘটনা শেষ করতেও পারে না।

অথচ, শারীরিক অভ্যাসেই যেন অনেকটা, ঝিমলি বুঝেও নিতে চাইছিল, জানত, তাকে একা-একা একটু বুঝে নিতে হবে।

সে নিজের মনেই উচ্চারণ করে, 'ওরা এখন এইসব বলতে শুরু করল কেন'

কথাটা বলার পর ঝিমলি পিসিমার কাছ থেকে একটা উত্তরও প্রত্যাশা করে। কিন্তু উত্তর না পেয়ে বোঝে, পিসিমা ঘুমিয়ে পড়েছেন। সে পা একটু বেশি ছড়িয়ে দেয়, পিঠটায় একটু বেশি হেলান দেয়। 'ওরা' বলতে ঝিমলি ত কৌশিককেই বোঝাল। কথাটার এ-রকম মানে দাঁড়াতে পারে যে মুক্তি বোস কৌশিক মিলেমিশে যেন এই বুদ্ধি করেছে।

মুক্তি বোসের কথাটা আলাদা করে ভাবতে চায় না বলেই ঝিমলি 'ওরা' ভাবল। কিন্তু ভেবে সে শুধু কথাটাকে নতুন মূল্য দিল। সে কৌশিককে মুক্তি বোসের সঙ্গে এক করে দেখছে না—এখন এই রাত্রিতে ঝিমলি এই চৌকাঠে হেলান দিয়ে অন্ধকার বারান্দায় তার বিপরীত কোণে কৌশিককে দেখতে পায়—সে জল ঢেলে দিচ্ছে আর আঁজলা করে নিয়ে কুলকুচি করে মুখের ভিতর থেকে তিলের নাড়ু বের করছে। ঝিমলি হেসে ফেলে। কৌশিক কেমন যেন নরম, একটুতেই ভেঙে পড়বে। হাসিই পায় ঝিমলির, এখনও তার এখন কিছুতেই মনে পড়ে না—আজ সন্ধ্যা থেকে কৌশিককে ঝিমলির শেষ দেখার মাঝখানে দশ-দশটি বছর। এখনও ঝিমলির মনে পড়ে না, কৌশিককে দেখার পর কোনো মুহূর্তে তার মনে পড়েছে কিনা এই দশ-দশটি বছরের কথা। কৌশিকের এই আলগা, ঢিলে, একটু আনমনা, একটু হেসে ফেলা, নরম, কোনো কাজ না-পারার ভঙ্গিটা যেন গত দশ-দশটি বছর ধরেই ঝিমলি দেখে আসছে। লক্ষ্মী ঠিকই বলেছে, কৌশিককে দেখলে আর ঠিক থাকা যায় না। এই এতক্ষণে, এই একা বসে, পিসিমা ঘুমিয়ে যাবার পরে ঝিমলি কৌশিককে নিয়ে একটু গোপন গর্ব বোধ করে ফেলে।

মশারির ভিতর পিসিমা গায়ে চড় মেরে মশা মারেন। তারপর শিথিল স্বরে বলেন, 'আইজ যে, না, আইজ না, কাইল যে মামলার রায় বেরোল, তরে কিছু কয় নাই মুক্তি, মামলার কথা?'

পিসিমা এতটা জেগে আছেন, ঝিমলি বোঝে নি। বারান্দার এখন অন্ধকার যে কোণটিতে কৌশিক দাঁড়িয়ে ছিল, সেখান থেকে ঝিমলি চোখ সরিয়ে আনে। পা একটু গুটিয়ে নিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, সে ত কাল বলল'

'কী কইল'

'হাকিম নাকি রায় দিয়েছে, ওদের উকিল আগের মতই আপত্তি দিয়েছে, হাকিম শোনে নি'

'এই কথাটাই জানাতি চায় তরে—তর বিপদ বুইঝ্যা তরে আরো বিপদে ঠেলতেছে না মুক্তি—এই কথাটাই জানাতি চায়'

বংশীর নামোল্লেখ না করে পিসিমা বংশীর মৃত্যুর কথা বললেন। তার মানে, বংশী বেঁচে থাকলে মুক্তি বোস এ-কথা বলতে আসত না। কিন্তু সেই না আসাটাকে ত অভিযোগ হিসেবে আনা যায় না মুক্তি বোসের বিরুদ্ধে। বরং মুক্তি বোস ত সেদিক থেকে যা করা উচিত, তাই করেছে। কোথাও তার কোনো কাজে কোনো অসঙ্গতি নেই। সে বরাবরই ডিভোর্সে আপত্তি দিয়েছে। হাকিম যখন তার কথা শুনেও ডিভোর্স দিয়েছে, তখন ছেলেকে নিয়ে এসে বলেছে, তুমি ফিরে এসো। কাল বিকেলে কোর্টের রায় প্রথম শুনে ঝিমলির মনে হয়েছিল—এটা মুক্তি বোসের চরম চাল, বংশীর মৃত্যুর পরে প্রথম তারিখেই তাকে ডিভোর্স দিয়ে দেয়া, যেন, নইলে ঝিমলি নিজেকে মুক্তি বোসের বৌ হিসেবে দাবি করত। অনেকক্ষণ পর্যন্ত এই সন্দেহটা তার মনের মধ্যে ছিল। কখন যে সেটা সয়ে গেছে সে টেরও পায়নি। নিশ্চয়ই মুক্তি বোসের কথায় নয়। কিন্তু কাল ও আজ সন্ধ্যায় মুক্তি বোসের চেহারা-কথায়, ছেলের সঙ্গে তার সম্পর্ক এ-সব থেকে কখন সেই সন্দেহ কেটে গেছে। মুক্তি বোস

সত্যিই চায়, ঝিমলি ফিরে আসুক। বংশী মারা গেছে বলেই সে চাইতে পারছে—কিন্তু সেটাও ত স্বাভাবিক। সেটাই ত স্বাভাবিক।

পিসিমা চুপ করে থাকেন! যেন তিনিও, ঝিমলির সঙ্গে একটা আন্দাজে পৌঁছতে চাইছেন! কিন্তু পিসিমা কীভাবে ঝিমলি আর মুক্তি বোসের ভিতরের ব্যাপারটা আন্দাজ করবেন। তা হলে ত তাঁকে ঝিমলি আর বংশীর ভিতরের ব্যাপারটাও আন্দাজ করতে হয়। সেটা কী করে বুঝবেন পিসিমা, কেন ঝিমলি স্বামী ছেলে সব ছেড়ে বংশীর সঙ্গে বেরিয়ে যায়। কিন্তু সেটা জেনেই ত পিসিমা বললেন ঐ বিপদের কথা, বংশীর মৃত্যুর ইঙ্গিত।

নাকি, পিসিমাও ঘটনাটাকে সেই বাইরে থেকেই এক রকম করে বুঝে নিয়েছেন যে ঝিমলি বেরিয়ে আসেনি, মুক্তি বোসই তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে. মারতে-মারতে বের করে এনে, রাস্তায় এনে মারতে-মারতে বের করে দিয়েছে। পাড়ার সবাই সেটা দেখেছে! সবাই এটা বলেছে। রিক্সা নিয়ে ঝিমলি ত সেদিন এই বাড়িতেই এসে উঠেছিল। তারপর থেকে কোথায়-কোথায় ঘুরে বেড়ায় ঝিমলি। শিলিগুড়িতে ভাইদের কাছে। হলদিয়ায় বোধহয় চাকরিও করে।—পিসিমা যেভাবে ঝিমলির জীবনটাকে জেনে নিতে পারেন সেখানে বংশী বলে কেউ না থাকলেও চলে। থাকলেও, মাত্র ঐ 'বিপদের' ইঙ্গিত পর্যন্ত—তার বেশি নয়। সেইজন্যেই কি পিসিমার পক্ষে বোঝা সহজ হবে—ঝিমলি-মুক্তি বোসের ব্যাপার। এর মধ্যে ত আর বেশি কিছু বোঝার নেই—যে তাড়িয়ে দিয়েছিল, সেই আবার ডাকছে।

ঘটনা যদি তাই হত, তা হলে ত ঝিমলি হয় অপমান মেনে নিয়ে মুক্তি বোসের কাছে ফিরে যেত অথবা এখনও আত্মসম্মান বজায় রেখে বলত, যাব না।

আজ, দশ বছরের ব্যবধানে, নিজের কাছে ঝিমলিকে স্বীকার করতেই হয়, ঘটনাটা ত যা ঘটেছে তা নয়। অনেক, অনেক দিন ধরে ঝিমলি আর মুক্তি বোসের মধ্যে নীরব প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল—সামাজিকভাবে কে নিজেকে আক্রান্ত প্রমাণ করতে পারে। মুক্তি বোস অনেকখানি পেরেওছিল। ঘরের বৌ আর একজনকে ভালবাসবে এটা নিশ্চয়ই সমাজ অনুমোদন করবে না। কিন্তু এখন মনে করা মুশকিল, কারা জানত, কারা জানত না। ধৈর্যের সেই প্রতিযোগিতায় মুক্তি বোস ত হেরে গেল। বৌকে মেরে বাড়ি থেকে বের করে দিল। কিন্তু আজ ঝিমলির নিজের কাছেও স্বীকার না করে উপায় নেই যে সেদিনের সেই ঘটনা ঘটাবার জন্যে তার আগে কতদিন ধরে সে চেষ্টা করে এসেছে। সমস্তটাই তার, ঝিমলির হিশেব মত হয়েছে। সমস্তটাই। মুক্তি বোস তার কাছে হেরে গেল। কিন্তু সেদিন একটাই ভুল করেছিল ঝিমলি, বাড়ি থেকে যখন তাকে বের করে দিল, তখন ছুটে গিয়ে কৌশিককে নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারত। ঐ প্রচণ্ড রাগের মধ্যে মুক্তি বোসের মাথায় বাধা দেয়ার বুদ্ধি আসত না। সে-সময়ও সে পেত না।

দশ বছর পরে, আজ যখন মুক্তি বোস তার সেই সেদিনের হারের সূত্র ধরেই আবারও ঝিমলির কাছে হার মানতে এসেছে, তখন ঝিমলিও তার সেদিনের কৌশলের অসম্পূর্ণতাটুকু শুধরাতে চায়। সেদিন যদি কৌশিককে নিয়ে সে বেরিয়ে আসতে পারত, তা হলে, আজ আর এই পরিস্থিতির সম্মুখীন তাকে হতে হত না। হত না? তা হলেও ত মুক্তি বোস আজ এসে বলতে পারত, ছেলেকে নিয়ে তুমি ফিরে এসো। মুক্তি বোস ত আর মামলায় হেরে ঝিমলির কাছে আসে নি। বংশী মারা গেছে বলে এসেছে। যদি ঝিমলিকে মুক্তি বোসের কাছে ফিরতে হয়, তা হলে ত আর মামলায় জিতে তার সেই সেদিনের মারের প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে বলে ফিরবে না। বংশী মারা গেছে বলে ফিরবে। যদি ঝিমলিকে কৌশিকের কাছে ফিরতে হয়, তা হলেও কি সে সেই কারণেই ফিরবে?—এ-কথার জবাব ঝিমলি নিজেই পায় না। এখনো পায় না।

কিন্তু কাল সন্ধ্যা থেকে আজ সন্ধ্যার মধ্যে ঝিমলির পরবর্তী জীবন নিয়ে যে বিকল্প তৈরি হয়ে উঠল, তার চাইতে গ্রহণযোগ্য আর কী হতে পারে? মুক্তি বোস কাল বলেছে—ঝিমলি জবাব দেয় নি। আজ কৌশিকের কথারও জবাব দেয় নি। কাল দুপুরে সবাই মিলে ঐ বাড়িতে যাওয়া হবে, সেই ঝিমলি-মুক্তি বোস-কৌশিকের বাড়িতে। একবার যাওয়ার পর সবটাই ত ঝিমলির ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে। লক্ষ্মী যে রকম করছে, সে তাকে জোর করে রেখে আসতে পারে। পিসিমা থেকে যেতে বলতে পারেন। ঝিমলি থেকে গেলেই থেকে যাওয়া হবে।

কৌশিক আজ বলেছে কাল তাদের বাড়ি যেতে, বাবা মনে করিয়ে দেয়ার পর। বলেছে, হয়ত মনে ছিল, লজ্জায় বলে উঠতে পারে নি। কাল যদি শেষ পর্যন্ত বলে বসে, তুমি আজ যেও না, তা হলে কী করবে ঝিমলি। ঝিমলি যেন দেখতেও পায়, কথাটা কীভাবে বলবে কৌশিক। ও যে-রকম বলে, নিচু স্বরে, চোখ তুলে, চোখে চোখ রেখে কিন্তু লজ্জায় একটু সরিয়ে, একটু হেসে, গালে একটু টোল ফেলে।

হেসে ফেলে ঝিমলি। এত মেয়েদের মত সুন্দর হল কী করে কৌশিক। কৌশিকের কথা শুনে মনে হয় না ওর কোন কিছুতে মন আছে। কিন্তু ওকে ত এই বয়সে হস্টেলে থাকতে হয়।

এ বাড়িতে কেমন ঠিক হয়ে গেল, ঝিমলি 'তার' দুই ছেলেকে নিয়ে, কৌশিক আর বিপুলকে নিয়ে কলকাতায় একটা বাড়িতে থাকবে।

এই মুহূর্তে এর চাইতে লোভনীয় আর কী হতে পারে ঝিমলির কাছে। এখন, এই মুহূর্তে ঝিমলি বিপুল আর কৌশিক ছাড়া আর কাউকে ত তার সবচেয়ে নিজের ভাবতে পারে না। একটা ছেলেকে সে জন্ম দিয়েছে—তিন-তিনবার গর্ভধারণ করে জন্ম দিয়েছে। আর একটি ছেলেকে সে ছেলে করে নিয়েছে। মুক্তি বোসকে বললেই রাজি হয়ে যাবে—কলকাতায় বাড়ি করতে।

ধারাবাহিক

অসুন্দর

সুধাংশু ঘোষ

অতটুকু মেয়ে এমন একটা কথা বলবে ভাবা যায় না। শরীরমনে জোর ঝাঁকানি লাগল অমিয়জীবনের। আর পাঁচটা মানুষের কানে কথাটা হয়ত তেমন ঘা মারবে না। তারা তলিয়ে দেখবে না কথাটা, কারণ তাদের তলিয়ে দেখবার মন তৈরি হয় নি। তাদের নেহাতই আটপৌরে লাগবে কথাটা, যেন এ-ধরনের কথা সবাই কখনো না কখনো বলে থাকে। যাকে গালভরা ভাষায় বলে গভীর তাৎপর্য, সে-জিনিস ওইটুকু মেয়ের কথায় তারা খুঁজে পাবে না, খুঁজবেই না। কেবল মেয়েটা কান্না মেশানো গলায় কথাগুলো বলছে বলে, তার নরম গাল বেয়ে নোনতা জলের দুটো ছড় নামছে বলে, খানিক চমক লাগবে।

আর পাঁচজনের মতন নন তো অমিয়জীবন। তিনি একটা প্রচণ্ড নাড়া খেলেন। সামনে আরো ঝুঁকে এলেন মেয়েটির দিকে। চশমার পুরু কাচের মধ্যে দিয়ে দেখলেন, মেয়েটির ঠোঁট তখনো কাঁপছে, তার চোখ জলে ডুবুডুবু। কয়েক বছর আগে এক শ্রাবণে শহর থেকে প্রচুর দূরে গিয়ে বন্যায় প্রায়-ডুবন্ত ধানখেত দেখেছিলেন। মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, এত কাল পরে সেই ধানখেতের দুটো চিলতে ভেসে গেল সামনে দিয়ে।

পাড়ায় ঢোকার মুখে দোকানটা। চায়ের দোকান, তবে নোনতা আর মিষ্টি খাবারও পাওয়া যায়। ভেতর দিকের টানা বারান্দায় কাঠের পার্টিশন-করা চারটে খুপরি। তার প্রথমটায় মেয়েটিকে নিয়ে বসেছেন অমিয়জীবন, মুখোমুখি। তাঁকে চা দিয়ে গেছে, মেয়েটিকে সন্দেশ। এখান থেকে অমিয়জীবনের বাড়ি হেঁটে যেতে পাঁচ মিনিট, মেয়েটির বাড়িও প্রায় ততটাই দূর। এই মোড় থেকে দুটো আলাদা রাস্তা গিয়েছে অমিয়জীবন এবং মেয়েটির বাড়ির দিকে। এই অব্দি একসঙ্গে হেঁটে এসেও মেয়েটির চোখ কেন জলে ভাসছে, কেন উথলে-ওঠা কান্না চাপতে হচ্ছে মাঝেমাঝে, অমিয়জীবন বুঝতে পারেন নি। ওকে এই মোড়ে ছেড়ে না দিয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

'বাড়ি যাবার আগে তুমি একবার আমাদের বাড়িতে চল দশ মিনিটের জন্য। এমন সব সুন্দর জিনিস দেখবার পর তোমার কেন থেকে থেকে কান্না আসছে আষাঢ়ের বৃষ্টির মতন, আমি জানতে চাই।'

মেয়েটি জোর মাথা দুলিয়ে জানিয়েছিল, অমিয়জীবনের বাড়ি তখন আর যাবে না, নিজেদের বাড়ি চলে যাবে।

ওর সঙ্গে ওদের বাড়ি যেতে পারতেন অমিয়জীবন কিছুক্ষণের জন্য। ওর বাবার সঙ্গে তো অমিয়জীবনের ভালোই আলাপ-সালাপ রয়েছে। ও তো নিখিলেশ সান্যালের ছোট মেয়ে। নিখিলেশ তাঁদের নাগরিক কল্যাণ সমিতির অন্যতম সহসভাপতি। কিন্তু তখন আর ওদের বাড়ি যেতে মন সায় দেয় নি।

সামনেই পাড়ায় ঢোকবার মুখে এই দোকানটা। জানাশোনা। দোকানের সবাই চেনে অমিয়জীবনকে, ভক্তিটক্তি করে। মেয়েটিকে প্রায় জোর করে দোকানে ঢুকিয়েছেন, বসেছেন এই

খুপরিটায়। দোকানের লোকরা সম্ভবত ওকে অমিয়জীবনেরই মেয়ে ভাবছে। তাঁর যে একটিই মেয়ে, আর তারও যে বিয়ে হয়ে গেছে সাড়ে চার বছর আগে, দোকানের ওরা এত খবর রাখে না।

চা-সন্দেশ দিয়ে গেছে পঁচিশ-তিরিশ মিনিট আগে। মেয়েটি সন্দেশ ছোঁয় নি। অমিয়জীবন চায়ে দুবার ঠোঁট ছুঁইয়েছিলেন। মেয়েটির আশ্চর্য কয়েকটি কথা শোনার পর আর চায়ের কাপে হাত দেন নি। পাতলা সর পড়েছে চায়ের ওপর।

বেলা বাড়ছে। দোকানের দেয়ালঘড়িতে দেখলেন দশটা। নিজের হাতের ঘড়িতে তিন-চার মিনিট কম। সকাল আটটার অল্প আগে গিয়েছিলেন প্রবাসজীবনের বাড়ি, কাছেই, হেঁটেই গিয়েছিলেন। প্রবাসজীবন ছিলেন তাঁর বড় ভাই, দেড় বছর হল মারা গেছেন। বেশ কিছু পুরনো মূর্তি, ছবি, পুঁথি, পট সংগ্রহ করেছিলেন প্রবাসজীবন। সেই সব সুন্দর জিনিসের একটা প্রদর্শনী চলবে আজ থেকে দশ দিন প্রবাসজীবনের নিচের বড় ঘরে। আজ সকাল আটটায় ছিল সেই প্রদর্শনীর উদ্বোধন। অনুষ্ঠান অবশ্য ঠিক আটটায় শুরু হয় নি, একটু দেরি হয়েছিল।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অমিয়জীবনকে তো যেতেই হবে, কিন্তু ওখানে নিখিলেশ সান্যালের ছোট মেয়েটি যাবে, ওই সব পুরনো জিনিসের প্রতি তার আকর্ষণ থাকবে—এতটা আশা করা যায় না। ওকে ওখানে দেখে অমিয়জীবনের আশ্চর্যই লেগেছিল। ওইটুকু তো মেয়ে। বছর পনের বয়েস হবে বোধ হয়। সামনের বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। আজ মার শাড়ি পরে তরুণী সাজতে চেয়েছে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর দর্শকরা প্রবাসজীবনের সংগ্রহ দেখছিলেন। তাঁরা প্রায় সবাই বয়স্ক বিশিষ্ট ব্যক্তি, আমন্ত্রিত। তাঁদের মধ্যে ওই মেয়েটিকে দেখতে পান অমিয়জীবন। মেয়েটি একটি পটের সামনে দাঁড়িয়েছিল। শক্ত কাপড়ে নানা রঙে আঁকা নাচের ভঙ্গিমায় এক অপরূপা দেবদাসী। সব জায়গায় রঙ সমান উজ্জ্বল নয়। সুদীর্ঘ সময়ের নখের আঁচড় পড়েছে এখানে-ওখানে। চারপাশে ফুল-লতাপাতা, পশ্চাদভূমিতে প্রাচীন মন্দিরের আভাস। পটটি ঘরের দেয়ালে ঝোলানো।

চেনা বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলার পর বাড়ি ফেরার জন্য তৈরি হচ্ছেন, তখনো অমিয়জীবন দেখতে পান, মেয়েটি সেই পটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মুখ তুলে। ভাবলেন, একদিকেই তো যাবেন, ওকে সঙ্গে নিয়ে ফিরলে হয়।

মেয়েটির পাশে গিয়ে বললেন, 'তুমি একা এসেছো ?'

দারুণ চমকে উঠে মেয়েটি তাঁর দিকে মুখ ফেরাল। মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ। তখনই অমিয়জীবন প্রথম ওর চোখের ছলছল, ঠোঁটের কাঁপা দেখতে পান।

তাঁর সঙ্গে প্রদর্শনীর ঘর থেকে বাইরে এল মেয়েটি। রাস্তায় হাঁটছিল চুপচাপ। এত সব সুন্দর পুরনো জিনিস দেখার পর কেন তার দুঃখ হচ্ছে—পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে বারবার জেরা করেও এই প্রশ্নের জবাব পান নি অমিয়জীবন। তারপর এই চায়ের দোকানের খুপরিতে বসে কান্না-মেশানো গলায় কয়েকটি মাত্র খুব সরল কথা বলে অমিয়জীবনের শরীরমনে প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিল মেয়েটি। তাঁর অনেক ভাবনায় গড়ে তোলা সুন্দরের ইমারতটা আচমকা দুলে উঠল।

নিজের জীবনে খুব বেশি কিছু করেন নি অমিয়জীবন। অসচ্ছল ঠিক ছিলেন না কখনো, তবে বাইরের চোখে যাকে প্রাচুর্য বলে তার মুখ তিনি দেখেন নি। প্রাচুর্যের পেছনে হন্যে হয়ে ছোটার মেজাজ তাঁর ছিল না কোনো দিন। তিনি শুধু একটাই জিনিস চেয়েছেন। বাঁচতে চেয়েছেন নিজের ইচ্ছে, নিজের রুচি মতন। যা কিছু তাঁর অসুন্দর মনে হয়েছে, সারা জীবন তা এড়িয়ে চলেছেন সযত্নে। অনেক দিনের ভাবনায় সুন্দরের একটি ইমারত গড়ে তুলেছেন। সেই ইমারত বাইরের চোখে দেখা যায় না। তার অস্তিত্ব কেবল তাঁর মনের ভেতরে। গান, নাচ, চিত্রকলা, সাহিত্যে সুন্দরের ইমারতটি, সুন্দরের শরীরটি কেমন, দিনের

পর দিনের একাগ্র ভাবনায় তা তিনি আরো আরো স্পষ্ট করে দেখতে চেয়েছেন। বোধের দীপ্তির অথবা আবেগের তীব্রতার কোন্ চূড়োয় উঠে সুন্দরের শরীর শিল্পীর ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় পুরোপুরি মূর্তি পায় অথবা বিমূর্ত হয়ে আসে—এসব নিয়ে তিনি মাতৃভাষায় এবং ইংরেজিতে দুখানা ভারী কেতাব লিখেছেন। এখন আবার একখানা বই লিখছেন তিনি একই বিষয়ে। কারণ এখন তাঁর মনে হচ্ছে, বাংলা গদ্যের সাহায্যেই সুন্দরের শরীরটি আরো অনেক সহজ সরল করে দেখানো যায়।

এই সব নিয়েই আছেন। ছেলেমেয়ে দুটির কেউ কাছে থাকে না বলে তাঁর দুঃখ নেই। ছেলে বড়, মেয়ে ছোট। ছেলে বাপের মতন হয় নি। ভালোভাবে ইঞ্জিনীয়ারিং পাস করে খুব বড় চাকরি পেয়েছে। এই শহরে থাকে না। মেয়েও শ্বশুরবাড়ি। নিজেদের বাড়িতে কেবল তিনি এবং তাঁর স্ত্রী। তাঁর স্ত্রীর হয়ত ফাঁকা লাগে ঘরদুয়োর। অমিয়জীবন নিঃসঙ্গতায় ভোগেন না। তিনি একান্তে নিজের মনের কোটরে সুন্দরের শরীর গড়েন।

আজ চায়ের দোকানে বসে বছর পনের বয়েসের মেয়েটির কান্নার তাপে গলানো কথাগুলো শুনে অমিয়জীবন বুঝতে পারলেন, তাঁর দিনরাতের ভাবনায় তৈরি করা সুন্দরের শরীর মারাত্মকভাবে দুলে উঠল, নাড়া খেল ইমারতের ভিত। মনে হল, তিনি কেন অমন সরল করে বলতে পারেন না, অমন দৃষ্টান্ত দিতে পারেন না? তখনই অবশ্য আরো মনে হল, আজ প্রবাসজীবনের সংগ্রহ দেখে যাঁরা খুশি হচ্ছিলেন তাঁদের খুশিতে উজ্জ্বল মুখ সুন্দর। সেই সুন্দর বাইরের চোখেই দেখা যায়। আর দুঃখের আঁচে গলে-যাওয়া ওই মেয়েটির প্রসাধন-ধুয়ে-যাওয়া মুখ কি সুন্দর নয়? নিশ্চয়ই সুন্দর, তবে সেই সুন্দর অত সহজে বাইরের চোখে ধরা পড়ে না।

দু বছর হল অধ্যাপনা থেকে অবসর নিয়েছেন অমিয়জীবন সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপক হিসেবে তেমন প্রিয় ছিলেন না ছাত্রছাত্রীদের। শ্রদ্ধাভক্তি হয়ত পেয়েছেন, জনপ্রিয়তা পান নি। তার প্রধান কারণ পরীক্ষা পাসের মন্ত্র শেখাতে তিনি পারেন নি, চানওনি কখনো। ছেলেমেয়েদের যেসব কথা তিনি বেশি বলতেন তা নাকি পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর লিখতে তেমন কাজে লাগে না।

যেমন, একটি কবিতা পড়াতে গিয়ে হয়ত বলতেন, এই কবিতার প্রত্যেকটি শব্দ, প্রত্যেকটি স্তবকের মানে নিংড়ে বের করতে চাইলে এর যা কিছু সুন্দর সব নষ্ট হয়ে যাবে। মরে যাবে কবিতাটি। ব্যাপারটা হবে লাশকাটা ঘরে শবব্যবচ্ছেদ। তার বদলে প্রথমে কবিতাটি একবার পড়ার পর কবি সম্পর্কে, কবিতাটি সম্পর্কে কিছু কথা বলা যায় এবং তারপর ক্লাসের ঘণ্টা বাজার আগে পর্যন্ত যতটুকু সময় তার মধ্যে যতবার সম্ভব ও অধ্যাপকের পক্ষে যতটা সুন্দর করে সম্ভব কবিতাটি পড়া যায়। এর বেশি নয়। এর বেশি কিছু করলে কবির অপমান, কবিতাটিরও অপমান। প্রত্যেকটি শব্দ ও পঙক্তির তাৎপর্য নিংড়ে বের করার উল্লাসে অধ্যাপক কথার ফুলকি ছড়াতে থাকলে ছেলেমেয়েদেরও অপমান করা হয়, অন্যের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় তাদের একান্ত ভাবনা-অনুভবের ওপর

যেমন আরো বলতেন, সব শিল্পের মতন কবিতারও বাসনা সুন্দরের শরীর গড়ে তোলা। এই গড়ে তোলার প্রকরণ অবশ্যই প্রচ্ছন্ন থাকা দরকার। যা শুধু চোখকে মনকে তৃপ্ত করে, সাহিত্যে তা-ই সুন্দর নয়। সুন্দরের আদল বানাতে আরো কিছু চাই। সেই আরো কিছুর স্বাদ নিতে না পারলে সাহিত্যপাঠ বাতুলতা।

প্রাত্যহিক জীবনে অবশ্য প্রচুর অসুন্দর অমিয়জীবনকে কাঁটা বেঁধায়। যতই এড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করুন, কাঁটালতা জড়িয়ে যায় পায়ে। খোঁচা দেয়, রক্ত চুঁইয়ে পড়ে। যেখানে তাঁর ছোট একতলা বাড়ি সেই পাড়া নতুন। রাস্তার দুপাশের জমি ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের কাছ থেকে নিলামে কিনে নিয়েছিল বিত্তবানরা। মজা হল, সেই বিত্তবানদের দুচারজন ছাড়া আর সবাই অবাঙালি। তারা সব সাততলা-আটতলা বাড়ি করেছে। নিচের তলা ছাড়া প্রত্যেক বাড়ির অন্য সব তলায় সামনের দিকে লম্বা টানা বারান্দা। প্রতিদিন নির্দিষ্ট লোক দিয়ে কাচিয়ে অজস্র কাপড় প্রত্যেকটি বারান্দায় মেলে দেওয়া হয়। তার মধ্যে অন্তর্বাস থেকে বিছানার চাদর পর্যন্ত থাকে। মেলে দেওয়া সার সার নানা আকারের কাপড় বারান্দাগুলো পুরো ঢেকে রাখে। তাকালে মনে হয়, সাততলা-আটতলা বাড়িগুলো সব ধোপাখানা। অমিয়জীবন মনে মনে বলেন, অসুন্দর।

ওই সব বাড়ির অরণ্যে তাঁর নিজের বাড়িটাকে ছোট্ট একটা ফুলের চারার মতন লাগে। বাড়ি দোতলা-তিনতলা করবার তাগিদ তাঁর নেই, সামর্থ্যও নেই। ছেলে করতে চাইলে করবে।

সাততলা-আটতলা বাড়ির মালিকরা সারাদিন কালোটাকা কামায়, আর মাঝেমাঝেই চারদিকে চারটে অ্যামপ্লিফায়ার লাগিয়ে অশ্রাব্য গলায় নাম গান করে। কার অনুমতি নিয়ে ঈশ্বর জানেন, সারারাত ধরে পাড়া ফাটিয়ে চেল্লায়—'ও রাধে! ও রাধে!'

ঘুমহীন এপাশ-ওপাশ করতে করতে অমিয়জীবনের এমনকি শ্রীরাধাকেও অসুন্দর মনে হয়।

ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে চলে যাবার পর ওই সব বাড়ির তরুণরাই এখন ঘি-মাখন খাওয়া ভ্যাদভেদে সাহেব। ওই সব বাড়ির তরুণীরা কখনো সামনের রাস্তায় পা ছোঁয়ায় না। গাড়ি ঢুকে যায় বাড়ির হাতার ভেতরে। সেখানে দরজা থেকে একপা বাড়িয়ে গাড়িতে উঠতে তাদের কাঁধের আঁচল খসে পড়ে তিনবার। বস্তি ভেঙে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট এলাকাটার উন্নতি করেছিল। কালো আসফলটের নতুন রাস্তাটা প্রথম দিকে বিশেষত এক পশলা বৃষ্টির পর ঝকঝক করত। দুপাশে সাততলা-আটতলা বাড়িগুলো ওঠার পর সেই সব বাড়ির বাসিন্দাদের জন্য অন্তত দু'ডজন পশ্চিমা দুধেল গাই এল। এখন পুরো রাস্তা এবং দুধারের ফুটপাথ তাদের খাবার জায়গা এবং শৌচাগার। বেআইনি ব্যাপার বলে মাঝেমাঝে পুলিস দুপাঁচটা গাই তাড়িয়ে নিয়ে যায় থানায়। খানিক পরেই গয়লারা গাইপ্রতি কিছু নজরানা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে সেগুলোকে। সাততলা-আটতলা বাড়ির মহিলারা—যাদের গায়ে টোকা লাগলে মাখন ছিটকে যায়—সারা দিনে একটি মাত্র কাজ করে পরিবারের জন্য। ফুটপাথে নেমে এসে সামনে দাঁড়িয়ে থেকে রুপোলি পাত্রে দুধ দুইয়ে নেয়। ওই গয়লাদের দুধ অন্য কেউ পায় না। অমিয়জীবন একবার চেয়েছিলেন, পান নি। উঁচু বাড়িগুলোর বাসিন্দারা গয়লাদের দাদন দিয়ে ওইসব দুধেল গাই এই শহরে আনিয়েছে কেবল তাদের দুধ যোগান দেবার জন্য। চমৎকার রাস্তাটার এখন প্রায় খাটালের চেহারা।

বাড়ি থেকে বেরোতে, বাড়ি ফিরে আসতে অমিয়জীবন রাস্তা-ফুটপাথের নোংরা এড়িয়ে পা ফেলেন, আর মনে মনে শুধু বলেন, অসুন্দর!

আজ চায়ের দোকানে মুখোমুখি বসে অতটুকু মেয়েটা কান্না মেশানো গলায় কয়েকটা কথা বলে যেমন তাঁর ভেতরমহলের সুন্দরের ইমারতে চিড় ধরিয়ে দিল, কয়েক বছর আগে তেমনই অন্য একজনের কিছু কথা তাঁকে জোর ঝাঁকানি দিয়েছিল।

বস্তি ভেঙে দিয়ে এলাকার উন্নতি করা হয়েছে ঠিকই, তবে নতুন রাস্তার দুপাশের নতুন বাড়িগুলোর পেছনে জীর্ণ ইটের নোনাধরা বাড়িগুলো আড়ালে পড়লেও রয়েই গেছে। সেইরকম একটা বাড়ির একটা ছেলে একবার এইরকম নাড়া দিয়েছিল অমিয়জীবনকে। ছেলেটার নাম কৌশিক। পড়ত তাঁর মেয়ের সঙ্গে। ছাত্র ভালো ছিল, তবে গ্রাজুয়েট হওয়ার আগেই কি এক চরমপন্থী রাজনীতিতে জড়িয়ে গিয়ে উধাও হয়ে যায়। ধরা পড়ে, জেল খাটে, ছাড়া পেয়ে পাড়ায় ফিরে আসে। এখন কী করে অমিয়জীবন জানেন না। একদিন বলেছিল, বেকারভাতা পাচ্ছে। নাগরিক কল্যাণ সমিতির সভায় আসে মাঝেমাঝে, তবে সমিতির কাজটাজ যে সে দামী মনে করে না তা বলতে ছাড়ে না। অমিয়জীবন বেশ পছন্দ করতেন কৌশিককে। তাঁদের বাড়িতে আসত মাঝেমাঝে।

কয়েক বছর আগে—তখন জেল থেকে ছাড়া পেয়ে পাড়ায় ফিরেছে কৌশিক—একদিন নাগরিক সমিতির এক ঘরোয়া সভার পর ওর সঙ্গে হেঁটে আসতে আসতে অমিয়জীবন বলেছিলেন, 'তোমার বাড়ির লোকরা আর্থিক ব্যাপারে এখনো তো তোমার ওপর নির্ভর করেন না। তুমি নিজেকে একটু গুছিয়ে আনতে পার না? মনে হয় তুমি স্নানটাও কর না নিয়মিত। পায়ে পুরু ময়লা, প্রায় জট পাকিয়ে গেছে চুলে। আমি তো তোমাকে

আগেও দেখেছি। আজকাল তুমি কেমন খ্যাপার মতন ঘুরে বেড়াও। আমার বড় অসুন্দর লাগে! দ্যাখ না দুধেল গাই আমদানি করে নতুন রাস্তাটা কেমন নোংরা করে ফেলেছে। সারা রাত ধরে অ্যামপ্লিফায়ারে রাধে-রাধে বলে চিল্লিয়ে পাড়া ফাটায়। এসবই বড় অসুন্দর!'

কৌশিক আচমকা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ঢাকা মুখ তুলে বলেছিল, 'মেসোমশাই, রাগ করবেন না, একটা কথা বলি। সবার দেখার চোখ একরকম না। আপনি এই সব অসুন্দর দেখে দুঃখ পান। আমার চোখে পড়ে অন্যরকম নোংরা। এই পাড়া থেকেই দৃষ্টান্ত দিই। যেমন ধরুন আপনার সামনের আটতলা বাড়ির একটা ছেলে, সরোজ পোদ্দার, আমার থেকে বছর তিনের ছোট হবে, কলেজের চৌকাঠ মাড়ায় নি, দমাদ্দম ইংরেজি বলে, প্রায় রোজ পার্ক স্ট্রিটের হোটেলে শুধু বকশিশ দেয় একটা করে একশো টাকার নোট। আর এই এলাকারই কত লোক ব্লাড ব্যাঙ্কে লম্বা কিউ দিয়ে রক্ত বেচতে যায় আপনি জানেন না। আপনার বাড়িতে যে বুড়ি বাসন মাজে ঘর মোছে তার স্বামী প্রসন্নকে আপনি চেনেন। আমি বালক বয়েস থেকে দেখে আসছি প্রসন্ন ফুটপাথে বসে গুড় বিক্রি করে। গুড়ের হাঁড়ি নিয়ে ফুটপাথে বসে থাকে, দোকান নেই, হাঁটুর ওপরে কাপড়, গায়ে ময়লা জামা, শীতকালে ছেঁড়া কম্বল জড়ানো। দেশ স্বাধীন হয়েছে ক'বছর? প্রসন্নর কোনো বদল নেই। মেসোমশাই, এমন দৃষ্টান্ত অজস্র দিতে পারি। চারদিকে এত ধুলোময়লা দেখতে পাই, আমার নিজের পায়ের ময়লা চোখে পড়ে না।'

প্রায় একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ। শুনতে শুনতে অমিয়জীবন বেশ নাড়া খেয়েছিলেন। নাড়া খাওয়ার আসল কারণ, তিনি বুঝেছিলেন—কৌশিক যে-অসুন্দরের কথা বলল তা নিয়ে তাঁর বইতে অন্তত একটি নতুন পরিচ্ছেদ সংযোজনেরও যোগ্যতা বা অধিকার তাঁর নেই। তাঁর চোখ ও মন ওইভাবে দেখতে শেখেনি।

আজ চায়ের দোকানে বসে ওইটুকু মেয়ের দুটো কথা শুনে মনে হল, তিনি তো ঠিক ওর মতন করে দেখতে চান, ওর মতন অমোঘ দৃষ্টান্ত দিতে চান। অথচ পারেন না। কেন পারেন না

নিখিলেশ সান্যালের ছোট মেয়ের মুখের রঙ কমলালেবুর কোয়ার মতন। এমন রঙ চট করে দেখা যায় না। অনেকক্ষণ ধরে কমলালেবুর কোয়ার রঙের গাল থেকে আঙুল দিয়ে চোখের জল মোছার পর মেয়েটি একটু সহজ হয়ে এল। উথলে-ওঠা কান্না আর চাপা দিতে হচ্ছিল না। আঙুল দিয়ে গাল না ঘষে রুমাল দিয়ে সারা মুখ মুছে নিল আলতো করে। অমিয়জীবন বুঝলেন, নিজের বিষয়ে হুঁশ ফিরে আসছে মেয়েটির। তখন দুজনের মধ্যে এবংবিধ সংলাপ হল

'আমি মেনে নিলাম, এই বয়েসেই পুরনো মূর্তি, পুঁথি, পাণ্ডুলিপি, পট, ছবি—এসব দেখতে তোমার ভালো লাগে। তাই উদ্বোধনের সকালেই তুমি প্রদর্শনীতে গিয়েছিলে। কিন্তু যা ভালো লাগে তা দেখে কান্না কেন? যতক্ষণ না সন্দেশ দুটো খাবে, যতক্ষণ না আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে, তোমাকে এখানে আটকে রাখব।'

এই প্রথম কথা বলার প্রাক-মুহূর্তে মেয়েটি কি ঈষৎ ম্লান হাসল?

'জ্যাঠামশাই, আমার শুধু কান্না আসছিল না, গা শিরশির করছিল, কেমন ভয়ভয় লাগছিল। ওখানে গোলাপি দেয়ালে একটা পট ঝোলানো আছে, নাচের ভঙ্গিতে প্রতিমার মতন একটি মেয়ে। তার চোখ দুটি বিশাল। একটি চোখে শাদাটে রঙের মধ্যে নীলচে কালো তারা। অন্য চোখ পোকায় খেয়ে নিয়েছে। দেয়ালের গোলাপি রঙ ফুটে বেরিয়েছে সেখান দিয়ে। অমন সুন্দর মুখের ওই ভীষণ খুঁত, আমার খুব কষ্ট হল প্রথমে। কান্না পেল। তারপর মনে হল, কেবল কুৎসিত না, ভয়ঙ্করও। আমার গা শিরশিরিয়ে উঠল।'

অমিয়জীবন ভাবলেন, তাঁর নতুন বইয়ের কোনো কোনো অনুচ্ছেদ নতুন করে লিখতে হবে।

মাটির সুরের খোঁজে : তিলুড়ি

রণজিৎ সিংহ

স্কেচ খালেদ চৌধুরী

তিলুড়ির নামে প্রথমেই মনে পড়ে গোষ্ঠ বাউরির কথা। বাঁ হাতে কান চেপে ডান হাত শূন্যে মেলে ধরে বুক চিতিয়ে গোষ্ঠ গান গাইছে তাকে আধখানা বৃত্তে ঘিরে বাজনদার আর অন্যান্য গাইয়ে বসে গিয়েছে। গানের ফাঁকে ফাঁকে গোষ্ঠ বাজনার বোল বলছে থেইয়া কেটা থেইয়া কেটা থেইয়া কেটা, ইঃ ধা ধা গিনা, গির ধা ধি ধা গিনা, গির ধা ধিঃ তুমুল শব্দে বেজে উঠছে ঢোল ধামসা টাসা আর কর্তাল। গোষ্ঠ বাজনার তালে তালে উল্লাস প্রকাশ করছে এঃ এঃ গান গাইছে আবার তালে তালে তার আঞ্চলিক ভাষায় তার বিশাল প্রাণের স্ফূর্তি আকাশে ছড়িয়ে দিচ্ছে লিলেক লিলেক লিলেক

মনে পড়ে মঙ্গল বাউরি, ভূতনাথ বাউরি, মধুসূদন বাউরি, হপন বাউরি আর অন্ধ গোকুল বাউরির কথা আর মনে পড়ে ফটিক বাউরির কথা ১৪ বছরের ছেলে ফটিক। কিন্তু কি তেজি আর সুরেলা গলা তার

ওরা সবাই লোকশিল্পী। কখনো গাইছে কখনো বাজাচ্ছে ওরা আমাদের শুনিয়েছিল বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার আঞ্চলিক সুরের গান, ঝুমুর ওদের গানেই আমরা পেলাম ওই অঞ্চলের ঝুমুরের আদি চেহারা। বলা যায়, ওই অঞ্চলের সকল সুরের আদিম ছাঁচটি যেন।

ওরা আমাদের ঘরের দোরগোড়ার মানুষ। কিন্তু ওদের মধ্যে পৌঁছতে বড় সময় লেগেছিল আমাদের।

বাস স্টপে নেমে বিশাল আকাশে ছাওয়া একটা গ্রামের মুখোমুখি দাঁড়ালাম। দূরে পাহাড়ের রেখা। রাস্তার বাঁদিকে একটা বড় পুকুর জল বেশি নেই, তবে কাঁকুরে মাটির কারণে কাদাও নেই। পরে ওই পুকুর ছাড়িয়ে একটু উঁচু বাঁধের চৌহদ্দিতে লুকনো আর একটা পুকুর আবিষ্কার করেছিলাম এবং তাতে ছিপ ফেলে মাছও ধরেছিলাম। বাস রাস্তার ওপারে গ্রামে ঢোকার রাস্তা। একটা পাঁচিলের পাশ দিয়ে হেঁটে গ্রামে ঢুকলাম।

তিলুড়ি গ্রামের রাস্তা আর ঘরবাড়ি দেখে মনে হল যেন সব কিছু পরিকল্পিত। রাস্তার ধারে কয়েকটা লাইটপোস্ট চোখে পড়ল। এক সময় কেরোসিনের বাতি রাখা হত খুঁটির ওপরকার খাঁচায়। এগোতে এগোতে একটা ছাত্রাবাস আর ইস্কুল দেখলাম

আমরা অবনী রায়ের সূত্রে তিলুড়ি গ্রামে গিয়েছিলাম। তাঁর মামার বাড়ির লোকজন আমাদের আপন করে নিয়েছিলেন। তাঁরা যে শুধু আমাদের থাকতে আর খেতে দিয়েছেন তাই নয়, ওই অঞ্চলের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকশিল্পীদের ডেকে এনেছেন অথবা সঙ্গে করে তাঁদের কাছে নিয়ে গিয়েছেন। তাঁদের আন্তরিক সাহায্য ছাড়া আমাদের পক্ষে লোকশিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হত না। তাই একবার নয়, ১৯৭৫ পর্যন্ত আমরা একাধিকবার সেখানে গিয়েছি। আমাদের যেতে হয়েছে লোকসংগীত সংগ্রহের জন্য আর কখনো বা সংগৃহীত গানের কিছু শব্দ বোঝা ও অন্যান্য খুঁটিনাটি তথ্য জানার জন্য।

আর তাই তিলুড়ি আমাদের বেশ ভালোভাবে দেখা হয়ে গিয়েছে। ১৯৭৫-এর অকটোবরে খালেদ চৌধুরী আর আমি মধুকুণ্ডা স্টেশনে নেমে হাঁটতে হাঁটতে তিলুড়ি গিয়েছিলাম গল্প করতে করতে ধীর পায়ে হেঁটেছিলাম আমরা। বাতাস ছিল না, আবহাওয়া তখনো ঠাণ্ডা হয়নি, কাঁধে টেপরেকর্ডার ও অন্যান্য জিনিসপত্রের বোঝা ছিল ফলে হাঁটাটা আরামদায়ক হয়নি। এক ঘণ্টা

পঞ্চাশ মিনিট হেঁটে আমরা যখন গ্রামে ঢুকছি তখন আশ্বিনের উজ্জ্বল আকাশে চাঁদ উঠেছে।

কিন্তু ওই হাঁটার কারণে সেবার আমরা সেখানকার প্রকৃতি ও মানুষকে আরো একটু ভালোভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। কাঁকুরে মাটি, অসমতল জমি, ছোটখাটো পাহাড় আর শালগাছ সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে অঞ্চলটি ছোটনাগপুর মালভূমির অংশবিশেষ। মাঝে মাঝে ওই অঞ্চলের বিশেষ রীতির খোড়ো চালের মাটির ঘর দেখতে পাচ্ছিলাম। এক সময় দেখলাম নিচু জমির জল ভেঙে দুতিনটি বাচ্চা রাস্তার দিকে আসছে। একজনের হাতে বাঁশের বোনা একদিকে সরু আর একদিকে ছড়ানো ফাঁদের কিছুটা গেলাস আকৃতির একটা জিনিস দেখলাম। প্রশ্ন করে জানা গেল ওটার নাম 'গুগি'। গুগি দিয়ে ওরা মাছ ধরে বেড়াচ্ছে। রাস্তার এক জায়গায় একটা সাঁকো দেখলাম। তার রেলিঙে কয়েকজন লোক বসে আছে। আমরা আমাদের মধ্যে কোনো সাট না করেই বেশ জোরে জোরে কথা বলতে লাগলাম। ভাব দেখালাম, আমরা স্থানীয় লোক। পরে শুনেছিলাম আমরা জোর বেঁচে গিয়েছি। ওখানে ছেনতাই হয়। হেঁটে আমরা নাকি বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিলাম।

তার আগে আমরা সকালে সন্ধ্যায় গ্রামে ঘুরেছি। গ্রামের পশ্চিমে ভালকা পাহাড়ের মাথায় উঠেছি। আর পাহাড়ের গায়ে দেবতার থান থেকে উৎসর্গ করা পোড়ামাটির হাতি আর ঘোড়া কুড়িয়ে এনেছি। রায়বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে দূরের বিহারীনাথ পাহাড়ের আড়াল থেকে সূর্য ওঠার দৃশ্য দেখেছি। রাত্রে বার্নপুরের কারখানার চিমনি থেকে আগুনের হলকা কিভাবে সে অংশের আকাশকে রাঙিয়ে দেয় সে দৃশ্য দেখেছি।

তিলুড়ি যাওয়ার আগে আমরা গোরাপাগলার গানের কথা খুব শুনেছিলাম। ১৯৭০-এর ২৪ জানুয়ারি আমরা রায়বাড়িতে বসে কিছু গান রেকর্ড করলাম। গায়ক ছিলেন পাগল যোগী, আনন্দ গোড়াই, কালিপদ নন্দী এবং লখিন্দর গোঁসাই। আনন্দ অন্ধ গায়ক আর লখিন্দরের বয়স মাত্র ১৪। তাঁরা গোরাপাগলা, নীলকণ্ঠ, দ্বিজরঙ্গ প্রমুখ রচয়িতার গান গেয়েছিলেন। সেসব গানের বিষয়বস্তু ঈশ্বর আকৃতি, গুরুভক্তি ও সাধন প্রক্রিয়া। বিষয়বস্তুর বিচারে গানগুলিকে লোকসংগীতের শ্রেণীতে ফেলা যায় না। আমরা বেশ হতাশ হয়ে গেলাম।

যে গোরাপাগলার গানের কথা এত শুনেছিলাম তাঁর একটা গান এখানে তুলছি। তার থেকে আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার হয়ে যাবে

(হরি) চাইলে চোখের কাছে মন
নিকটে আছে।
অপ্রাকৃত তনুটি তার কে গড়িল
মন কে গড়িল কোন ছাঁচে।
অঙ্গ নাই ত্রিভঙ্গ বাঁকা মদনমোহন
শ্রী নাই চূড়াটি বাঁধা রাধা নাম লিখন

তার কপাল নাই তার অলক তিলক
নেত্র নাই চাহনি ভেরেছে।
মুখকর নাই কিন্তু মুরলী বাজায়
কণ্ঠ নাই মোহন মালাটি দুলিছে হিয়ায়
কটিতে ধটি নাই নাম পীতবাস
চরণ নাই কেমন নাচে।
কর্ণ নাই সুবর্ণমূলে কুণ্ডল দুলিছে
নাক নাই তার নোলক কিবা ঝলক দিতেছে
গুরুপদ করি সম্পদ কয় গৌরাঙ্গ দাস
যদি বিশ্বাস করো প্রাণের মানুষ সহজে প্রকাশ
আমার অধরচান্দে যে ধরেছে
ও তার শ্রীনামে মন মজেছে॥

লখিন্দর গোঁসাই এ গান গেয়েছিল। লখিন্দরকে দেখে কেন জানি না কষ্ট লাগছিল। তার বাবা সঙ্গে ছিলেন। তিনি ছেলেকে বাউল বানাতে চান। তার চেহারায় তার ১৪ বছর বয়সের দুরন্তপনার কোনো চিহ্ন নেই। সে যেন অকালবৃদ্ধ। মাথায় ঝুঁটিবাঁধা লখিন্দর হাতে গাবগুবি নিয়ে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে বাউল গান গাইছিল। পূর্ণ দাসের কিছু বাজারচালু গান পূর্ণ দাসেরই ঢঙে সে গেয়েছিল।

গানগুলির বিষয়বস্তুতে যেমন লোকজীবনের কথা ছিল না, তাদের সুরেও ছিল না লোকসংগীতের স্বতঃস্ফূর্ততা ও সরলতা। সংস্কৃতিসচেতন কিছু সংখ্যক ভদ্রজন ওইসব গানের রসিক হতে পারেন কিন্তু আমাদের বড় কৃত্রিম আর একঘেয়ে লাগছিল। আমরা বেজারমুখে ওইসব গান রেকর্ড করে চললাম।

আমাদের চারপাশে বেশ কিছু লোকজন দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা যতটা না গান শুনছিলেন তার চেয়ে বেশি আমাদের কাজকর্ম লক্ষ করছিলেন। ভিড়ের মধ্যে গোষ্ঠও ছিল। খালেদ চৌধুরীর কি মনে হল, আমাকে নিচু গলায় বললেন, ওদের সঙ্গে একটু কথা বলো। দেখো তো ওদের গানটান কি আছে।

ওরা বাউরি। রায়বাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণায় একেবারে মুখোমুখি তাদের পাড়া। দূরত্ব মাপলে কুড়ি-পঁচিশ হাত হবে।

তাদের পাড়ায় গিয়ে কথা বলে জানতে পারলাম, তাদের গান থাকবে না কেন, আছে। কিন্তু সে গান তো বাবুরা শোনে না। তাদের গান আমাদের শোনার মতো নয়।

আমি বোঝাতে চেষ্টা করলাম, আমরা ওই গানই শুনতে চাই। বাবুদের গানের জন্যে আমরা গাঁয়ে আসিনি।

অনেক বলা-কওয়ার পর তাদের রাজি করানো গেল। কিন্তু তারা একটা আবদারও জানাল আমাদের কাছে। হাঁড়িয়া বানাবার জন্যে তাদের কিছু খরচা দিতে হবে। মদ না খেলে গান জমবে কেন! তাদের দাবি ছিল সাত টাকা।

কিন্তু তারা গাইবে কোথায়?

ঠিক হল, তারা রায়বাড়ির সামনের উঠোনে গাইবে।

একফাঁকে বাউরিপাড়ায় গিয়ে দেখলাম, প্রবল উৎসাহে নারীপুরুষ মিলেমিশে ভাতের মদ তৈরি করছে। যারা গাইবে বা বাজাবে তাদের জড়ো করা হচ্ছে। ঢোল ধামসা প্রভৃতি চামড়ার বাদ্যযন্ত্র বের করে সুর চড়ানো হচ্ছে।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর আমরা উঠোনে জড়ো হলাম। কয়েকটা বেঞ্চি আর চেয়ার পাতা হল। শিল্পীরা মাটিতে বসলেন। চারপাশে বাড়ির লোকজন জড়ো হলেন। বাচ্চারাও জুটে গেল।

গান শুরু হল। প্রথমে গোষ্ঠ গান ধরল। তার আঞ্চলিক উচ্চারণে গাইল আসর বন্দনার গান

বন্দিব গো গণপতি সিবেরই চরণ
তা পরে বন্দিব গো (ও ভাই) দশেরই চরণ
তা পরে বন্দিব গো প্রভু গো (ও ভাই) গেরামের
চরণ
তা পরে বন্দিব গো (ও ভাই) বামুন বৈষ্টম
তা পরে বন্দিব প্রভু গো (ও ভাই) দক্ষিণ উত্তর
তা পরে বন্দিব প্রভু গো (ও ভাই) পুবে ও পশ্চিম
তা পরে বন্দিব হরি হে (ও ভাই) দশেরই চরণ॥

গোষ্ঠ গেয়ে চলল। গানের সঙ্গে বাজতে লাগল ঢোল ধামসা টাসা কর্তাল আর কাঁসি। দোহারও চলে। গোষ্ঠ ছাড়া মধুসূদন, মঙ্গল, হপন, গোকুল, ভূতনাথ, ফটিক পর পর গেয়ে চলল।

তাদের গান আমাদের অস্তিত্বের মূলে ঘা দিল। মনের বন্ধ দরজা খুলে দিল। লোকজীবনের ভারি, বিশ্বস্ত দলিল পেতে লাগলাম সেই সব গানে। আমার উল্লাস কিছুতেই চেপে রাখতে পারছিলাম না। খালেদ চৌধুরী শান্তভাবে রেকর্ডিং করে যাচ্ছিলেন বটে কিন্তু আমার যেন তাদের গান আর বাজনার তালে তালে নাচতে ইচ্ছে করছিল।

অনেক গান গেয়েছিল তারা। গান গাইবার আগে বলে দিচ্ছিল, বাঁকুড়ার ঝুমুর, মানভূমের ঝুমুর বা পুরুলিয়ার ঝুমুর।

সাত টাকার হাঁড়িয়ায় সমস্ত বাউরি গ্রাম সেদিন নেশা করেছিল। নেশার প্রকোপ গানকে যে কিছুটা জখম করেছিল তার প্রমাণও পাওয়া গেল। গোষ্ঠর গান এক সময় কেমন যেন এলিয়ে পড়তে লাগল। মঙ্গল এক সময় ধামসা উল্টে দিয়ে উরু চাপড়ে বলল, 'আর একটু মদ খাইয়ে আসি গো।'

বাউরিদের গান পেয়ে আমরা দারুণ খুশি। মনে হল এখানে আমাদের অনেক কিছু পাওয়ার আছে।

সেদিনই সন্ধেবেলায় আমরা গেলাম তিলুড়ির কাছে আনন্দপুর গ্রামে। সেখানে সাঁওতালদের বসতি। আনন্দপুর গ্রাম থেকে আমরা বেশ কিছু সাঁওতালি গান সংগ্রহ করলাম। অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে এবং টেপরেকর্ডারে বাউরিদের গানের কিছু কিছু অংশ শুনিয়ে সাঁওতালদের গান গাইতে রাজি করানো গিয়েছিল। রাতের অন্ধকারে তড়িঘড়িতে গানের বিষয়গুলোর একটা হিসেব রেখেছিলাম। সে অনুযায়ী আনন্দপুর গ্রাম থেকে সংগৃহীত গানের সংখ্যা ও বিষয়বস্তুর হিসেব এইরকম—বাঁধনা পরবের ৪টি, দোলপরবের ২টি, চৈতপরবের ২টি, বিয়ের ৫টি আর ঘুমপাড়ানি ১টি।

আনন্দপুর থেকে আমরা যখন তিলুড়িতে ফিরছি শুনলাম, আমাদের জন্যে একদল গায়ক অপেক্ষা করছেন। তাঁরা উদয়পুর গ্রাম থেকে এসেছেন। মনসার পালা গাইবেন।

আমাদের শরীরে তখন ক্লান্তি নেমেছে। কিন্তু গ্রামীণ শিল্পীদের উৎসাহ দেখে আমরা আমাদের ক্লান্তি ভুলে গেলাম। রায়বাড়ির দোতলার একটা ঘরে শিল্পীরা বসে আছেন। ডমন মাল, সুধীর মাল, মোহন মাল, কাঁদন মাল এবং সতীশ মাল। ডমন ছিলেন মূল গায়েন, অন্যেরা দোহার। তাঁরা দুটি যন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন। ঢাক ও কর্তাল। ঢাকের আকৃতি ডমরুর মতো এবং সেটি ব্যাঙের চামড়ায় ছাওয়া। তাঁরা গেয়েছিলেন ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল। তাঁদের গাইবার রীতি ছিল পাঁচালির গায়নরীতি।

মূল গায়েন ডমন যথারীতি প্রথমে গানে আসর বন্দনা করলেন। তাঁর গান গাইবার একটা বৈশিষ্ট্য দেখলাম, গোড়ার দিকে তিনি একটা হাত সমানভাবে পেতে তা দিয়ে কণ্ঠনালীতে দ্রুত আঘাত করে যাচ্ছিলেন। আঘাতের ফলে কণ্ঠস্বরে কাঁপুনি সৃষ্টি হচ্ছিল। এটা তিনি পরে আর করেন নি।

সে সময়ে আমরা যে টেপরেকর্ডার নিয়ে গান সংগ্রহ করতাম তার কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। তখন ক্যাসেট টেপরেকর্ডার আমাদের দেশে আজকের মতো সহজলভ্য ছিল না। আমাদের যন্ত্রে একটানা তের মিনিট রেকর্ড করা যেত। সে কারণে আমাদের ইশারা করে করে পালাগানের গায়কদের থামাতে হচ্ছিল। সেভাবে আমরা মোট ৫২ মিনিট মনসার পালা রেকর্ড করি। সেটি রাঢ়ের মনসাপালার নমুনা হিসেবে আমাদের ইনস্টিটিউটে থাকল। গায়কদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি যে তাঁরা দীর্ঘ সময় ধরে মনসার পালা গেয়ে থাকেন। কখনো কখনো রাত কাবার হয়ে যায়।

ফিরে এসে আমরা টেপ বাজিয়ে বাজিয়ে তিলুড়ির গানগুলি লেখা ও তাদের স্বরলিপি তৈরির কাজে লেগে গেলাম। আমাদের উৎসাহ ছিল বাউরিদের গানে। বিশেষ করে তাদের ঝুমুরে। গানগুলি শুনতে শুনতে আমরা সুরের এবং কাব্যের এক নতুন জগতের পরিচয় পেতে থাকি। সে জগতের কথা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আগে জানতে পারিনি। আমাদের মনে হল লোকসংগীতের বিচারে তিলুড়ি একটি খনিবিশেষ। আর সে খনি এতদিন অনাবিষ্কৃত ছিল।

দ্বিতীয়বারে খালেদ চৌধুরী ওই অঞ্চলের বেশ কিছু ভাদু ও টুসু গান সংগ্রহ করে আনলেন। তাদের মধ্যে বেশির ভাগ গান ছিল মেয়েদের। মেয়েদের গান নেওয়ার ব্যাপারে আমাদের বলবার মতো কিছু অভিজ্ঞতা আছে। প্রথমবারে আমরা যখন বাউরিদের গান নিই তখন বাউরি মেয়েরা অনুযোগ করেছিলেন যে আমরা পুরুষদের গান নিলাম, মেয়েদের গান নিলাম না কেন? এ প্রশ্নে আমরা খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু তখন আমাদের হাতে সময় নেই। তাঁদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে আমরা আবার আসব আর তাঁদের গান নেব। দ্বিতীয়বারে গীতা চৌধুরী উদ্যোগী হয়ে বাউরি মেয়েদের জড়ো করলেন। বাউরি মেয়েরা সেবার লম্বা ঘোমটায় মুখ ঢেকে একের পর এক গান গাইলেন। সে দলে যেমন প্রায় ষাট বছরের বৃদ্ধা ছিলেন, তেমনি আট দশ বছরের বালিকাও ছিল। সে দলে যেমন শ্রীমতীর মতো আশ্চর্য সুরেলা গলার গায়িকা ছিলেন, তেমনি প্রায় সবে কথা ফুটেছে তেমন শিশু গায়িকাও ছিল। তাদের স্বাধিকার ও সংঘবদ্ধতা লোকসংগীত গায়নরীতির চিরন্তন ছবিটি তুলে ধরেছিল। আমরা জনগোষ্ঠীর গানের চেহারা প্রত্যক্ষ করছিলাম। পরেরবার বাউরি মেয়েদের মাথায় ঘোমটা ছিল না। সেবার শ্রীমতী গানের কথা জেনে নেওয়ার ব্যাপারে আমাদের খুব সাহায্য করেছিলেন।

দ্বিতীয়বারে খালেদ আর একটা কাজ করেছিলেন। প্রথমবার যেসব সাঁওতালি গান সংগ্রহ করা হয়েছিল তাদের বিষয়বস্তু কি সেটুকু মাত্র আমরা নোট করেছিলাম। দ্বিতীয়বারে তিনি তাদের কথাও লিখে নিলেন। সাঁওতালপল্লীর অভিজ্ঞতার কথাও শোনাবার মতো। প্রথমবার যে সব সাঁওতাল পুরুষ আমাদের গান সংগ্রহের ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন দ্বিতীয়বারে তাঁদের কাউকে পাওয়া গেল না। সাঁওতালপল্লীতে যেন এক্সোডাস ঘটে গিয়েছে। এক বৃদ্ধা আমাদের মনে রেখেছিলেন। তিনি খালেদকে চিনতে পারলেন এবং গানের কথা লিখে নিতে খুব সাহায্য করলেন।

এই সূত্রে আর একটা কথা। প্রথম এবং দ্বিতীয় দুবারই সাঁওতালদের বলা হয়েছিল, তাঁদের যদি চাষবাস বিষয়ক কোনো গান থাকে তাহলে তাঁরা যেন সেটা শোনান। সে কথায় তাঁরা জানালেন যে তাঁদের সে রকম কোনো গান জানা নেই। জানি না অন্য অঞ্চলের সাঁওতালদের সেরকম গান আছে কিনা। কিন্তু লাঙল দেওয়া, বীজ বোনা অথবা ধান কাটার কোনো গান আমরা এখনো পর্যন্ত সাঁওতালদের কাছে বা অন্য কোনো গ্রামীণ সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর কাছে পাইনি। অথচ আমাদের শহুরে রচয়িতারা শহরে বসে এ-জাতীয় গান রচনা করে ফেলেছেন। তাদের নজিরেই কি ধান কাটার গান 'ফোকসঙ' বলে চালু হয়েছে? আর এক শ্রেণীর লোকসংগীত-গবেষক, যাঁদের কেউ কেউ আবার 'ফোকের ডাক্তার' হিসেবেও সম্মানিত, 'ওয়ার্কসঙ' বা 'কর্মসংগীত' নামে এক অস্তিত্ববিহীন লোকসংগীতের গবেষণায় মেতে গিয়েছেন!

১৯৭৫-এ আমরা আবার গেলাম। সেবারে দ্বিতীয় দফার গানের কিছু কিছু শব্দ ঠিক মতো জেনে নেওয়া গেল। আর আরো কিছু নতুন গান সংগ্রহ করা গেল। মেয়েদের মধ্যে একজনের গলা আমাদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করল। ভারি সুরেলা গলায় আর সাবলীল ঢঙে সে বাউরি মেয়েদের গানে মূল গায়েনের ভূমিকা পালন করছিল। তার নাম রেনি। রেনি গোষ্ঠ বাউরির মেয়ে। সেবার রেনির বাঁধা নতুন গান 'কটা বাজল ঘড়ি...' অনেকের মুখে মুখে ফিরছিল। গোষ্ঠকে নিয়ে আমরা আলাদাভাবে বসেছিলাম।

১৯৭০-এ প্রথম দেখার পর থেকে গোষ্ঠ বাউরির প্রতি আমার একটা অদ্ভুত আকর্ষণ জন্মে গিয়েছিল। আমার কাছে সে ছিল একজন আদর্শ শিল্পী। ১৯৭৫-এ তাকে যখন আবার দেখলাম তখন আমার ধারণা আরো পাকা হয়ে গেল। আমাদের ফরমাস মতো সে একের পর এক গান গেয়ে শুনিয়েছিল। আবার ধীরে ধীরে গানের কথা আউড়ে লিখে নিতে সাহায্য করেছিল। আঞ্চলিক অনুষঙ্গের ব্যাপারও সে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিল। গানের সঙ্গে সঙ্গে সে বলে যাচ্ছিল বাজনার বোল। আর কি মমতা মানুষটার প্রাণে। আশেপাশের বাচ্চাদের চেঁচামেচিতে আমরা বিরক্ত হলে সে বড় আদরের হাসি হেসে বলছিল, 'উয়ারাও সুইনবেক বটে।' মেয়েদের দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলছিল, 'লাইজ কেনে গো তুদের!' সেদিন গোষ্ঠ কিন্তু মদ খায়নি।

তিলুড়ি বলতে আমরা এখন সবার আগে বাউরিদের গান বুঝি। তাদের গানে আমরা আমাদের একটি বিশেষ অঞ্চলের লোকসংগীতের এক সজীব ধারার সন্ধান পেয়েছি। ভাদু, টুসু, জাওয়াইলা প্রভৃতি আঞ্চলিক গানের সুরের মূল কাঠামো আমরা পেয়ে যাই বাউরিদের প্রাচীন গান ঝুমুরের সুর কাঠামোয়। আমরা অনুমান করি, শুধু বাউরি নয়, রাঢ় বাংলার আদিম অধিবাসী মাত্রই তাঁদের গানে ঝুমুরের আদিম কাঠামোটি ধরে রেখেছেন। সেই কাঠামোর ওপরেই এ অঞ্চলের অন্যান্য বিষয়াবলম্বী গানের সুর ডালপালা মেলেছে।

বাউরিদের গানের সুর শুধু নয় তাদের কথাও লোকজীবনের প্রতি বিশ্বস্ততার কারণে এবং প্রকাশভঙ্গির স্বতঃস্ফূর্ততা, পরিমিতি ও সরলতার গুণে আমাদের মুগ্ধ করে। পাঠকদের তার কিছু পরিচয় দেবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি গান তুলছি। প্রণয়িনীর সঙ্গে মিলিত না হতে পারার জন্য পুরুষের আক্ষেপ

খেলতে ছিলুম বাগানে
গৌর বলে ডাকলি না কেনে।
ফুল বাগানে ও ভাই মালির বাগানে।

(এই মালির বাগানে আমার
ও ভাই ফুল বাগানে)
খেলতে ছিলুম বাগানে ॥

রাধাকৃষ্ণের রূপকে চিরন্তন প্রেমের বেদনা

যমুনার ই কালো জল
আজ ননদিনীর কত ছল(রে)।
লীল সাড়ি পরতে লারি ভয়ে
রান্নার সালে যাই স্যামের গুণ গাই
স্যামের লাচনায় [লালসায়] বসে থাকি।
আয় ভাই নয়নে দেখা করি
আমার দু নয়নে বএ দিবানিসি ॥

এ গান কি এমন তথ্যের ইঙ্গিত দেয় না যে লোকসংগীতের রক্তমাংসের নায়িকা পরে ভাববাদী তত্ত্বের বিগ্রহে রূপান্তরিত হয়েছেন

শীতে কাপড়বিহীন (লিকাপইড়্যা) মানুষের অবস্থা কি রকম হয় নিচের গানে তার বর্ণনা শ্রোতাকেও শীতার্ত করে

যার কাপড় তার জাড়
লিকাপইড়্যার পাথর আড়।
লিকাপইড়্যা রইল নিশি জাইগে
দেখ ভাই জাড়ে পরান লিল ঘেরি ॥

তামুক না খেয়ে যে কাজ করা যায় না আর তার জন্যে যে কতো রকমের আয়োজন করতে হয় লোককবি তাও বর্ণনা করেন

তামুক না খাইয়েঁ রইতে লারি
সুকান পাতেঁরই জোগাড় করি।
আগে লিব দুন্দলাটি
কাঁধে লিব কোদাল লাঠি
আমরা তামুক খাইয়েঁ
আইড় দুটি তুলি।
আমরা সুকান পাতায় চুটি করি ॥

'দুন্দলা' আঞ্চলিক শব্দ। অর্থ বুঝতে আমাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। অনেক খোঁচাখুঁচির পর জানতে পারি, শব্দটি দুন্দলা এবং তার অর্থ—খড়ের শক্ত করে পাকানো বা পেঁচিয়ে বাঁধা আঁটি। চাষীরা তামুক খাওয়ার জন্য তাতে আগুন জীইয়ে রাখেন।

'লাচকাঠি' (কাঠিনাচ)-র একটি গানে আশ্চর্য সামাজিক দায়িত্ববোধের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম

সাঁওলি ধবলী গাই
পালের আগু যাই
ও বাগাল, ঘুরা ঘুরা রে
খন্দ খাইলে মন্দ বইলবেক
লোকে দিবেক গাইল ॥

গানটির ছন্দ শ্রোতাকেও নৃত্যোন্মুখ করে তোলে। এই সূত্রে আর একটি গান উল্লেখ করি

মেঘ করেছে তরু মূলে
এই মেঘে ভাসাবেক জলে
ও বলাইরে
এত জল আইল কোথা হইতে রে।
(লাচরে আঙিনার মাঝে
ঘাঙর ঘুঙর কেমন বাজে) ॥

ভারি সুন্দর লাগে আবহমান লোকজীবনের এই চিত্রকল্পটি

আমতলাতে কে তুমি
জামতলাতে কে তুমি
আমতলাতে কে ?
কালো মুখে ঘাম পড়েছে
গামছা পুছাই দে।
আষাঢ় শ্রাবণ মাসে কাদা লাইগেছে ॥

এ গানের অর্থ বোঝার জন্যেও যথারীতি আমাদের লেখাপড়া না জানা লোকশিল্পীদের সাহায্যই নিতে হয়েছিল। আষাঢ় শ্রাবণ চাষের সময়, চাষীদের কাজের অন্ত থাকে না। সে সময়ে মাঠের কাজে তাঁদের কালো মুখে ঘাম ঝরে, শরীরে কাদা লাগে।

একটা গানে চুনোপুঁটিদের পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া আর স্বাধীনচেতা মানুষের গণ্ডগোল লাগিয়ে দেবার সামাজিক বাস্তবতা চমৎকার দার্শনিক সত্য লাভ করেছে

ওরে ঠেলাজাল
আমি বাইব নদীর কিনারে।
এই পুঁটি ডাইড়কেনো মাছ
বিকাই গেল বাজারে।
যদি হইত গড়ই শোল
লাগাই দিত গণ্ডগোল
এই দয়ের মাছ না পড়ে ডাঙাইলে
সাঁতার দিলি ভবজলে ॥

চোদ্দ বছরের ছেলে ফটিক বাউরি শ্রুতিপরম্পরায় শেখা পুরুলিয়ার সুরে যে গান গেয়েছিল তাতে পূর্ণ যৌবনের একটি আশ্চর্য বিশেষণ পেয়েছিলাম আমরা। আর পেয়েছিলাম প্রেমের নিবেদিত চিত্রকল্প আর দুর্বল নরনারীর ভাব হওয়ার সেই চিরন্তন যুক্তিহীন শর্ত

ওই যে পুখুইর খুঁড়াইলে বন্ধু
আর না বান্ধাইলে ঘাট।
তবে ই গাঁয়ে পণ্ডিত নাই সব
পুরুষ বুঝাইতে
হে শ্যাম এত রাইতে কে সে !
এই পেটভরা যৈবন রয়েইছি তার হাতে
বন্ধু, এত রাইতে কে সে !
এত রাইতে আইলে বন্ধু বইস হে পালঙ্কে
পা ধুয়াব নয়নজলে মুছাইব কেশে
না দিব ছাড়িয়া।
তবে সুন্দি আর শালুকের ফুল
ফুটে আঁধার রাইতে।
যার সঙ্গে যার ভাব থাকে
ছুটাইলে কি ছুটে ॥

তিলুড়ির আর একজন লোকশিল্পীর কথা না বললে নয়। সে রবি বাউরি। ১৯৭৫-এ আমরা বড় রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকানে চা খাব বলে বসেছি। দোকানদারের কথামতো একটি লোক উনুনে আঁচ তোলার জন্যে পাখা নিয়ে বাতাস করতে বসে গেল। বোঝা গেল সে দোকানদারের ফাইফরমাস খাটে। লক্ষ করলাম কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে সে গান গাইছে। গলার আওয়াজটা একটু নাকি, কিন্তু গলায় সুর আছে। আমরা বলতে সে একটা গান শোনাল। ঝুমুর। কথা বলে জানতে পারলাম তার নাম রবি বাউরি। একটু চা আর মুড়ি পাবে বলে সে দোকানে গতর খাটায়। সে আর কি করে, কোথায় থাকে জানতে পারলাম না। হয়ত জানাবার মতো তার কিছু নেইও। ভারি দুঃখী আর রহস্যময় লাগল লোকটাকে। সে যে গান শোনাল তার বিষয়বস্তুও দুঃখ আর রহস্যময়তায় ভরা। তার মুখে শুনে শুনে গানটি লিখে নিয়েছিলাম। গানটি এই :

ঝাঁ কুড় কুড় জনমচাঁদ
পুরুষের নাম জয়চাঁদ।
পুরুষ হইয়ে বাইক্য বইলছে
রইব না খালভরার ঘরে।
শিশুই অঙ্গে কতই না মার খাব
চলো ভাই, বরং তোমার ইখান থাইকে
বিরাইয়েঁ পালাইব।
ই জগৎ ছ্যাইড়ে আমি পালাইন্ যাব
ওগো আমি কারু সাথে নাহি গো
মুহ্ দেখাইব ॥

গানটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। গানে স্বামীর দুর্বাক্য ও প্রহারলাঞ্ছিতা এক নারীর মর্মবেদনা প্রকাশ পেয়েছে। তার দুঃখের জগৎ ছেড়ে সে পালাতে চায়, কাউকে আর মুখ দেখাতে চায় না। কিন্তু 'ঝাঁ কুড় কুড় জনমচাঁদ/পুরুষের নাম জয়চাঁদ' চরণ দুটির অর্থ ও প্রাসঙ্গিকতা আমাদের কাছে এখনো খুব স্পষ্ট নয়।

আমরা রবিকে রাত্রে রায়বাড়িতে আসতে বলেছিলাম। রবি এসেছিল। দুটো ঝুমুর গান শুনিয়েছিল। দুটো গানেই দারিদ্র্যের জ্বালা প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম গানে সাঁঝে খাবার জুটলে বেহানবেলার ভাবনা অস্থির করে। আঁধার রাতে দুজন কুটুম এসে গেলে তাদের খেতে দিতে না পেরে গৃহস্থকে অপমানিত হতে হয়

চুয়া কাটা বরং ভালো
দশটা হইলে চল
চুয়া ঝাইড়ে চুয়া কাইটে সাড়ে সাত পাই ধান
ওগো কিসে বাঁচে পান।
সাঁঝে খাইয়েঁ তোর বেহানাকেই টান।
খাওয়া দাওয়া সইরে গো পড়িল
আঁধার রাইতে দুটা কুটুম গো আইল
জলঘটিটো নামাই দিয়েঁ
যেন ও তোর দাঁড়াই অপমান ॥

দ্বিতীয় গানে নারীর মন না পাওয়ার বেদনা। হয়ত তার মন পাওয়ার আশায় সেই ধনিকে গামছায় বেঁধে চিনি আর চিঁড়া এনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়

ওগো কতো করিলম যতন
নারী না হল আপন।
নারী গো অবলা বালা
কে করিল লীলা খেলা !
গামছায় বেঁধে আইনে গো দিব
চিনি আর চিঁড়া
কাঁদিস না গো ধনি
তোর আমার কিরা ॥ □
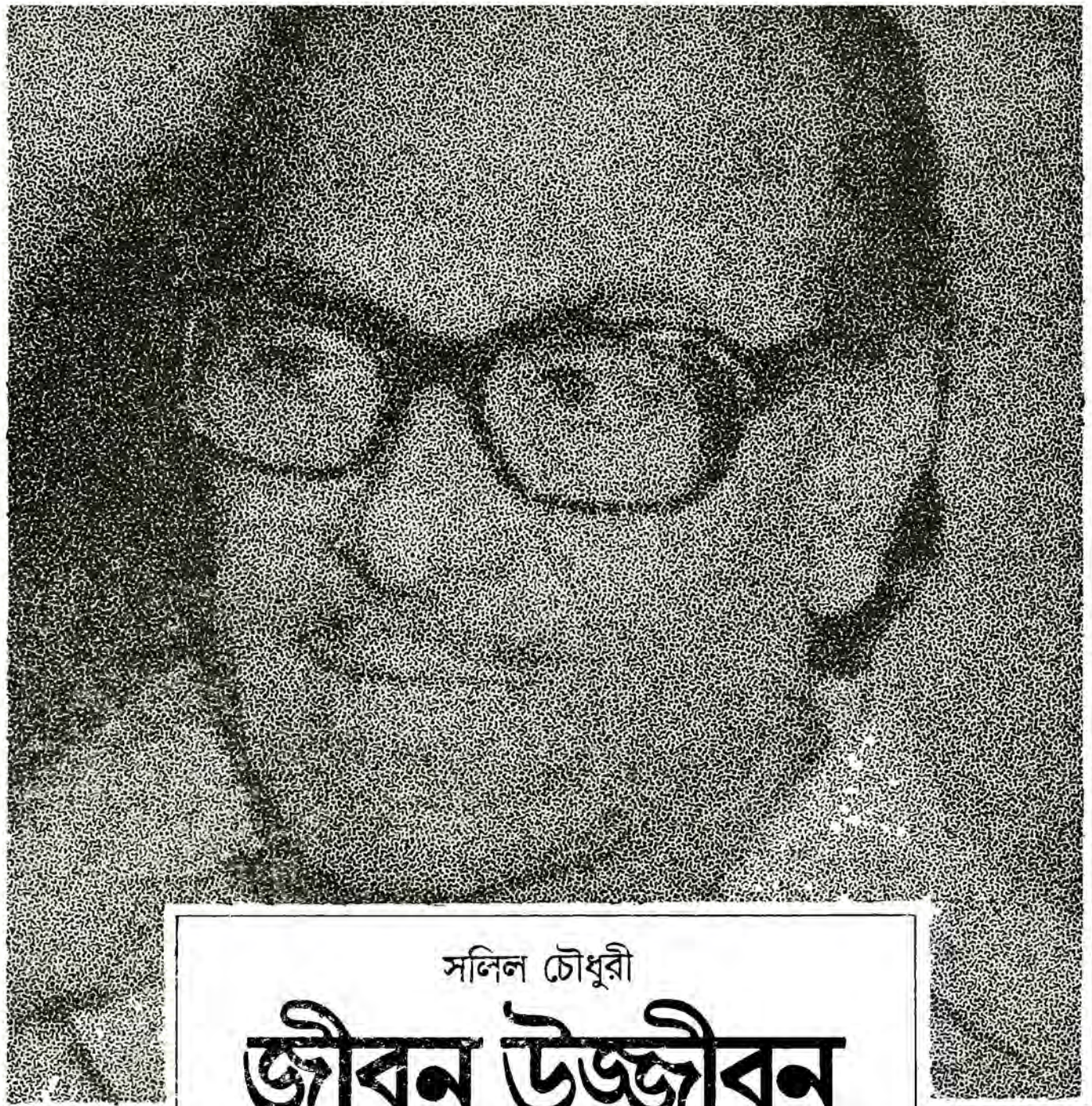
সলিল চৌধুরী

জীবন উজ্জীবন

কুড়ি

গুজব রটল যে ঐ মন্দির থেকে নাকি বাঁশীর আওয়াজ শোনা যায় ভরদুপুর বেলায়। শ্রীকৃষ্ণ মন্দির তো—শ্রীকৃষ্ণ নিজে বাঁশী বাজান। আমার খুব মজা লাগল। আমি যে ওদিকে যেতাম তা আমার মাও জানতেন না। কেননা নানা বন্য জন্তুর আস্তানা ছিল ঐ পাহাড়ী জঙ্গল আর হ্রদ। তবে হ্রদের পুবদিকে আমি একমাত্র বানর আর উল্লুক ছাড়া অন্য কোনো জন্তু দেখিনি। দেখেছিলাম প্রায় সিকি মাইল দূরে পশ্চিম পাড়ে হাতির পালকে জলে নামতে দু'একবার। এই হ্রদ থেকেই একটা ঝরনা বেরিয়ে আমাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে [illegible] দূর দিয়ে [illegible] করে বয়ে যেত। ছোট ছোট তেচোখা মাছ উজানে সাঁতার কাটত। এই [illegible] পাইপ বসিয়ে একটা হাইড্রলিক পাম্পের মত ব্যবস্থা করে চা-ফ্যাক্টরী এবং ম্যানেজার সাহেবের [illegible] জল যেত। জলের চাপে একটা লিভার উঠে আবার নেমে আসত। সারা দিনরাত ধরে শব্দ হোত—'ঠক্ ঠকাস','ঠক্ ঠকাস।' কুলিরা বলত ; 'ঠক্ঠকি' (বছর পাঁচেক আগে গিয়ে দেখি সেই ঠকঠকি এখনো আছে)। এই ঠকঠকির উৎস সন্ধানে বেরিয়েই প্রথম আমি ঐ হ্রদটার দেখা পাই। পাহাড়ের কোলে অরণ্যাবৃত সেই হ্রদ যে কি অপরূপ সুন্দর তা না দেখলে বলে বোঝানো যাবে না। বিশাল বিশাল গাছের ছায়া তার বুকে পড়েছে, মধ্যে আকাশ আর একদিকে সবুজ পাহাড়ের প্রতিবিম্ব।

পাহাড়ী ঝিঁঝিঁর ডাক চলছে সমানে—যেন কারখানা চলছে। মাঝে মধ্যে কয়েক সেকেণ্ডের বিরতি, তারপর আবার শুরু। এই কয়েক সেকেণ্ডের বিরতির সময় বুঝতে পারতাম Pure Silence কাকে বলে। নিজের নিঃশ্বাস,বুকের ঢিপঢিপ সব যেন শুনতে পেতাম—ভয় করত। আবার যখন শুরু হোত 'ঝিং ক্বিড়িকিড়ি' 'ঝিং কিড়িকিড়ি' মনে হোত যেন সঙ্গী পেলাম। বাবা মা দুজনেই আমার সম্বন্ধে চিন্তিত বুঝতে পারতাম। একদিন মা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর কি হয়েছে রে বাচু ? চুপচাপ থাকিস, একা একা ঘুরে বেড়াস, নয়তো মুখে বই গুঁজে পড়ে থাকিস, কি হয়েছে রে ?'

বললাম, 'কিছু না তো মা। কেন বাবা কিছু বলেছেন ?'

মা বললেন, 'উনিই তো আমাকে বললেন, জিজ্ঞেস করো বাচুর কি হয়েছে। পরীক্ষা দিতে পারেনি বলে কি মন খারাপ ?'

বললাম, 'না মা। পরীক্ষা দিয়ে আর কি হাত পা গজাবে ? চাকরি তো আমি

জীবনে করবো না। কাজেই শুধু তোমরা চাও বলেই পরীক্ষা দেয়া, অন্য কিছু না।'

মা বললেন, 'ওঁকে যেন এসব বলিস্‌নি। তোদের মুখ চেয়ে কত কষ্ট করছেন, কত আশা ওঁর তোরা বড় হবি, ভাল হবি...'

বড় হওয়া ভাল হওয়া কাকে বলে ? ঐ ঘানিতে জুতে যাওয়া ? একথা আর মাকে বললাম না। শুধু বললাম, 'ঠিক আছে মা। বাবাকে বোল আমার জন্য যেন চিন্তা না করেন।' বলে উঠে গেলাম।

এই সময় একটা কাণ্ড ঘটল। একদিন আমি সেই হ্রদের ধারে এসে বসেছি। হঠাৎ দেখি এক জায়গায় একটা শাড়ি ব্লাউজ গলার হার পুঁথির মালা আর তার অল্প কিছু দূরেই পড়ে আছে কয়েকটা রঙিন কাঁচের চুড়ি। ভাবছি এগুলো কার, কোথা থেকে এলো ? চারদিক তাকিয়ে জনমানবের কোনো চিহ্ন দেখলাম না। ভাবছি কি ভূতুড়ে কাণ্ড। বাবারে হঠাৎ ভুস্‌ করে একটা শব্দ হোল ! চেয়ে দেখি হ্রদের জলে একটি নারীর মাথা ভেসে উঠল। গাজর রঙের চুল, আর শালগমের মত সাদা এক মুখ। আমি একটা গাছের আড়ালে চলে গেলাম। তারপর সেই মাথার অধিকারিনী সাঁতরে এসে পাড়ে উঠলো—সম্পূর্ণ নগ্না। মনে হোল যেন কোন জলপরী। নির্বিকারভাবে একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে একটা গামছা দিয়ে চুল ঝাড়তে লাগলো—দুটি নিটোল স্তন ঝাঁকুনির তালে তালে দুলতে লাগল। আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। তারপর শাড়ি পরতে শুরু করে হঠাৎ যে গাছের ফাঁকে আমি ছিলাম সেদিকে তাকালো। আমার পা দুটো নিশ্চয় দেখা যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি শাড়ি দিয়ে গাটা ঢেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'কৌন ? কৌন বটে উখানেরে ?' বলে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। গাছের ফাঁক দিয়ে রোদের আলোটা তার মুখে পড়ল। আমি চিনতে পারলাম। এ সেই আমাদের বেহুলা সুখীয়া। কাছে এসে আমাকে দেখে ও যেন হকচকিয়ে গেল। বলল, 'ডাক্তার বাবুর বেটা নারে ? ইখানে কি করছিস বটে ?'

আমার মুখ থেকে বেরোল 'তুই বেহুলা না ? সুখীয়া না ?' বলল, 'হঁ ! আর তুতো হামার নখিন্দর, তাই না বটে ?' বলে কুলকুল করে হেসে হাওয়া লাগা গাছের মত দুলতে লাগল। ধপধপে ফর্সা ভিজে গায়ের ওপর শাড়িটা চেপে বসেছে। আমার শরীরটা যেন অবশ হয়ে এল। ওর হাতটা ধরে কাছে টানতেই ও বলল, 'তু ইখানে বোস্‌, হামি আসছি'—বলে হাত ছাড়িয়ে আড়ালে চলে গেল। খানিক পরে ফিরে এল গুছিয়ে শাড়ি ব্লাউজ পরে, সামনে এসে বসল। খানিকক্ষণ তাকিয়ে বলল, 'তু কত বড়টা হইছিস্‌ কত সোন্দর হইছিস'—বলে আমার হাত দুটো ধরে ওর কোলের ওপর রাখল। তারপর চোখ বড় করে গম্ভীরভাবে বলল, 'সাবধান থাক্‌বি বাবু ! বাগানের ছুকরীরা তুকে ছিঁড়ে খাবেক' বলে আমার গায়ের ওপর ঢলে পড়ে সেই কুলকুল হাসি। আমি আর থাকতে পারলাম না। ওকে দুহাতে জড়িয়ে বুকে টানতেই ও সমর্পণ করল। তারপর ক্ষুধার্তের মত আমার ঠোঁট দুটো ওর মুখের মধ্যে টেনে নিল আমাকে দুহাতে জড়িয়ে।

কয়েক মুহূর্ত—তারপর ওর নজরে পড়ল আমার বাঁশী। নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সন্দিগ্ধ চোখে একবার আমার দিকে, একবার বাঁশীর দিকে তাকাল। তাকিয়ে বললো, 'ইটা বানসুরী না ? তু বাজাস বটে ?' ঘাড় নাড়লাম। তারপর যেন ভীষণ অবিশ্বাস্য একটা প্রশ্ন করছে সেই সুরে বলল, 'আজ ভি তু বাজাইলি বটে ?' আবার ঘাড় নাড়লাম। ও সন্দেহভরা চোখে তাকিয়ে বলল, 'বাজাতো শুনি।'

আমি বললাম, 'এখানে নয়। আমার সঙ্গে চল্‌, তোকে শোনাব বাঁশী'—বলে সেই গুহার দিকে হাত ধরে ওকে নিয়ে গেলাম। তারপর গুহাতে বসে খানিকক্ষণ বাজাতেই ও যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল। বড় বড় চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। মনে হোল ও যেন ভূত দেখছে। তারপর আস্তে আস্তে উঠে পিছনে সরতে লাগল। আমি বন্ধ করলাম বাঁশী। বললাল, 'সুখীয়া ! কি হয়েছে রে তোর ?' ওর মুখেচোখে ভয়,তারপর কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে ফিসফিস করে বলল, 'তু ভগ্‌মান বটিস ! হামাকে মাপ করে দে'—বলে হঠাৎ ছুটতে আরম্ভ করল। আমি চিৎকার করে ডাকলাম, 'এই সুখীয়া !' গুহার মধ্যে প্রতিধ্বনি সুখীয়া সুখীয়া সুখিয়া করে ঘুরপাক খেতে লাগল। ততক্ষণে ও মিলিয়ে গেছে সবুজ পাতার আড়ালে। ও কাঠ সংগ্রহ করে একটা আঁটি বেঁধে রেখেছিল, সেটাও পড়ে রইল। এরপর থেকে আমি গুহায় বসে বাঁশী বাজানো বন্ধ করব স্থির করলাম। অযথা একটা কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিয়ে আমিই তো বাড়িয়েছি। মাকে গিয়ে হাসতে হাসতে সব কথা বললাম—কেমন করে আমাকে সাক্ষাৎ ভগবান ভেবে সুখীয়া ছুটে পালাল। মা আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'তা ওতো ভুল কিছু বলেনি রে। আমার ছেলে তো মানুষ নয়, সত্যিই দেবতা।' মার এই কথা আজও আমার কানে বাজে। আর যখনই কোনো ব্যবসায়িক খাতিরে শুধু টাকার জন্যে অকিঞ্চিৎকর কাজ কিছু করতে যেতে হয় মার কথা মনে পড়ে আর বলি, 'মাগো দেখ ! তোমার দেবতা-ছেলে টাকার জন্যে কিভাবে নিজেকে বিক্রি করছে, ওকে তুমি ক্ষমা কোর।'

সে রাত্রে আমার ছট্‌ফট করে কাটল। যতবার চোখ বুঁজি দেখতে পাই মুখিয়ার সেই জলে ভেজা নগ্ন শরীর আর সেই চুল ঝাড়া। মনে পড়ে ওর সেই তপ্ত চুম্বন আর আলিঙ্গন। মনে মনে বুঝলাম—ওকে আমার পেতেই হবে, ওকে না হলে আমার চলবে না। কি করে পাবো, কোথায় কেমন করে পাবো তা জানি না। ও যে আমাকে পেতে চেয়েছিল তাতে তো কোনো সন্দেহই নেই। কাল হোল আমার ঐ বাঁশিটা। জঙ্গলে ও কাঠ আনতে গিয়েছিল—কাঠ নিয়ে ফেরার আগে স্নান করতে নেমেছিল—হয়তো প্রায়ই যায় ! অ ছাড়া মনে পড়ল কাঠের বাণ্ডিলটা তো ফেলে গিয়েছে—নিশ্চয় ওটা নিতে যাবে। ঠিক করলাম কাল সকাল হতেই চলে যাব মিকির পাহাড়ে, অপেক্ষা করব ওর জন্যে। হ্রদের ধারে পৌছুতে পৌছুতেই সকাল নটা বাজল। মিকির পাহাড় কাঁপিয়ে তখন কালো কালো উল্লুকগুলো উকুউকু চিৎকার শুরু করেছে। কুলিরা বলে উকু বাঁদর। চা-বাগানের ভিতর দিয়ে পথ, রংবেরঙের শাড়ি পরে মেয়েরা মাথায় টুকরি নিয়ে পাত তুলছে, সবাই প্রায় চেনা, জিজ্ঞেস করে, 'কাঁহা যাছিস গো ডাগদারবাবুর বেটা ?' আঙুল দিয়ে পাহাড়ের দিকে দেখাই। হয়তো সুখিয়াও এদের মধ্যে পাত তুলছে। ফুলন বলে একটি মেয়েকে জিজ্ঞেস করি, "হ্যাঁরে, ফুলন—সুখিয়া আজ পাত তুলতে আসে নি ?" ফুলন অবাক হয়ে তাকায়, "সুখিয়া মানে সেই কুলি মেমের বিটি ? না, ওতো বাগানের কাম ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে"—ফুলন বলে। "সে কি ? কবে গেল ?" "এনেক রোজ হইল বাবু—ঐ সায়েব মেনেজারটা পিছে লাগলো তো" ফুলন বলে। "ও !"—বলে ওকে আর কিছু না বলে হ্রদের দিকে এগোলাম। কাঠের বাণ্ডিলটা যেখানে ছিল সেখানে এসে দেখি সেটা উধাও। হয়তো লুকিয়ে দাঁড়িয়েছিল কোথায়—আমি যাবার পর তুলে নিয়ে গেছে। কিংবা আরও সকালে এসে নিয়ে গেছে। ভীষণ মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাগানের কাজ ছাড়লে বাগানে তো কেউ থাকতে পারে না, তাহলে গেল কোথায় ? ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে যখন দুপুর গড়িয়ে যায় বাড়ি ফিরলাম। মা

চিন্তা করছিলেন—"এত বেলা অবধি একা একা কোথায় ছিলি বাবা ? উনি তো আবার জগাকে পাঠালেন বাগানে তোকে খুঁজতে।" চুপচাপ ভাত খেয়ে শুয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি সুখিয়ার কথা ভাবতে ভাবতে। বিকেল বেলা উঠে আবার ছুটলাম সেই হ্রদের ধার, বেরোতে দেরি হয়েছে তাই এবার সাইকেল নিয়ে গেলুম যতদূর যাওয়া যায়। বাগান শেষ হয়ে যেখানে জঙ্গল শুরু সেখানে একটা গাছের গায়ে সাইকেল রেখে হাঁটতে শুরু করলুম। জঙ্গলটা আশ্চর্য নিস্তব্ধ—ঝিঁঝি পর্যন্ত ডাকছে না ! হঠাৎ দূরে 'ফেউ' ডাকতে শুরু করল। 'ফেউ' ডাকা মানেই বাঘ বেরিয়েছে। তখন দেরিও হয়ে গেছে। বাগানের কাজ সেরে কুলিরা সব কল ঘরে পাত জমা দিতে গেছে। ওজন হবে, কে কত সের পাত তুলেছে সেই হিসেবে পয়সা পাবে, আবার যে বেছে বেছে শুধু কচি কচি আড়াই পাতা তুলেছে তার দাম হবে বেশি। জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। 'ফেউ' এর ডাকটা যেন ক্রমশ এগিয়েই আসছে। এবার ভয় করতে লাগল। সুখিয়া এসে থাকলেও এতক্ষণে নিশ্চয় চলে গেছে—মনকে এই সান্ত্বনা দিয়ে পিছন ফিরলুম। ভাবলুম—'চুলোয় যাক ! কাল থেকে আসবই না। মন থেকে মুছে ফেলে দেব ওকে'—এই ভেবে বাড়ি ফিরেই চুপচাপ শুয়ে একটা বই পড়তে শুরু করলুম। কিন্তু বই পড়তে ভালো লাগছে না—বাজনা শুনতে ভালো লাগছে না—খেতে ভালো লাগছে না। এ আমার হল কি ? একেই কি বলে প্রেমে পড়া ? যাব না ভেবেও রোজই যেতাম সেই হ্রদের ধারে। এমনি করে চারদিন কেটে গেল, সুখিয়া আর এলো না। আর থাকতে না পেরে হাসপাতালের ড্রেসার ঘনিয়াকে একদিন জিজ্ঞেস করলুম—"কোথায় থাকে জানিস সুখিয়া ?" ঘনিয়া যা বলল তা এক অদ্ভুত ব্যাপার। বছর দুয়েক আগে নাকি সুখিয়া বাগানের কাজ ছেড়ে মিকিরদের বস্তিতে চলে গেছে। এক বুড়ো মিকিরকে নাকি বাপ বলেছে, তার কাছেই ও থাকে।

"সেটা কোথায় ?"—জিজ্ঞেস করলাম।

ঘনিয়া বলল—"এই যে পাহাড়টা, এটা পেরিয়ে এর পিছনে আরও একটা পাহাড় আছে, তাতে আছে মিকিরদের বস্তি, ওদের গাঁ।"

আমি বললাম "আমাকে একদিন নিয়ে যাবি ?" ঘনিয়া আঁতকে উঠে বলল যে ঐ পাহাড়ি রাস্তা এত খাড়া যে এক মিকির ছাড়া আর কেউ যেতে পারে না। ওদের মেয়েরা যে টুকরির মধ্যে বাচ্চা নিয়ে, মালপত্র নিয়ে মাথায় ঝুলিয়ে অবলীলাক্রমে খাড়া পাহাড়ে উঠে যায় তা আমি জানতাম। ওদের মেয়েদের যেমনি স্বাস্থ্য, এই চওড়া পায়ের গোছ, নিটোল শক্ত পাছা, মঙ্গোলিয়ান হলুদ গায়ের রং, হাঁটু অবধি স্কার্টের মতো ওদের নিজেদের তাঁতে বোনা নীল রঙের নিম্নবাস আর বুকে বাঁধা ঐ নীল রঙেরই স্কার্ফের মতো এক ফালি কাপড়। ওদের সঙ্গে সুখিয়া কি করে মানিয়ে চলে ? ঘনিয়া বলল, "সুখিয়া এখন অনর্গল লংবং করে মিকির ভাষায় কথা বলে আর ওদের মতোই পোশাক পরে। দেখলে

কে বলবে মিকির মেয়ে নয়, চুলটা কেবল লাল।" আমি বলতে গেলাম আমি নিজে দেখেছি ওকে শাড়ি ব্লাউজ পরতে, বললাম না। বললাম, "তুই আমাকে রাস্তাটা দেখিয়ে দে, আমি নিজে চলে যাব। কাউকে বলবি না কিন্তু একথা।" ঘনিয়া বলল, "ডাগদারবাবু হামাকে মারি ফেলবেক।"—বলেই বলল, "ওকে দেখতে চাও তো কালই তো রবিবার—মিকির মেয়েদের সঙ্গে ও হাটে আসে সওদা করতে আর সব্জি বেচতে। হাটে গেলেই দেখতে পাবে।" বুকটা আমার ধক করে উঠল। যাক, তাহলে দেখতে পাব ? জিজ্ঞেস করলাম, "ঠিক বলছিস্ তো ?" ঘনিয়া বলল, "হাঁ বাবু, ঝুট কেনে বলব। গেলেই কাল দেখতে পাবে।"

রাতটা আমার এপাশ ওপাশ করেই কাটল। এক একবার রাগও হোল। আজ পাঁচদিন ধরে আমি জ্বলে মরছি আর ও দিব্বি আরামে আমাকে উস্‌কে দিয়ে মিকির বস্তিতে কাটাচ্ছে—একবার দেখতে পর্যন্ত এল না। ভাবলাম কাল একটা হেস্তনেস্ত করব। আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল—ওর সেই অপরূপ নগ্ন রূপ। মনে পড়ল ওর সেই ঘনিষ্ঠতা ! ভাবলাম নিশ্চয় কোনো কারণ আছে যে জন্যে ও আসতে পারছে না। হাজার হোক একটা কুলি মেয়ে তো বটে—'ডাগদারবাবুর ছেলের' সঙ্গে মেলামেশায় তো ওর সর্বনাশ হতে পারে—সে ভয়ও তো আছে। তাছাড়া ঐ খাড়া পাহাড় ডিঙ্গিয়ে আসা—কাজেই ওকে দোষ দেব কি করে ? আসল কথা আমার দুর্বলতা ছিল এত বেশি যে ওর ওপর রাগ করে থাকা বেশিক্ষণ ধরে আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আবার ভাবলাম ঘনিয়াটা মিথ্যে কথা বলল না তো ? গত একমাস ধরে আমি তো প্রতি
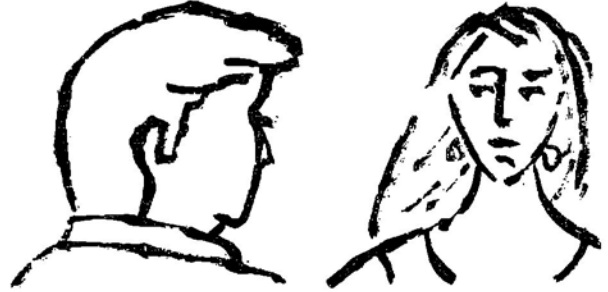
রবিবারই বাবার সঙ্গে হাটে যাই, আমাদের বাড়ি থেকে সাইকেলে গেলে পাঁচ মিনিটও লাগে না। কই, কোনো দিন তো সুখিয়াকে দেখি নি ! যতই মিকির পোশাক পরুক ওর লাল চুল আর মুখ দেখলে কি আমি চিনতে পারতুম না ? আমি না চিনলেও ওতো নিশ্চয় আমাকে দেখেছে। যে একদেখায় বলে 'তু ডাগদারবাবুর বেটা না ?'—সে কি করে আমাকে চিনল না ? এইসব নানা কথা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। ভোর রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লাম। আটটা নাগাদ মার ডাকে ঘুম ভাঙল—"বাচ্চু, তুই হাটে যাবি না ?" আমি ধড়মড় করে উঠে বসলুম, "হ্যাঁ মা হাটে যাব। বাবাকে বলো আমি একটু পরে যাচ্ছি, উনি চলে যান।"

এই হাটের দিনগুলো ছিল ভারি সুন্দর আর বিচিত্র। অন্তত শতখানেক গরুর গাড়ি এসে জড়ো হতো দূর দূর জায়গা থেকে। কেউ চারদিন কেউ পাঁচদিন ধরে গরুর গাড়ি চালিয়ে নিজেদের বেসাতি নিয়ে হাজির হতো নানা রকমের শাড়ি জামা ফ্রক মনিহারি জিনিস, নানা রকমের ফুল-তেল (সুগন্ধি তেল), পাউডার স্নো চুড়ি খেলনা, কত রকমের পুঁথির মালা, তামাক পাতার বাণ্ডিল, কত রকমের শাক সব্জি মাছ হরিণের মাংস মুরগি ছাগল বুনোহাঁস তিতির, কত জাতের কত ভাষার সব লোক যে জড়ো হোত এই সব হাট দিনে ! তাছাড়া নামত মিকিররা পাহাড় থেকে। পুরুষদের পরনে শুধু নেংটি আর কোমরে ঝোলানো রামদাও—মেয়েগুলোর দিকে তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না—এমনি স্বাস্থ্য আর সুন্দর। বয়স্কা মেয়েরা কানে ফুটো করে বিশাল এক একটা আস্ত বাঁশের গোল ফালি রিং-এর মত কেটে অবিশ্বাস্যভাবে কানের ফুটোর মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। আর তাম্বুল বলে একটি পদার্থ আছে আসামে যা কাঁচা সুপুরি মাটির তলায় পুঁতে রেখে তৈরি করা হয়—তার গন্ধ অনেকটা গুয়ের মতো, কিন্তু খেলে বেশ নেশা হয়। আমি বেশ কিছুদিন এই তাম্বুলের নেশাগ্রস্ত ছিলুম। আসামের সব জাতি উপজাতি এই তাম্বুল খায় পানের সঙ্গে। মিকিররাও খায়। মেয়েদের পোশাকের কথা আগেই বলেছি। এরা বেচতে আসে বিরাট বড় বড় লাল লংকা—অসম্ভব ঝাল—নাম মিকির-লঙ্কা। তাছাড়া লাল লাল একরকম সব্জি হয়, ভীষণ টক। তার নাম কুদরুম টেঙ্গা। টেঙ্গা মানে টক, কুদরুম মানে বোধহয় মিকির ভাষায় লাল। মেটে আলু, তাম্বুল, জংলিপান, ওদের তাঁতে বোনা কাপড় ইত্যাদি বেচে মিকিররা চাল ডাল নুন তেল তামাক নানা রকম পুঁতির মালা কানের দুল কাঁচের চুড়ি এই সব সওদা করে চলে যায়। আমি হাটে যেতাম প্রধানত এই সব দেখতে আর লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট কিনতে। তখনকার দিনে সস্তায় Bioscope বলে একরকম সিগারেট পাওয়া যেত, আমি তাই কিনতাম। মা জানতেন আমি সিগারেট খাই। বাবা স্বভাবতই জানতেন না। একবার বাবা টের পেলেন, তারপর থেকে নিজের ব্র্যাণ্ড 'গোল্ড ফ্লেক' আরও দু প্যাকেট বেশি করে এনে মাকে দিতেন আর বলতেন, "বাচ্চুকে দিও। খাবেই যখন বাজে সিগারেট যেন না খায়।"

ধারাবাহিক

ছবি পুণ্যব্রত পত্রী

বিষ্ণু বসু

বাংলাদেশের নাটক ও থিয়েটারের জগৎ

টিকিট কেটে নাটক দেখানো ঢাকায় শুরু হয়েছিল ন্যাশনাল থিয়েটারের আগেই। উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের গোড়ায় ঢাকায় পেশাদারি থিয়েটার ছিল গুটি তিনেক। কলকাতার নামী দামি দলগুলো সুযোগ পেলে এ শহরে নাটক করতে যেত উনিশ শতক থেকেই। শুধু গ্রেট ন্যাশনাল কেন, এ শতকের তিন বা চারের দশকেও ঢাকায় নাটক করে এসেছেন দুর্গাদাস বা শিশির ভাদুড়ি। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ঢাকায় কোনো নাট্য-ঐতিহ্য গড়ে ওঠে নি সাতচল্লিশের স্বাধীনতার আগে। পেশাদারি মঞ্চ টিকে থাকে নি বেশিদিন। 'নীলদর্পণ' নাকি প্রথম ছাপা হয়েছিল ঢাকা শহরেই। তবু নাটক লেখা বা অভিনয়ের ব্যাপারে ঢাকা তেমন ছাপ রাখতে পারে নি অখণ্ড বাংলার যুগে। শখের অভিনয় অবশ্য ছিল, সাবেক ঢাকা স্টেশনের কাছে ৰিউলী ইনস্টিটিউটের হলে ছিল পাকা মঞ্চ। কিন্তু সেখানে মাঝে মধ্যে অভিনীত হত কলকাতারই কিছু মঞ্চ সফল নাটক। স্থানীয় উৎসাহী নাট্যপ্রেমীরা অভিনয় করতেন 'কর্ণার্জ্জুন' বা 'পোষ্যপুত্র', 'পাণ্ডব গৌরব' বা 'চন্দ্রগুপ্ত'। অবিভক্ত বাংলায় নাটকের পীঠস্থান ছিল কলকাতা, একমাত্র কলকাতাই।

কিন্তু ৪৭-এর স্বাধীনতার পর থেকে ছবিটা খানিক পাল্টাতে লাগল। বঙ্গদেশের বৃহত্তর অংশটিকে রাজনৈতিক কারণে বিচ্ছিন্ন করে জুড়ে দেওয়া হল পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে—তার নতুন নাম হল পূর্ব পাকিস্তান। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এ অংশটি গোড়া থেকেই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা। পূর্ব বাংলা বা পাকিস্তান অখণ্ড বাংলার ঐতিহ্য থেকে প্রায় রাতারাতি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তাই পূর্ব বাংলার মানুষদের মধ্যে শুরু হল আত্মপরিচয় খোঁজার লড়াই। ৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনে ছিল সেই লড়াইয়ের প্রথম সাফল্য। এ লড়াই সংগত কারণেই সৃষ্টি করল একটি নিজস্ব নাট্য জগৎ। মুনীর চৌধুরীর 'কবর' ৫২-র আন্দোলনের অন্যতম সেরা ফসল। তাই সঠিকভাবে মুনীর চৌধুরীকেই ধরা হয় পূর্ব বাংলার নাটকের জনক হিসেবে।

মুনীর চৌধুরী অবশ্য নাটক লেখা শুরু করেছিলেন দেশ ভাগের আগেই। তাঁর প্রথম একাঙ্ক 'নওজোয়ান কবিতা মজলিস' লেখা হয়েছিল ৪৩ সালে। তারপর বছর দশেকের মধ্যে লিখেছিলেন আরো গুটি সাতেক একাঙ্ক। কিন্তু তাঁকে খ্যাতির চুড়োয় পৌঁছে দিল 'কবর'। ভাষা-আন্দোলনের অন্যতম নেতা মুনীর চৌধুরী কীভাবে জেলের মধ্যে লিখেছিলেন এ নাটক এবং সেখানেই কয়েদিদের দর্শক রেখে অল্প আলোতে কেমন করে গড়ে তোলা হয়েছিল প্রযোজনার জাদু—সে রোমাঞ্চকর কাহিনী তো এখন ইতিহাস হয়ে আছে। ভাষা-আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত 'মূর্তি' কবরে যেতে নারাজ—'আমি শোব না। আমি আর কোনদিন শোব না। একবার ঘুমিয়ে পড়লে ওরা আমাকে আর জাগতে

'নূরলদীনের সারাজীবন' নাটকের একটি দৃশ্য

দেবে না। তুমি বুঝতে পারছ না মা—না, না, আমি শোব না। আমি যাব না। আমি থাকব। আমি উঠে আসব'—এ সংলাপের মধ্য দিয়ে যেন প্রকাশ ঘটল পূর্ববাংলারই বিদ্রোহী মানুষদের মানসিকতা। এ যেন তাঁদেরই আইডেনটিটি খুঁজে নেবার শপথ।

৫২-র আন্দোলন যে জাতীয়তার জাগরণ ঘটাল, নাট্যজগৎ তার সামিল হল বটে কিন্তু পুরো ফয়দা তুলতে পারল না। প্রথম কথা, স্থায়ী মঞ্চ নেই। মফঃস্বল শহরগুলোতে তো দূরের কথা, খোদ ঢাকা শহরেই তখন কোনো স্থায়ী মঞ্চ ছিল না। তাই নিয়মিত টিকিট বিক্রি করে নাটক দেখানো সম্ভব হয়নি। আর নিয়মিত অভিনয় না হলে আর যাই হোক নাটক লিখতে উৎসাহ পাবেন কেন নাট্যকার? তবু মুনীর চৌধুরী লিখে ফেললেন বেশ কিছু একাঙ্ক ও দুটি পূর্ণাঙ্গ নাটক। তার মধ্যে অবশ্য অনেকগুলোই অভিনীত হল না। প্রবীণ লেখক আবুল ফজল তো তিনের দশকেই লিখেছিলেন অনেকগুলো একাঙ্ক, তিনিও সক্রিয় হলেন। এলেন আনিস চৌধুরী, সাঈদ

দুইবোন নাটকে ফেরদৌসী মজুমদার

আহ্‌মেদ, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্‌ প্রমুখ। ১৯৫৬-তে প্রতিষ্ঠিত হল ড্রামা সার্কেল। এ দল অভিনয় করলেন দেশী-বিদেশী বহু নাটক। সোফোক্লেস থেকে শ, রবীন্দ্রনাথ থেকে আনিস চৌধুরীকে নিয়ে এলেন পাদপ্রদীপের আলোয়। অভিনীত হল 'ইডিপাস', 'আর্মস অ্যাণ্ড দ্য ম্যান', 'রক্তকরবী', 'রাজা ও রানী', 'তাসের দেশ', 'মানচিত্র', 'কালবেলা' প্রভৃতি নাটক। নতুন দর্শক তৈরি হতে লাগল।

কিন্তু সময় পালটাল। এসে গেল আয়ুব খানের তানাশাহী। নাটকের উপর আরোপ করা হল নানা বিধি নিষেধ। ইংরেজ আমলের নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিলকে ভালো করে জিইয়ে তোলা হল। এ সব কারণে ও সাংগঠনিক দুর্বলতায় ড্রামা সার্কেল উঠে গেল। সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্‌ ও সাঈদ আহমেদ চলে গেলেন বিদেশে। মুনীর চৌধুরী বা অন্যান্যদের নাটক অভিনীত হতে লাগল কালেভদ্রে। মুনীর চৌধুরীর পূর্ণাঙ্গ নাটক 'রক্তাক্ত প্রান্তর' মঞ্চস্থ হয় ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স মঞ্চে ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে। ৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত মিনার্ভা নাট্যগোষ্ঠী অভিনয় করলেন 'এই তো সমাজ', 'বেদের মেয়ে', 'মাটির মানুষ', 'সিরাজদ্দৌলা' প্রভৃতি নাটক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হল ১৯৬৩-তে। তাঁরা অভিনয় করলেন শওকত ওসমান ও রামেন্দু মজুমদারের 'ক্রীতদাসের হাসি', কল্যাণ মিত্রের 'লালন ফকির', মুনীর চৌধুরীর 'দণ্ড ও দণ্ডধর', মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী'। এ ছাড়াও আরো কিছু নাটক। সাতরং দল অভিনয় করলেন সঈদ আহ্‌মদের 'মাইলপোস্ট'। পরিবেশ তৈরি হতে লাগল।

নাগরিক নাট্যদল প্রতিষ্ঠিত হল ৬৮ সালে। ততদিনে শুরু হয়ে গেছে আয়ুব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলন। তারপর তিনবছর ধরে চলল লড়াই যা তুঙ্গে উঠল ৭১-এ। আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রশ্নে মরিয়া হয়ে লড়াই চালাল পূর্ব বাংলার অগণিত মানুষ। সংকট থেকে অবশেষে তারা বেরিয়ে এল স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে। তৈরি হল নিজস্ব নাট্যজগত রচনার উপযুক্ত

নূরলদীনের সারা জীবন : বাংলাদেশের নাট্য প্রযোজনা

নূরলদীনের সারা জীবন। রচনা : সৈয়দ শামসুল হক। নির্দেশনা : আলী যাকের। প্রযোজনা : নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়। বিদ্যামন্দির, কলকাতা। ৯—১১ এপ্রিল ১৯৮৪।

অধুনা ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের সম্ভারে কাব্যনাট্যের বড়ই আকাল। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরে বুদ্ধদেব বসু ছাড়া কাব্যনাট্য রচনার তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য প্রয়াস দেখা যায় নি। দু'-একটি বিচ্ছিন্ন চেষ্টা হলেও সেগুলি মঞ্চোপযোগী হয়ে উঠতে পারেনি। কোনো কোনো নাটকে গান এবং কবিতার বহুল ব্যবহার হলেও মূল কথোপকথন সীমাবদ্ধ থেকেছে গদ্যেই। হয়ত কাব্যনাট্যের নাটকীয় গুণ সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান হয়ে উঠছি। এই অবস্থায় বাংলাদেশের নাট্যদল 'নাগরিক' নাট্যসংস্থার প্রযোজনায় কাব্যনাট্য 'নূরলদীনের সারা জীবন' আমাদের কাছে অন্যতর স্বাদ বয়ে আনল। এঁরা কলকাতা এবং দিল্লি সফরে এসেছিলেন 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস'-এর
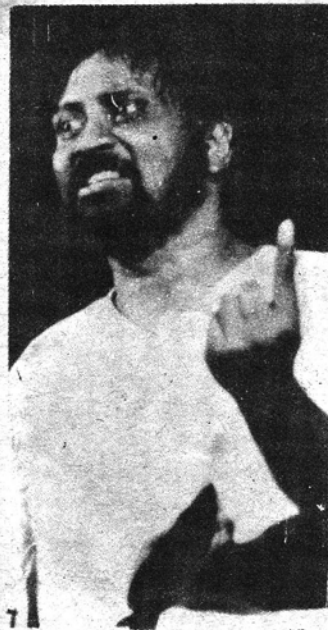
নূরলদীনের ভূমিকায় আলী যাকের

আমন্ত্রণে।

নাটকটি অনেকেরই অজানা এই আশঙ্কায় ছোট করে এর সারকথাটা বলছি। নাটকের পটভূমি পূর্ববাংলার রংপুর জেলা। সময় ১৭৮৩ সাল—পলাশী যুদ্ধে 'জয়ী' ইংরেজদের ব্যবসাক্ষেত্র যখন সাম্রাজ্যে পরিণত হতে চলেছে। এই সময় রংপুরের গ্রামাঞ্চলের ক্লিষ্ট, অনাহারী মানুষদের মধ্যে থেকে উঠে এসেছিলেন একজন গেরিলা কৃষক নেতা নূরুলউদ্দিন। রংপুরের সাধারণ মানুষদের মুখে মুখে তাঁর নাম দাঁড়ায় নূরলদীন। নাটকের প্রথমার্ধে আমরা তদানীন্তন রংপুর তথা বাংলার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থার কিছুটা পরিচয় পাই। এবং এরই মধ্যে থেকে কৃষকসন্তান নূরলদীন ধীরে ধীরে স্থানীয় কৃষকনেতা হয়ে উঠতে থাকেন। নাট্যকার নাটকের এই অংশের নাম দিয়েছেন 'কালের মানচিত্র'। দ্বিতীয়ার্ধে পাওয়া যায় 'মনের মানচিত্র'। নূরলদীনের পেছনে এসে জমা হতে থাকে আশপাশের নিরন্ন নিরক্ষর এবং নিরস্ত্র কৃষকেরা। নূরলদীনের ছেলেবেলার বন্ধু আব্বাস বারবার চেষ্টা করেন তাঁকে নিরস্ত্র করতে। শক্তিশালী, চতুর ইংরেজের সঙ্গে লড়ার মতো শিক্ষা ও শক্তি নূরলদীনের গণবাহিনীর কোথায়! তাছাড়া আব্বাসের আশঙ্কা নূরলদীনও বুঝি অজান্তেই আক্রান্ত হয়েছেন ক্ষমতার নেশায়, সাধারণের মাথায় উঠবার আকাঙ্খায়। ব্যথিত হন নূরল, ক্ষুব্ধও। তাঁর মনে পড়ে খাজনা মেটাতে হালের বলদ বেচে দিয়ে কীভাবে তাঁর কৃষক পিতা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন জোয়াল। এই জোয়ালেরই আঘাতে পিঠ ভেঙে মারা যান তিনি। শিশু নূরলদীনের

পরিবেশ।

কিন্তু আজাদী লড়াই সমাপ্ত হল কিছু ক্ষতি দিয়ে। লড়াই চলাকালে প্রবাসে ইন্তেকাল করলেন নাট্যকার সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ। এবং পাকিস্তানি সেনার দল হেরে যাবার শেষ লগ্নে খুন করল বহু বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে নাট্যকার মুনীর চৌধুরীকে। স্বাধীন বাঙলাদেশ যাঁর কাজে হত সব চাইতে বেশি উপকৃত, দুনিয়ার মঞ্চ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হল নির্মমভাবে।

কিন্তু ৭১-এর স্বাধীনতা বাঙলাদেশে নিয়ে এল নাট্য আন্দোলনের পরিবেশ। মরহুম মুনীর হয়ে উঠলেন এ আন্দোলনের প্রতীক। একে একে গঠিত হল নানা নাট্যদল। শুরু হল নিয়মিত অভিনয়। নাগরিক দল চালু করলেন টিকিট কেটে নাটক দেখার রীতি। এগিয়ে এলেন থিয়েটার নামে দলটি। তাঁরা শুধু নাটক অভিনয় করেই থেমে রইলেন না, নাটক নিয়ে একটি আলোড়নও তুললেন, প্রকাশ করলেন, 'থিয়েটার' নামে পত্রিকাটি। সামান্য অনিয়মিত হলেও এখনো তা বেরিয়ে আসছে যথারীতি। এগিয়ে এলেন আরণ্যক, নাট্যচক্র, ঢাকা ড্রামা, ঢাকা থিয়েটার প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়। ঘোষণা করলেন তাঁদের সামাজিক ও শৈল্পিক দায়ের কথা

পদাতিকের সোজন বাদিয়ার ঘাট নাটকের দৃশ্য

শুধু ঢাকা শহরেই নয়, নাটক ছড়িয়ে পড়ল গ্রামেগঞ্জে, বিভিন্ন মফঃস্বল শহরে। চালু হল থিয়েটার ওয়র্কশপ। চট্টগ্রামেই এখন আছে গোটা এগারো নাট্যদল—তির্যক, থিয়েটার ৭৩, অরিন্দম নাট্য সম্প্রদায়, নান্দিকার প্রভৃতি তাদের মধ্যে কয়েকটি। তির্যক সংস্থা বার করলেন একটি নাট্য পত্রিকা—'তির্যক' নামে। অভিনীত হতে লাগল বহু নাটক।

এসব নাট্যদল বিভিন্ন সময়ে ঘোষণা করলেন তাঁদের আদর্শ। নাগরিক 'সৎ ও সুস্থ নাট্যচর্চা গড়ে তোলায় বিশ্বাসী'। তাঁরা চাইলেন যেন দর্শনীর বিনিময়ে নাটক দেখার অভ্যাস বাড়ে, আওয়াজ তুললেন সাধারণ রঙ্গমঞ্চের জন্য। থিয়েটার-এর লক্ষ্য হল, ভালো নাটক প্রযোজনা, নাট্যপত্রিকা প্রকাশ ও নিয়মিত নাটক করা। 'যে ধরনের নাটকে সমসাময়িক জীবন আছে, জীবনের আধুনিক বিশ্লেষণ আছে' সে ধরনের নাটক প্রযোজনায় তাঁরা আগ্রহী। নাট্যচক্র বললেন, 'আমরা নাটককে কেবল শিল্পমাধ্যম হিসেবে দেখি না...একটা সামাজিক দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার ঘোষিত হয় আমাদের নাটকে।' তাঁরা চাইলেন নতুন প্রতিভার বিকাশের পথ করে দিতে। আরণ্যকের বক্তব্য 'বর্তমান সমাজ পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন।...এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় নাটক একটি শক্তিশালী মাধ্যম বলে আরণ্যক মনে করে।' চট্টগ্রামের তির্যকদল বললেন, 'যুগযন্ত্রণার প্রতিফলনে বিস্তৃত হোক প্রেক্ষাপট। নাটকের মুকুরে আমরা স্বরূপদর্শনে নিষ্ঠাবান।' থিয়েটার'৭৩ দাবি করলেন একটি জাতীয় রঙ্গমঞ্চ ও সেইসঙ্গে প্রতি অঞ্চলে একটি করে মঞ্চ। এমনি আরো নানা দল বহুবিধ বক্তব্য রেখেছেন। প্রায় প্রতিটি দল নাট্যকর্মীদের সামাজিক দায় ও শিল্পমনস্কতার কথা বলেন নিজেদের মতো করে। সেগুলি হল

এক· ফেডারেশনের ঘোষণা ছিল, সারাদেশের নাট্যচর্চার খবরাখবর

কাছে তাঁর পিতার মৃত্যু-আর্তনাদ শুনিয়েছিল মৃতপ্রায় জন্তুর গোঙানির মতো। এই আর্তনাদ যুবক নূরলদীনকে প্রতিমুহূর্তে তাড়া করে ফেরে, তাঁকে বাধ্য করে শাসক-শোষক-লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিতে। অতঃপর শক্তিশালী ও কৌশলী সেনাবাহিনী গড়ে তোলার কাজে তাঁরা আত্মগোপন করেন জঙ্গলে। ব্রিটিশপ্রভুরা জারি করেন মার্শাল ল'।

এদিকে নূরলদীন জানতে পারেন তাঁর স্ত্রীর মধ্যে জন্ম নিয়েছে ক্ষমতার, বিলাসের লোভ। তিনি যখন যুদ্ধে যান তাঁর 'পতি গরবে গরবিনী' স্ত্রী প্রতীক্ষায় থাকেন 'আগুন পাটের শাড়ির' (রেশমের শাড়ি) আশায়। ক্রুদ্ধ নূরল বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে। কিন্তু কোথায় যাবেন? জঙ্গলের ডেরায় ইতিমধ্যে আসতে শুরু করেছে দূর-দূর অঞ্চলের হাজার হাজার কৃষক। তারা যোগ দিতে চায় 'নব নূরলদীনের গণবাহিনীতে —কৃষকনেতা নূরলদীনই তাদের 'নবাব'। নূরলদীন স্তম্ভিত—ব্যাঙের হাসি আব্বাসের মুখে। সেই মুহূর্তে নূরলদীন সিদ্ধান্ত নেন নীলকুঠি আক্রমণের। সশস্ত্র ইংরেজের সঙ্গে অসম যুদ্ধে মারা যান নূরলদীন। নেতাবিহীন গণবাহিনীর দায়িত্ব আপনা হতেই এসে পড়ে আব্বাসের উপর। এক বিশেষ মুহূর্তে তাঁর গলা থেকে বেরিয়ে আসে নূরলদীনের কণ্ঠোৎসারিত সেই ডাক—'জাগো বাহে, কোনঠে সবায়' (জাগো হে, কোথায় সবাই)

প্রশ্ন জাগে, কুশলী নেতা নূরলদীন কেন অপ্রস্তুত অবস্থাতেই ইংরেজ কুঠি আক্রমণের ডাক দিয়েছিলেন—এ তো আত্মহত্যার সামিল। তবে কী আজন্ম যে মানুষ নবাব-জমিদারদের হাতে নিগৃহীত হয়েছেন, জনমানসের মধ্যে নিজেরই সেই রূপ দেখতে পেয়ে তিনি শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন? যাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল মাতৃভূমি থেকে নবাব-সাহেববর্গকে উচ্ছেদ করার, এক ভাবী নবাবকে অঙ্কুরেই বিনাশ করেই কি তিনি সে কাজ শুরু করে দিয়ে গেলেন? এ প্রশ্ন অবশ্য নাটকেই নিহিত।

নাট্যপ্রবাহের প্রচণ্ড গতি এবং সংলাপের স্বচ্ছন্দ সাবলীলতার মধ্যে ইতিহাস-আশ্রিত আবেগ দানা বেঁধেছে। তীব্র ও শুদ্ধ আবেগই এ নাটকের প্রাণ, এ নাটকের শক্তি—হয়ত সঙ্গে সঙ্গে সেই

আবেগের অতিরিক্ততাও এ নাটকের দুর্বলতা। বাংলাদেশের সব শিল্পরীতির ক্ষেত্রেই যেটা দেখা যায়, তাঁদের নবীন ও সজীব প্রাণশক্তি এবং কিছুটা অপরিণতিও, একসঙ্গে। সংলাপের ভাষা ও ছন্দ ব্যবহারে নাট্যকার আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। রংপুর জেলার ডায়ালেক্টে এবং লোকায়ত ছড়ার ছন্দে যেমন তিনি নূরলদীন বা কৃষকদের কথাকে গেঁথেছেন, তেমনি কোম্পানির সাহেবদের উচ্চারণে ব্যবহার করেছেন বাংলা ভাষার সুপরিচিত অনুবাদগন্ধী বিদগ্ধ বাকরীতি। ভাষার এই দ্বৈততা বাস্তবের দুটি তলকে সামনে হাজির করেছে অসামান্য নৈপুণ্যে।

একথা অবশ্যস্বীকার্য যে এমন কুশলী প্রযোজনা বিশেষত দেশী নাটকের ক্ষেত্রে খুব কমই দেখা যায়। এই প্রযোজনার শ্রেষ্ঠ সম্পদ মনসুর আহমেদ-এর মঞ্চ-পরিকল্পনা। সারা মঞ্চ জুড়ে রয়েছে শুধু একটি ঢেউ খেলানো বড় প্ল্যাটফর্ম। এই মঞ্চে পাত্রপাত্রীরা এসে দাঁড়ালেই বিভিন্ন লেভেলের গুণে সুন্দর সুন্দর

সংকলিত করে প্রতি দুমাস অন্তর একটি বুলেটিন প্রকাশ করবে।

দুই· ঢাকার বাইরের দলগুলিকে ঢাকায় নাটক মঞ্চায়নের আমন্ত্রণ জানাবে।

তিন· দেশের বিভিন্ন স্থানে নাট্য প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করবে।

ফেডারেশন তার লক্ষ্যে সম্পূর্ণ সফল না হলেও কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে গত তিন বছরে। সাকুল্যে যদিও মাত্র গোটা তিনেক বুলেটিন তারা বার করতে পেরেছে কিন্তু ওয়র্কশপ চালু করার ব্যাপারে ভালোই কাজ গড়িয়েছে। সবচাইতে বড় কথা, সারাদেশের প্রায় বাহাত্তরটি দল এক সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করছেন, তার একটা প্রভাব সমাজ ও শিল্পক্ষেত্রে পড়বেই। অবশ্য আর্থিক দুরবস্থার জন্য তাঁদের সব কাজ খানিক পিছিয়ে যাচ্ছে। তবু আরণ্যক দলের নাট্যকার ও গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের অন্যতম সভাপতি জানিয়েছেন, 'বাংলাদেশের সকলক্ষেত্রে আজ যে হতাশা, একমাত্র গ্রুপ থিয়েটারই আজো যৌথ কর্মতৎপরতার একটি সুস্থ ক্ষেত্র। এই সুস্থ ক্ষেত্রকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে প্রয়োজন সংগ্রাম—আর এই সংগ্রামের এক মহত্তম ক্ষেত্র হচ্ছে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন

বশীর আলহেলাল 'স্বর্গের সিঁড়ি' নামে একখানি নাটক লিখেছেন (প্রকাশ ১৯৭৭)। এ নাটকের নায়ক শাহেদ নাট্যপ্রতিভার অধিকারী, একথা তার পরিচিত স্বীকার ও বিশ্বাস করে। শাহেদ ঢাকা শহরে নাটক মঞ্চস্থ করায় বিশ্বাসী নয়। তার মতে, ...'এই ঢাকা শহরে নাটক তো আমরা কম করি নি।...কেউ কখনো এসে আমাদের সম্বন্ধে, কি আমাদের নাটকের গল্প সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করেছে কখনো? কিন্তু মফঃস্বলে একটা নাটক নামা মানে যে জিনিস মফঃস্বলের মানুষ বুঝতে পারে—তাকে মাথায় তুলে ধিতাং ধিতাং করে নাচবে। কিন্তু তাদের মনে যদি সন্দেহ জাগল, তুমি এক্সপেরিমেন্ট করছ, না হাতি করছ, তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবে নাকি? তাই শাহেদ-দ'ল যায় গ্রামে, সেখানে মঞ্চস্থ করে নিজের নাটক। সে যখন জানায়,...'এখানে বাবা চারদিকই ফাঁকা। জোড়াজোড়া, জ্বলজ্বলে উদ্যত চোখ চারদিক থেকে তোমাকে ঘিরে রেখেছে। তবে যদি তোমার বুকে বল থাকে আর গলায় জোর থাকে তাহলে তোমার ভয়ের কিছু নেই। সূক্ষ্ম আর্ট আর জটিল মনস্তত্ত্বের দরকার নেই'—তখন সে একটি বিশেষ মানসিকতারই প্রকাশ ঘটায়।

এ মানসিকতাকেই যেন স্পষ্ট করে তুলেছে ঢাকা থিয়েটারের একখানি ইশ্‌তাহার—'গ্রামীণ মেলা ও নাটক প্রসঙ্গে'। তাঁদের ঘোষণা—'ঢাকা থিয়েটার আধুনিক নাট্যকলার সঙ্গে বাংলাদেশের নিজস্ব নাট্য-আঙ্গিকের সমন্বয় সাধনে বদ্ধ পরিকর।

সামগ্রিক এ আন্দোলন ও ধ্যানধারণার প্রেক্ষাপটে রচিত হয়ে চলেছে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নাটক। একদিকে স্বাধীনতার যুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল মুহূর্তগুলো, অন্যদিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয় এবং সাধারণ মানুষের বিধ্বস্ত জীবন নাট্যকারদের উদ্বুদ্ধ করছে। স্বাধীনতার যুদ্ধকে মনে রেখে আলাউদ্দিন আল আজাদ লিখলেন 'নিঃশব্দ যাত্রা', কল্যাণ মিত্র 'একটি জাতি একটি ইতিহাস' ও 'জল্লাদের দরবার', আসাদুজ্জমান 'জল্লাদের পতন' ও 'এক নদী রক্ত', নীলিমা ইব্রাহিম 'যে অরণ্যে আলো নেই' মমতাজউদ্দিন আহ্‌মদ 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। এমনি আরো অজস্র নাটক। সামাজিক রাজনৈতিক অবক্ষয়ের চেহারা ধরা পড়ল আবদুল্লাহ আল মামুন, মমতাজউদ্দিন আহ্‌মদ, সেলিম আলদীন, আলাউদ্দিন আল আজাদ, জিয়া আনসারী প্রভৃতির নাটকে। আল মামুন তাঁর 'সুবচন নির্বাসনে' ও 'সেনাপতি' নাটকে দেখালেন মূল্যবোধগুলো কেমন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতার পরবর্তী পরিবেশ কী ভয়াবহ হয়ে উঠেছে তার পরিচয় পাওয়া গেল আল মামুনেরই 'আয়নায় বন্ধুর মুখ' নাটকে। রশীদ হায়দার তাঁর 'তৈলসংকট' নাটকে তুলে ধরলেন কালো বাজারির নোংরা ছবি এগিয়ে এলেন এমনি আরো অনেক নাট্যকার।

অনুপ্রেরণা হিসেবে উজ্জ্বল হয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। বিভিন্ন নাট্যদল নানা সময়ে অভিনয় করেছে তাঁর 'রক্তকরবী', 'রাজা ও রানী', 'তাসের দেশ' 'অচলায়তন'। মঞ্চে আসছে

কম্পোজিশন আপনিই গড়ে ওঠে। আর কোরাসের দৃশ্যে তাই আমরা পেয়ে যাই দুর্লভ কিছু দৃশ্যবন্ধ। এমন মঞ্চে দৃশ্য পরিবর্তনের জন্যও কোন চাতুরির আশ্রয় নিতে হয় না। দর্শক অনায়াসেই হয়ে উঠতে পারেন কল্পনাশীল। সারা যাকেরের পোশাক-পরিকল্পনাও খুবই মৌলিক। উজ্জ্বল রংয়ের ব্যবহারে সংঘাতের দৃশ্যগুলি বর্ণময় হয়ে ওঠে। আলো প্রয়োজনানুগ। আলোর কোনোরকম বাড়াবাড়ি না করাটাই অবশ্য এ নাটকের চাহিদা ছিল। কিন্তু হতাশ করেছে আল-আজাদের আবহ। খুব বেশি আবেগপ্রবণ আবহসংগীতের জন্য মাঝেমাঝেই হোঁচট খেতে হয়েছে এই বলিষ্ঠ প্রযোজনাটিকে।

অভিনয়ে নাগরিক নাট্যগোষ্ঠী খুবই উন্নত। তাদের কোরাসের প্রতিটি অভিনেতাই সংলাপ-উচ্চারণে এবং শারীরিক অভিনয়ে যে পারদর্শিতার পরিচয় রাখলেন তা ঈর্ষণীয়। তবুও বিশেষভাবে নাম করতে হয় আব্বাসের ভূমিকায় অভিনয়কারী আসাদুজ্জমান নুরের। তাঁর অত্যন্ত সংযত এবং বুদ্ধিদীপ্ত অভিনয়ে সামান্যতম বিচ্যুতি ঘটলেই চরিত্রটি ম্লান হয়ে যেতে পারত নূরলদীনের প্রবল ব্যক্তিত্বের সামনে। নূরলদীনের স্ত্রী আম্বিয়ার ভূমিকায় সুরমা রহমানের অভিনয়ও চমৎকার।

এই নাটকের নির্দেশক এবং মূল অভিনেতা আলী যাকের। খুবই ভালো অভিনয় করেছেন তিনি তাতে সন্দেহ নেই। তবুও অভিনেতা আলীর চাইতে নির্দেশক আলীকেই আমরা বেশি করে মনে রাখব। অভিনয়ে তিনি অনেক সাহায্য পেয়েছেন নাট্যকারের গড়া চরিত্রটি থেকে। এই প্রকৃত 'হিরো' চরিত্রটিকে সার্থক রূপ দিয়ে তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু নির্দেশকের ভূমিকায় তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন প্রতিভা ও মুন্সিয়ানার এক আশ্চর্য সমন্বয়। উদ্যোক্তাদের অনুরোধ, এই ধরনের 'স্ব-ভাষা'-র 'বিদেশী' প্রযোজনা দেখার সুযোগ তাঁরা যেন এবার থেকে মাঝে মাঝে আমাদের দেন। □

মধুশ্রী দত্ত

'বিসর্জন'। 'দুই বোন' উপন্যাসের সফল নাট্যরূপ ফিরদৌসী মজুমদারের নির্দেশনা ও অভিনয়ে নতুন মাত্রা পেয়েছে। উপস্থাপিত হয়েছে বহু বিখ্যাত বিদেশী নাটকের রূপান্তর। মঞ্চে হাজির হয়েছেন শেক্সপীয়র, শ, ব্রেখট ও বেকেট। কাব্যনাটকের নতুন দিগন্ত দেখিয়েছেন সৈয়দ শামসুল হক। তার 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়', 'নূরলদীনের সারাজীবন' এবং সাম্প্রতিকতম 'এখানে এখন' আমাদের নাটক নিয়ে নতুন করে ভাবায়। খেটেখাওয়া মানুষের চালচিত্র তুলে ধরেছেন মামুনুররশীদ তাঁর 'ওরা কদম আলী' 'ওরা আছে বলেই' প্রভৃতি নাটকে। সায়িদ আহমেদ বর্তমান সংকট ফোটালেন 'প্রতিদিন একদিন'-এ। এভাবে নানা টানাপোড়েনে তৈরি হয়ে চলেছে বাংলাদেশের একালের নাটক ও থিয়েটার। তারুণ্যে ভরপুর তার পরিবেশ।

এই তারুণ্যই সেখানকার শক্তির উৎস। □

একটি সাক্ষাৎকার : আলী যাকের ও আতাউর রহমান-এর সঙ্গে

বাংলাদেশের অন্যতম অগ্রণী নাট্যসংস্থা 'নাগরিক' কলকাতায় 'নূরলদীনের সারা জীবন' অভিনয় করে গেলেন পর পর তিনদিন, ৯ থেকে ১১ এপ্রিল। আলী যাকের নাগরিক-এর প্রধান নির্দেশক, নাট্যকার এবং অভিনেতা। নূরলদীন-এর নির্দেশনা তাঁরই, নূরলদীন চরিত্রের অভিনেতাও তিনি। আতাউর রহমানও ওঁদের অপর নির্দেশক ও অভিনেতা—তিনি 'নাগরিক'-এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর একজন।

'প্রতিক্ষণ'-এর পক্ষ থেকে একটি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় আলী যাকের ও আতাউর রহমানের। সাক্ষাৎকারটি নেন বিষ্ণু বসু। ওঁর সঙ্গে ছিলেন নিখিল রঞ্জন দাস ও অরুণ সেন। পার্ক হোটেলে, ১২ এপ্রিল, সকালবেলায়।

স· প্র·

প্রতিক্ষণ যতদূর জানি 'নূরলদীনের সারা জীবন' আপনাদের ১৬শ প্রযোজনা। এর আগের প্রযোজনাগুলির আভাস যদি সংক্ষেপে দেন, তাহলে ভালো হয়।

আতাউর রহমান 'বাকি ইতিহাস' দিয়েই আমি শুরু করব কারণ সেটাই ছিল আমাদের দর্শনীর বিনিময়ে নিয়মিত নাটক। ১৯৭৩-এর ফেব্রুয়ারিতে শুরু হয় এবং এটা বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। কারণ বাংলাদেশে এটা বিশ্বাসই করা যেত না যে টিকিট কিনে কেউ নাটক দেখবে। দর্শনীর বিনিময়ে নিয়মিত নাটক। আমরা দাবি করি, এই প্রক্রিয়ার আমরাই পথপ্রদর্শক

প্র তার আগে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' যেটা প্রথম আপনারা ৭২-এ করেন, সেটা নিয়মিত ছিল না

আতা নিয়মিত ছিল না, মাত্র দুটি প্রদর্শন হয়। 'বাকি ইতিহাস', আমি মনে করি যে এটি বাংলাদেশের নাট্যচর্চা বা নাট্য-আন্দোলন যাই বলুন, তার মাইলস্টোন। নাটকে বাঁধভাঙার দিক থেকে।

এর পরে যেটা নাগরিক-এর দিক থেকে সবচেয়ে স্মরণীয় প্রযোজনা মনে হয়েছে, তা হল 'সৎ মানুষের খোঁজে'। ব্রের্টল্ট ব্রেশট-এর 'গুড ওম্যান অব সেটজুয়ান'-এর রূপান্তর। আলি যাকের এটার রূপান্তর এবং নির্দেশনায় ছিল। অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিল। দর্শক খুব নিয়েছিল। একেবারে দেশজ পটভূমিকায় রূপান্তর। এবং এই প্রথম নাটক যা একনাগাড়ে রজত জয়ন্তী পর্যন্ত প্রদর্শন হয়েছিল। বাংলাদেশের পক্ষে এটা একটা বিরাট ঘটনা। এর আগে কোনোটার হয়নি।

এরপরে জনপ্রিয়তার দিক থেকে আরেকটি ব্রেশটের নাটক—'পুন্টিলা অ্যাণ্ড হিস্ ম্যান মাট্টি'—যেটা আমরা করেছি 'দেওয়ান গাজীর কিস্‌সা' নামে। সবচেয়ে জনপ্রিয়। বোধহয় ১৫০টি অভিনয় হয়ে গেছে।

তারপর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান'—বাংলা ক্ল্যাসিক—এটিও আমাদের একটা উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। ৫৩টি প্রদর্শন হয়েছিল। এবং এতে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল, নাটকটিকে সমকালীন করে তোলা। একটি ভূমিকা জুড়ে দিয়ে—সিঙ্গলম্যান কোরাসের মুখে এবং দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকেও। প্রোডাকশনাল পয়েন্ট-এর দিক থেকেও।

প্র নাটক থেকে কিছু বাদ দিয়েছিলেন কি ?

আতা এডিটিং তো হয়েছে—কিছু সংযোজনও হয়েছে।

প্র কী ধরনের সংযোজন হয়েছে ?

আলী এটাকে আমরা অ্যান্টি-ফ্যানাটিক প্লে হিসেবে তৈরি করতে চেয়েছিলাম—অ্যান্টি-ওয়ার, অ্যান্টি-মার্ডার···

আতা প্রাসাদ-রাজনীতি বিরোধী একটি নাটক হিসেবে একে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। এবং সেদিক থেকে এটি আরেকটি মাইলস্টোন। বিশেষ করে যেটা দেখানোর চেষ্টা হয়েছে, ঔরঙ্গজীব যা করেছে তা হয়ত বিশ্বাস করেই করেছে, কিন্তু আমাদের যেটাকে আপত্তিকর দৃষ্টিভঙ্গি মনে হয়েছে তা হলো ঔরঙ্গজীব ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে এনেছে। এতে করে সে নিজের জন্য কিছু অর্জন করে নি, জনগণের জন্যও কিছু অর্জন করে নি।

প্র ঔরঙ্গজীবকে নিয়ে নানারকম প্রশ্নই তোলা হয়েছে—মুনীর চৌধুরীও তুলেছিলেন—সেই ব্যাপারগুলোই তাহলে আপনাদের মাথায় ছিল প্রযোজনার সময়

আতা হ্যাঁ ছিল। এইভাবেই আমরা ইন্টারপ্রেট করতে চেয়েছি, হত্যা দিয়ে অর্থাৎ, অন্যায় দিয়ে অন্যায়কে ধ্বংস করা যায় না।

আলী এখানে এটা অফ দি রেকর্ড প্রথমেই বলে রাখি, কারণ পরবর্তী পর্যায়ে এটা আমাদেরকে আপনাদের বুঝতে সাহায্য করবে। আমরা একটা বিশেষ ধরনের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির আওতার মধ্যে থেকে যা করার করি। ফলে আমাদের যে চিন্তাভাবনা বা নাটকের রূপান্তর, তার সঙ্গে ঐ পরিস্থিতির একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে। আমাদের নাটক সাধারণভাবে মানুষ, সমাজ বা আমাদের বন্ধুবান্ধব ও বুদ্ধিজীবীদের কতখানি প্রভাবিত করবে বা তাদের হৃদয়গ্রাহী হবে, এর চেয়ে বড় বিবেচনা হলো কতখানি তা এসটাবলিশমেন্টের বিরোধিতা করতে পারছে।

আতা 'সাজাহান' নাটকে দারা-র মুখে বেশ কিছু সংলাপ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথম সংলাপেই রয়েছে, 'যুদ্ধকে আমি ভয় করি না জাহানারা, যুদ্ধকে আমি ঘৃণা করি। ধর্মের নামে, দেশের নামে, এ এক নারকীয় যজ্ঞ।'

প্র 'মাইলপোস্ট' কেমন চলেছিল ?

আতা এটা তো যাকে থিয়েটার অব দি অ্যাবসার্ড বলা হয়, তাই। প্রযোজনা ভালোই হয়েছিল, কিন্তু তেমন চলে নি, মাত্র নটি শো হয়েছে।

প্র 'অচলায়তন' কেমন চলেছে ? আমাদের এখানে পি-এল-টি করেছিল, তেমন চলে নি।

আতা 'অচলায়তন' সে তো আবার আরেক বাঁধ ভেঙেছে।

আলী আজকে সকালবেলাই কথা হচ্ছিল 'অচলায়তন' নিয়ে। ওর আর আমার মধ্যে। ও 'কেয়ার বই' পড়ছিল। তাতে মহাপঞ্চকের চরিত্রটির বিশ্লেষণ আছে। যে, মহাপঞ্চক ঠিক মতো পোর্ট্রেড হয় কিনা। রবীন্দ্রনাথ রঘুপতির মতো মহাপঞ্চককে দেখতে চেয়েছিলেন। আমরা কিন্তু মহাপঞ্চককে সেভাবে দেখি নি। আমরা তাকে গোলাম আজম হিসেবে দেখেছি। গোলাম আজম হচ্ছে আমাদের ওখানকার জামাত-ই-ইসলামের নেতা। পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় এজেন্ট ছিলেন তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় এবং লাখ লাখ বাঙালিকে মারার ব্যাপারে সক্রিয় হাত ছিল তাঁর। আমরা মহাপঞ্চককে গোলাম আজম বানিয়েছি—বুঝতে পারছেন ?

প্র সেটা দর্শক বুঝতে পেরেছিল ?

আলী হ্যাঁ, খুব পরিচ্ছন্নভাবে বুঝতে পেরেছিল। কোনো প্রচ্ছন্নতা ছিল না।

আতা একটু কমিক উপাদানও ছিল। আমরা ভেবেছিলাম, স্কুলে দেখা যায় না, হেড মৌলবি বলে একজন থাকেন, সব সময় ধর্মীয় বিধান দিয়ে থাকেন, তার সঙ্গেও একটু মেলাবার চেষ্টা করেছি। মোট কথা, 'অচলায়তন' আমাদের খুবই সফল প্রযোজনা এবং মনের দিক থেকেও আমরা এতে খুব অনুপ্রাণিত বোধ করি।

প্র 'মোহনগরী' কেমন চলেছে ?

আলী 'মোহনগরী' হলো 'রাইস

অ্যাণ্ড ফল অব দি সিটি অব মেহগনি'। 'মোহনগরী'-তে ঠিক অ্যাসিড টেস্ট হয় নি। ছ-টা শো হবার পর বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলাম। কারণ এটাকে তো অপেরাধর্মী, মিউজিক্যাল, বলতে পারেন। সেখানে কোরিওগ্রাফির এত বেশি প্রয়োজন। ৬-৭টি মেয়ে, অনেকগুলি ছেলে, সবাইকে নিয়ে একসাথে ছন্দোবদ্ধভাবে স্টেজ চালানো। হঠাৎ করে দুটি মেয়ে—যাঁরা ঠিক আমাদের স্থায়ী সদস্য নন, গ্রুপে এসে যোগ দিয়েছিলেন—তাঁদের একজন বিদেশে চলে গেলেন, একজন অসুস্থ হয়ে পড়লেন, ইত্যাদি করে ঝামেলা দেখা গেল। সে কারণেই 'মোহনগরী' উঠে গেল। তাই ঠিক অ্যাসিড টেস্ট হয় নি। তবে যে ৬টি শো চলেছে, তাতে জনসমাগম ভালোই হয়েছিল। গানের সুরগুলো খুব ভালো হয়েছিল।

আতা চমৎকার হয়েছিল। তবে একটু ট্রেনিংয়ের ব্যাপারও ছিল। রুচি অর্জন করার ব্যাপার আছে না?

আলী তবে একটা জিনিস বোধহয় আমার এই প্রসঙ্গে বলা উচিত। কথাটা আমি এই পুরো ভারতের ট্রিপে কখনো বলতে পারি নি।—যে কথাটা আমরা ঢাকায় প্রায়ই বলে থাকি। সেটা হচ্ছে, সাধারণভাবে আমাদের নাটকের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিটা কী? আমরা বিশ্বাস করি, নাটক সমাজের দর্পণ। সমাজে যা ঘটছে তা প্রতিবিম্বিত হবে এবং তা থেকে বার্তা নিয়ে সমাজসংস্কারের কাজ করবে। আমরা সরাসরি কোনো কাজ করতে যাব না। নাটককে সমাজের দর্পণ করতে হলে মঞ্চে, আমাকে নিজেকে তৈরি করতে হবে। নাট্যকর্মী হিসেবে। ধরুন, আমি যদি অ্যামেচারিশ থেকে যাই, আমি যা করছি মঞ্চে তা যদি বিশ্বাসযোগ্য না হয়, দর্শক বিমুখ হবেন, আমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন। সে ক্ষেত্রে আমি যত বড় বড় কথাই মঞ্চ থেকে বলি না কেন, তার কোনো এফেক্ট হবে না।

সেই উদ্দেশ্য মাথায় রেখেই আমরা নিজেদের তৈরি করার প্রয়াস চালাই এখনও। বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা—অ্যাবসার্ড, অপেরা, মিউজিক্যাল, গ্রোটওস্কি, কাব্যনাটক, এপিক—এ সব দিয়েই নিজেদেরকে এখনও আমরা তৈরি করছি। আজকে যে 'নাগরিক' কলকাতায় এল, এখনও পর্যন্ত, আমার ব্যক্তিগত মত, এটাকে পূর্ণাঙ্গ সম্পূর্ণ একটি গোষ্ঠী বলা ঠিক হবে না। এখনও আমরা নিজেদের তৈরি করছি আমার মনে হয়, আজ থেকে বছর দশেক পরে আমরা যেটা করতে চাই, সেটা হয়ত করতে পারব

মঞ্চকে যদি আমরা সেইভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, তবেই এখান থেকে যে আহ্বানই উৎসারিত হোক না কেন, ভবিষ্যতে কোনো এক সময়ে সেটা সমাজে একটা ঢেউ তুলবে।

প্র 'নূরলদীনের সারা জীবন' নাটক যে আপনারা করছেন—সেটা কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে

আতা আলী যাকের-ই বল, আমি পরে যোগ করব।

আলী একটা কথা সহজভাবে বলি, আমাদের সবারই ধারণা, আমরা, বাংলাদেশের অধিবাসীরা, একটা প্রচণ্ড আইডেনটিটি ক্রাইসিসে ভুগছি। আমরা বাঙালি, না মুসলমান, না বাংলাদেশী, না হিন্দু, না খ্রিস্টান, না ধর্মনিরপেক্ষ ইত্যাদি—আত্মপরিচয়ের এই সংকট আছে। কিন্তু এই সংকট থাকত না, যদি আমরা আমাদের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের প্রতি সৎ থাকতাম। যদি আমরা অজ্ঞ না হতাম। হ্যাঁ, আমাদের যে ঐতিহ্য আছে, সে ঐতিহ্যই আমাদের দিকনির্দেশ দিয়ে দিত যে, কী আমাদের করা উচিত। সেই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য নিয়েই আমাদের নূরলদীনকে বাছা। আমরা আমাদের বীরদের জানব, জানব আমাদের অতীতকে, যে অতীত ১৯৪৭-এ কিংবা ১৯৭৫-এ শেষ নয়, আরও পেছনে, হাজার বছরের ঐতিহ্য আছে। নাটকে এটা পরিষ্কার এবং স্পষ্ট হয়ে আসে, যখন বলা হয়, 'এক নূরলদীন যদি চলি যায়, হাজার নূরলদীন তবে আসিবে বাংলায়।' এই যে ধারাবাহিকতা ইতিহাসের, বাঙালির এই যে সংগ্রাম, বাংলাদেশের বাঙালির সংগ্রাম, তাকে মঞ্চে তুলে ধরার প্রয়োজন আছে আমাদের। সেটাই মৌলিক উদ্দেশ্য।

আতা সংগ্রামটা এখনও চলছে। যদিও এটা ঐতিহাসিক নাটক—কিন্তু আমাদের কাছে টপিক্যাল।

আলী আমাদের স্বাধীনতার পরে, যদি লক্ষ করেন তবে দেখবেন, আমরা কতকগুলি বিষয়ে, বেশ কিছু মৌলিক বিষয়ে, আমাদের জাতিসত্তার দিক থেকে বারবার গোড়ার পাঠে চলে যাচ্ছি। বারবার ওখান থেকেই শুরু করতে হয়। মানে, ৪৭ সাল থেকে 'রবীন্দ্রনাথ' 'রবীন্দ্রনাথ' 'আমাদের হাতিয়ার রবীন্দ্রনাথ'—সেই রবীন্দ্রনাথকে আমরা ৭১-এ এসে প্রতিষ্ঠিত করলাম। এখন আবার রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই শুরু করতে হচ্ছে। আবার সেই গোড়ার পাঠ।

আতা আরেকটা ব্যাপার আছে। নূরলদীন কিন্তু আমাদের কাছে বিরাট—স্বাধীনতার প্রতীক এই স্বাধীনতা শুধুমাত্র ভৌগোলিক সীমার ব্যাপার নয়। আমরা স্বাধীন বটে, কিন্তু নূরলদীনের মধ্য দিয়ে যেটা আমার মনে হয়েছে, তা হলো, নূরলদীন মহত্তর জীবনের স্বপ্ন দেখেন, মানুষ হিসেবে বাঁচার স্বপ্ন দেখেন—সেই প্রতীকটাই নূরলদীনের মধ্যে। প্রতিরোধের, প্রতিবাদের, জীবনের উত্তরণের প্রতীক।

আলী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বা জোতদার-জমিদার হত্যা ইত্যাদি বড় ব্যাপার নয়। বড় হচ্ছে স্পিরিটটা—বার্তা—যেটা যাচ্ছে এখান থেকে। একবার যদি একজন বাঙালি দর্শক ঢাকা শহরে চেয়ারে নড়েচড়ে বসে বলে, এই নাকি—তাহলেই তো আমাদের অনেকখানি সার্থকতা এসে গেল।

আতা নূরলদীন কনটেন্ট ছাড়াও ভাষার দিক থেকে একটি অসাধারণ নিরীক্ষা। আমরা মনে করি। সুগ্রথিত সুলিখিত একটি নাটক।

প্র বুঝতেই পারছি যে আপনারা কমিটমেন্টে বিশ্বাসী। তা কমিটমেন্ট বলতে আপনারা কী বোঝেন?

আতা কমিটমেন্ট নিজের প্রতি, সবচেয়ে বড়। সবচেয়ে বড়, নাটক করতে ভালো লাগে। কথা হলো যে, জীবনে কতকগুলো বাছাইয়ের ব্যাপার থাকে। যেমন কেউ পয়সা রোজগার করে খুশি হয়, কেউ দেশভ্রমণ করে আনন্দ পায়, কেউ জীবিকার দিক থেকে ওপরে ওঠার আনন্দ পায়। এক একটা বাছাই তো তা আমাকেও বাছাই করতে হবে, কী করলে আমি ভালো থাকব। আমাদের মনে হয়েছে, নাটক করলেই সম্ভবত আমরা ভালো থাকব।

প্র নিজের প্রতি যেমন, সামাজিক কমিটমেন্ট বলেও তো⋯

আতা নিজের থেকেই কিন্তু অন্যের প্রতি। আত্মশুদ্ধির চেষ্টা দিয়েই শুরু বলতে পারেন—নাটক দিয়ে। আস্তে আস্তে এটা ছড়াবে, আরেকজনকে সংক্রামিত করবে। সামাজিক-রাজনৈতিক কমিটমেন্টও অবশ্যই আছে আমাদের। যেমন একটা কথা ও বলেছিল সেদিন, বাংলাদেশের সব থিয়েটারকর্মী ও নাট্যদলগুলিই একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে। সেটা তো কমিটমেন্টই। সে কমিটমেন্ট নিশ্চয়ই আছে।

আলী বাংলাদেশে নিয়মিত যাঁরা নাটক করেন, সেই প্রত্যেকটি নাট্যকর্মী মনেপ্রাণে স্বাধীনচেতা এবং একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে। এটা একটা বিরাট গর্বের ব্যাপার যে, আজ যাঁরা বাংলাদেশের গ্রুপ থিয়েটারে কাজ করছেন, তাঁদের শতকরা ৯৫ জন মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত ছিলেন। আমাদের রাজনীতিতে বা সাহিত্য সংস্কৃতির অন্য ক্ষেত্রে চরম প্রতিক্রিয়াশীল বা দক্ষিণপন্থী মনোভাবাপন্ন লোকেরা আছে, কিন্তু থিয়েটারে একজনও নেই।

আতা রাজনীতির ধ্যানধারণা হয়ত বিভিন্ন নাটকের দলের বা বিভিন্ন নাট্যকর্মীর ভিন্ন ভিন্ন—কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যাপক ক্ষেত্রে একটা ঐক্য আছে।

আলী সেটা হচ্ছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা বা প্রগতির পক্ষে, ধর্মীয় উন্মাদনার বিরুদ্ধে।

প্র এই সূত্রেই জানতে চাই, এই কমিটমেন্টের জন্য আপনারা কি মনে করেন শিল্পদৃষ্টি কোনোভাবে কোথাও ব্যাহত হচ্ছে?

আতা না হচ্ছে না। কারণ, নাটক তো প্রধানত শিল্পমাধ্যম। ব্রেশটের কথাই যদি বলেন, তাঁর নাটকের মধ্যে হয়ত মার্কসীয় ও লেনিনীয় দ্বান্দ্বিকতা প্রবেশ করেছে—কিন্তু ধরে নিতে হবে, ব্রেশট প্রধানত এবং প্রথমত শিল্পী। রাজনৈতিক প্রচারক নন। আমরাও প্রথমে মনে রাখি, আমরা নাটকই করব।

আলী শিল্প কোনোদিনই পোস্টার হবে না।

আতা সে সম্পর্কে আমরা অত্যন্ত সজাগ। এটা যেন পোস্টার না হয়ে যায়। সুতরাং শিল্পকর্ম এতে ব্যাহত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

ফটো □ অসীম পাল

শেক্সপীঅর-রচিত

অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা

অনুবাদ : সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়
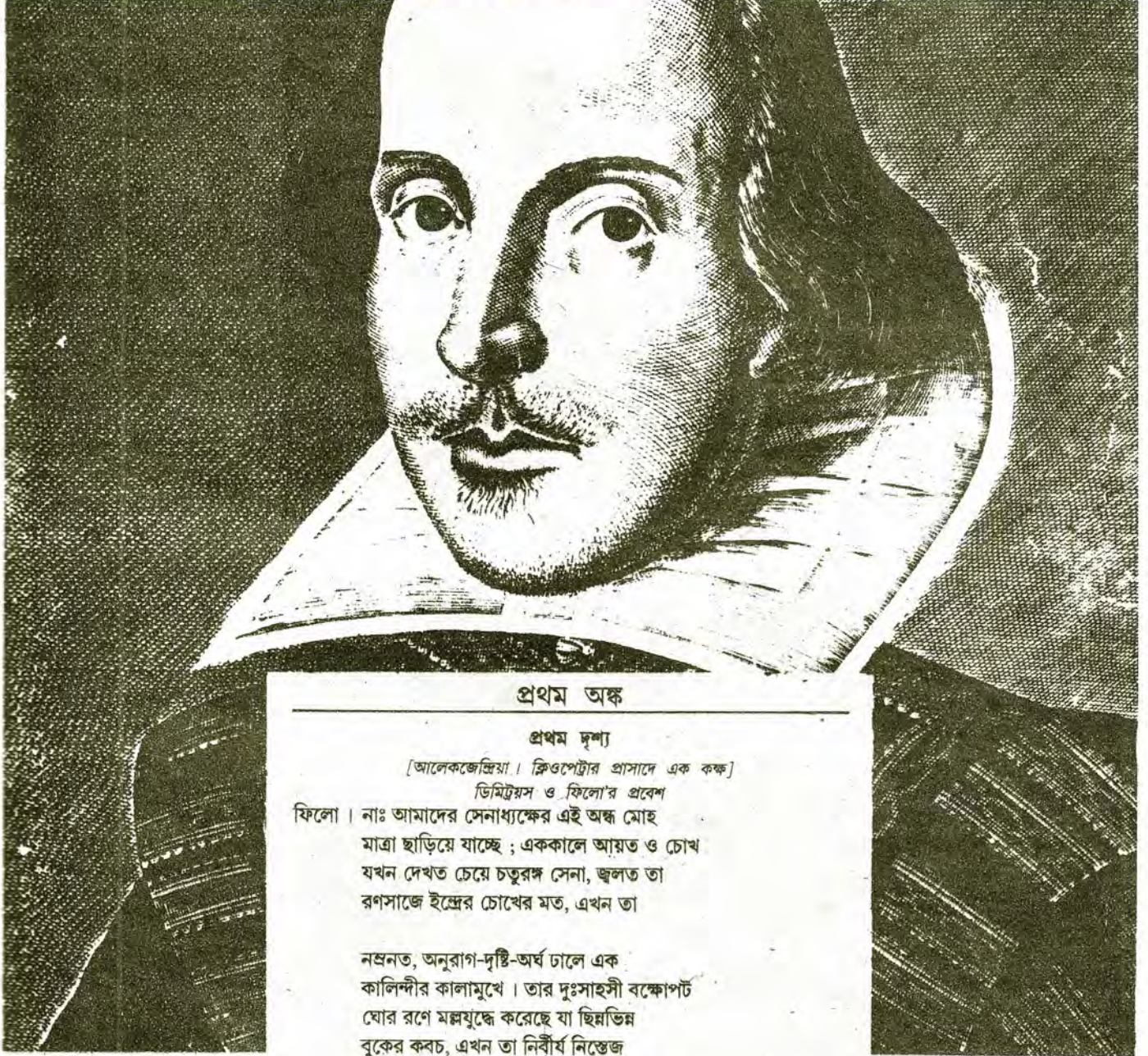
প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[আলেকজেন্ড্রিয়া । ক্লিওপেট্রার প্রাসাদে এক কক্ষ]

ডিমিট্রিয়স ও ফিলো'র প্রবেশ

ফিলো । নাঃ আমাদের সেনাধ্যক্ষের এই অন্ধ মোহ
মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে ; এককালে আয়ত ও চোখ
যখন দেখত চেয়ে চতুরঙ্গ সেনা, জ্বলত তা
রণসাজে ইন্দ্রের চোখের মত, এখন তা

নম্রনত, অনুরাগ-দৃষ্টি-অর্ঘ ঢালে এক
কালিন্দীর কালামুখে । তার দুঃসাহসী বক্ষোপট
ঘোর রণে মল্লযুদ্ধে করেছে যা ছিন্নভিন্ন
বুকের কবচ, এখন তা নির্বীর্য নিস্তেজ
পরিণত ব্যজনীতে ঠাণ্ডা করতে এক
বেদিনীর কামাগ্নিজ্বালা ।

[তূর্যধ্বনি । অ্যান্টনি, ক্লিওপেট্রার প্রবেশ, সঙ্গে পরিচারিকারা, দলবল ; খোজা অনুচরেরা রানীকে ব্যজনরত]

দেখ, ওই আসছে ওরা,
ভালো করে লক্ষ্য কর, দেখতে পাবে ওতে
দুনিয়ার তৃতীয় স্তম্ভটি পুরোপুরি রূপান্তরিত
গণিকার বেহায়া নাগর : দেখ, চেয়ে দেখ ।

ক্লিও। এই সত্যি ভালোবাসা হলে, কতখানি বল।
অ্যান্ট। ভালোবাসা মাপা গেলে নগণ্য তা নিতান্ত তুচ্ছ।
ক্লিও। কত ভালোবাসবে তার গণ্ডি বেঁধে দেব।
অ্যান্ট। তবে তোমাকে খুঁজতে হবে নতুন স্বর্গ ও মর্ত।

[পরিচারকের প্রবেশ]

পরি। হুজুর, এত্তেলা রোম থেকে।
অ্যান্ট। আঃ জ্বালাতন! কি বলে, এক কথায়।
ক্লিও। না, না, অ্যান্টনি, শোন ওরা কী বলছে
ফুলভিয়া হয়ত চটেছে; কিংবা তোমার কাছে,
কে জানে, বিরল শ্মশ্রু সীজার পাঠায়নিতো
বাদশাহী ফরমান তার "এটা করবে, ওটা করা চাই,
ঐ রাজ্য দখলে আনবে, সেই রাজ্য মুক্ত করে দেবে,
সব করবে, নইলে যাও জাহান্নমে।"
অ্যান্ট। কী বলছ, প্রেয়সী?
ক্লিও। হয়ত। হয়ত কেন, নিশ্চয় তাই
তোমার এখানে থাকা আর নয়, সীজার থেকে
তোমার বরখাস্ত এসে গেছে, অ্যান্টনি, অতএব,
কী বলছে, শোন।
ফুলভিয়ার পরোয়ানা কই? নাকি, সীজারের!—দুজনেরই?
দূতদের ডাকো। সত্যি যেমন আমি মিশরের রানী
তেমনি সত্যি অ্যান্টনি, তুমি লজ্জায় লাল হচ্ছ, আর ওই লাল রক্ত
সীজার বন্দনা, নাকি, কাংসকণ্ঠী ফুলভিয়ার গঞ্জনায়
তোমার গণ্ড অমনি লজ্জা ভেট দেয়। কই দূতরা কোথায়?
অ্যান্ট। টাইবারে গলে যাক রোম, সুবিন্যস্ত সাম্রাজ্যের
বিস্তীর্ণ তোরণ এই হোক ভূলুণ্ঠিত। এখানে আমার স্থান,
রাজ্য তো কাদার পিণ্ড; পঙ্কক্লিন্ন এ ধরণী পুষ্ট করে
পশুকেও একইভাবে মানুষেরই মতো; জীবনের মহত্ত্ব যা
তা তো এই যখন দুজনে এইমত [আলিঙ্গন]
এমনই যুগলে বাঁধা, এ বাঁধনে স্বেচ্ছাবন্দী আমি—
এই সত্য মিথ্যা হলে, সাক্ষী এ জগৎ,
আমি তবে হব দণ্ডনীয়।
ক্লিও। চমৎকার মিথ্যা প্রলাপ।
ফুলভিয়াকে ভালো না বাসলে বিয়ে করল কেন!
যত বোকা ভাবে আমি তত বোকা নই; অ্যান্টনি যা
তাই তো সে হবে।
অ্যান্ট। ক্লিওপেট্রা যদি কাছে টানে।
এখন এ মিলন প্রহরে ভালোবাসাবাসি শুধু,
নীরস বিতর্ক করে এ সময় নষ্ট ক'রো না
এক্ষণের সুখভোগ বিনা আমাদের জীবন যে
পরক্ষণে যেতেই পারে না। আজ রাতে কি রঙ্গ কৌতুক?
ক্লিও। দূতদের কথা শোন।
অ্যান্ট। ছিঃ কলহরঙ্গিণী রানী!
হাসি, কান্না, তিরস্কার—যাই কর
তোমাকে মানায় সবই; তোমার ভেতরে যেন
প্রতিটি আবেগ সার্থক সুন্দর হতে সতত প্রয়াসী।
কেবল তোমার দূত, আর কারও নয়, দুজনে একাকী
আজ রাতে পথে পথে বেড়িয়ে বেড়াব, আর
দেখব লোকে কে কী করছে। এসো প্রাণেশ্বরী
কাল রাতে এই তো চেয়েছিলে কোনো কথা নয়।

[সদলবলে অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রার প্রস্থান]

ডিমি। সীজারকে অ্যান্টনি কি এমনি তাচ্ছিল্য করে?
ফিলো। সময়ে সময়ে যখন সে অ্যান্টনি থাকে না,
যে মহাচরিত্রগুণে অ্যান্টনি গুণান্বিত
ওতে তার সামান্যই আছে।
ডিমি। বাস্তবিক দুঃখ হয়—
ওর নামে বাজে লোক রোমে যা রটায়,
ও যখন তাদের দেখি সমর্থন করে; আশা করি
কাল পাব সুখবর। আসি, সুখে থাকো। *[প্রস্থান]*

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পূর্ববৎ। অপর কক্ষ]

এনোবার্বস, লামপ্রিয়স, গণৎকার, রানিঅস, লুসিলিঅস, চারমিয়ন, ইরাস, খোজা মার্দিয়ান, এবং আলেক্সাস-এর প্রবেশ

চার। প্রভু আলেক্সাস, প্রাণেশ্বর আলেক্সাস, যা-বল-না-বল-তম আলেক্সাস,
চরম পরমতম ওগো আলেক্সাস, সেই গণকঠাকুরটি কই গো,
রানীমার কাছে যার অত গুণগান করছিলে? শিংএ মালা
দুলিয়ে যে ভেড়ুয়া ছাদনাতলায় বলি হতে যায়, যার কথা
বলছিলে গো, আহা যদি সেই স্বামীটার পাত্তা পেতাম।
আলে। ও গণকঠাকুর!
গণৎ। তোমার মনস্কামনা?
চার। এই বুঝি তিনি? আপনিই তো সবজান্তা?
গণৎ গোপন রহস্যে ভরা প্রকৃতির আদি অন্তহীন
গ্রন্থটার কিছু পাঠ করতে পারি
আলেক্স। হাতটা দেখাও ওঁকে।
এনো। খানা কই, চটপট; লে আও দেদার সরাব
পান হবে ক্লিওপেট্রার স্বাস্থ্য কামনায়।
চার। ঠাকুর, আমার বরাতটা ভালো করে দিন।
গণৎ। করতে পারি না,তবে যা হবে তা দেখতে পাই
চার। তবে ভালোমতো একটা দেখেই দিন।
গণৎ। তুমি যা তার চেয়ে বহুগুণ সুন্দর হবে।
চার। বলতে চায়, গায়ে গতরে।
ইরাস। মোটেই না, বুড়ি হলে রং মাখবি তাই বলছে।
চার। তোবড়ানো গাল—রক্ষে কর।
আলেক্স। ঠাকুরের ধ্যানভঙ্গ ক'রো না, মন দিয়ে শোন।
চার। এই চুপ!
গণৎ। যত ভালোবাসা পাবে তারচে' বেশি দেবে তুমি।
চার। তাহলে তো রক্তটা মদের তাপে গরম রাখতে হবে।
আলেক্স। আঃ, কী বলছেন, শোন।
চার। বেশ, এবারে মাইরি, সত্যি সত্যি কিছু সৌভাগ্য
পাইয়ে দিন। এক সকালে তিন তিনটে রাজার সঙ্গে
আমার বে' হোক, তিনটেই অক্কা পাক; যখন
পঞ্চাশে পড়ব, আমার একটা ছেলে হোক, তার এমন দাপট
হবে যে রক্ষোরাজ দশানন দশমাথায় তাকে সেলাম
ঠুকবে। যেমন করে হোক অক্টেভিয়স সীজারের সঙ্গে আমার
গাঁটছড়া বেঁধে দিন, তারপর আমার ভট্টিনীকে আমার সখী
করে দিন।
গণৎ। যে নারীর সেবিকা তুমি তার চেয়ে তুমি দীর্ঘজীবী।
চার। চমৎকার, ডুমুরফুলের মত ফুটতে না ফুটতে ঝরে না গিয়ে অনেক
বছর বাঁচতে আমার খুব ভালো লাগে।
গণৎ। আসন্ন ভাগ্য থেকে প্রসন্নতর ভাগ্য
জেনেছ ও আগেই পেয়েছ।
চার। তার মানে আমার ছেলেমেয়েদের নামকরণ হবে না, কারণ
তাদের বাপের ঠিক নেই; বলুন না আমার কটা ছেলেমেয়ে?
গণৎ। তোমার প্রতিটি ইচ্ছা গর্ভান্বিত হলে
আর ইচ্ছাও উর্বর হলে, দশ লক্ষ ঠিক।
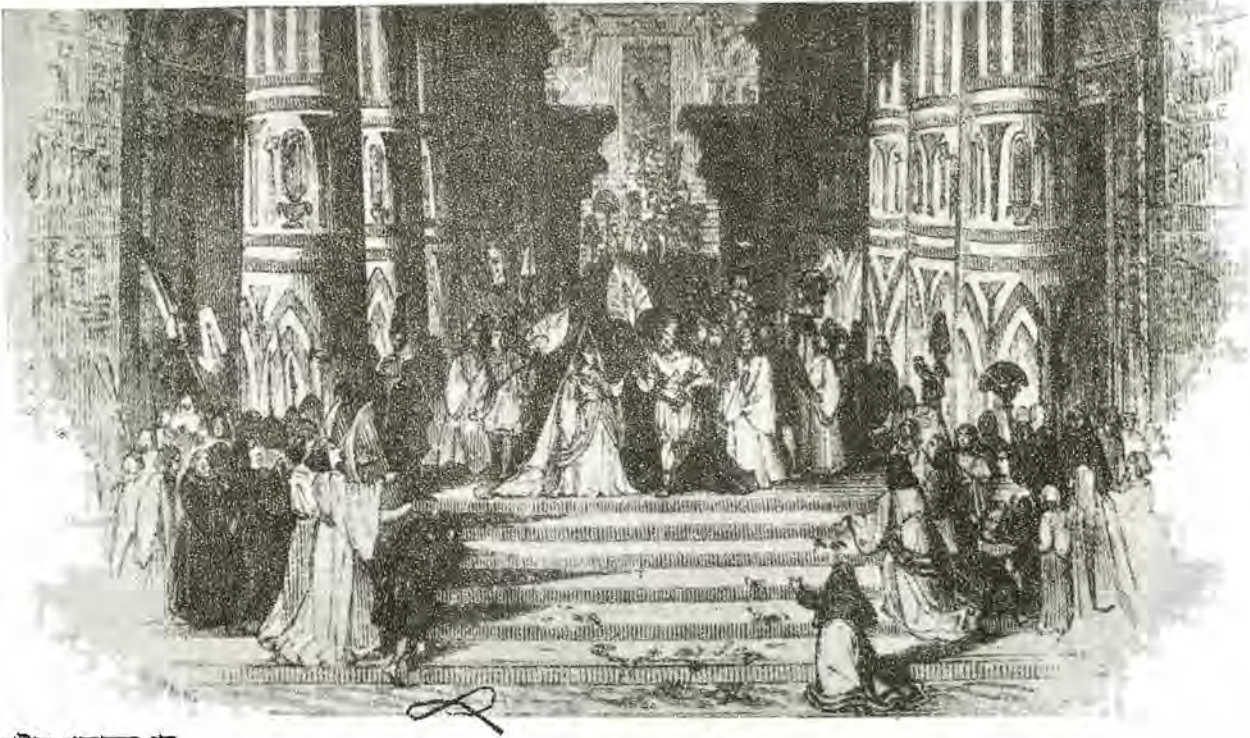
ক্লিওপেট্রার প্রাসাদের গৃহ

চার। দূর, বুজরুক ! ডান বলে আমার কাছে পার পেয়ে গেলে।

আলেক্স। তুমি মনে কর, তোমার বিছানার চাদরটা ছাড়া আর কেউ তোমার মনের কথা জানতে পারে না।

চার। খুব হয়েছে, এবারে ইরাসের হাতটা দেখুন তো।

আলেক্স। আমাদের ভাগ্যে যার যা ভালো, সব আমরা জেনে নেব।

এনো। আজ রাতে আমাদের অনেকের, আমারও ভাগ্যে দেখছি—টলতে টলতে বিছানায় পড়েই বেহুঁশ।

ইরাস। এই হাতখানায় আর কিছু না থাক, সতীত্ব যে আছে বেশ বোঝা যায়।

চার। ঠিক যেমন নাইল-এর বান দেখে বোঝা যায় দুর্ভিক্ষ হবে!

ইরাস। দূর হ' কুটনী, তুই হাত দেখার জানিস কী ?

চার। তবে দ্যাখ—তেলা হাত যদি ভরা কোল না বোঝায়—তবে—তবে— কিছুতেই আমি কান চুলকোতে পারব না। হ্যাঁ, গা, ওর শাদামাটা কপালটার কথা ওকে খুলেই বল না।

গণৎ। তোমাদের দুজনেরই একই ভাগ্য।

ইরাস। কিন্তু কেমন করে, কিসে ? ভালো করে খুলে বলুন।

গণৎ। যা বলার বলেছি আমি।

ইরাস। ওর ভাগ্যি থেকে আমার ভাগ্যিটা আঙুলটাকও বাড়ন্ত নয় ?

চার। আমার থেকে তোর ভাগ্যি যদি আঙুলটাক বাড়ন্তই হয়, সেটা তবে কোথায় হলে খুশি হোস ?

ইরাস। আমার স্বামীর নাকে নিশ্চয় নয়।

চার। ছিঃ ছিঃ ঠাকুর আমাদের এই নোংরা ভাবনাগুলো সাফ করে দাও। এই আলেক্সাস, এদিকে আয়—দেখুন এর হাতটা—এর হাতে কী আছে দেখুন না! ও যেন একটা বাঁজা বৌ বে' করে, মা আইসিস, তোমার পায়ে পড়ি, বৌটা মরুক, তারপরে পর পর ওর ঘাড়ে বজ্জাৎ, হাড়বজ্জাৎ বৌ চাপিয়ে দাও, শেষ অবধি যে বৌটা ঘোরতর মহাবজ্জাৎ সে হাসতে হাসতে ওকে গোরে নিয়ে যাবে, তার আগে পঞ্চাশটা পরপুরুষের সঙ্গে মজা লুটে যেন পঞ্চাশ দফা ওকে বেকুফ বানায়। দোহাই মা আইসিস। আমার এই মান্যটুকু রেখো, আমার নিজের ভারিক্কি আরজিটা যদি নাও রাখো, তোমার পায়ে পড়ি, এটা অন্তত রেখো।

ইরাস। আমরাও তাই বলছি—মাগো জনগণের এই মান্যটা রেখো মা। আহা, কোনো সুপুরুষের নষ্টা বৌ দেখলে যেমন বুক ফেটে যায়, তেমনই কোনো ধড়িবাজ বদমাসের সতীলক্ষ্মী বৌ দেখলে দুঃখু রাখার জায়গা থাকে না ; তাই মা, কুকুরে মুগুরে মিল রেখে ওর বরাতে যেমনটি জোটা দরকার, জুটিয়ে দিও।

চার। জুটিয়ে দিও মা।

আলেক্স। শোন একবার, আমাকে নষ্টা বৌ-এর ভেড়ুয়া বর বানাবার মুরোদ ওদের যদি থাকত, ওরা নিজেদের বেশ্যা বানিয়েও তা করত।

এনো। এই চুপ। অ্যান্টনি আসছেন।

[ক্লিওপেট্রার প্রবেশ]

চার। তিনি নন, মহারানী।

ক্লিও। দেখেছ কি আমার প্রভুকে ?

এনো। না দেবী।

ক্লিও ছিলেন না এখানে ?

চার। না তো।

ক্লিও। খোশমেজাজেই ছিলেন ; কিন্তু হঠাৎ রোমের কোন ভাবনা তাঁকে আনমনা করে দিল। এনোবার্বস!

এনো। দেবী।

ক্লিও। খুঁজে আনো এখানে তাঁকে। আলেক্সাস কোথা ?

আলেক্স। রয়েছি আপনারই তাঁবে। ঐ প্রভু আসছেন।

ক্লিও। আমরা তাঁকে দেখবই না চল, চলে যাই। *[প্রস্থান]*

ধারাবাহিক

আর্ট কালেকশনের অষ্টপ্রহর

সুভো ঠাকুর

ছয়

অবশ্য এখানে কিন্তু আলাদা ব্যাপার। আদতে অরুণ রায়ের অভিপ্রায়ই তো তাই ছিলো। মোগল আমলের কেতা-কায়দায় দুরস্ত ওকে দেখে সবাই যেন তটস্থ হোয়ে সাত হাত তফাতে রাখে—কেয়াবাত, কেয়াবাত কোরে তারিফের সঙ্গে কুর্ণিশ কোরতে কোরতে মুখে রা'টি না কেড়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়। আর তাই তো শীতে সবাই যখন হি-হি কোরছে, ও কিন্তু তখন নবাবজাদার কায়দা-কানুন কব্জা কোরতে সদাই ব্যতিব্যস্ত।

নিউমোনিয়া হবে ? তাতে আর হোয়েছে কি ? ঠাণ্ডা লেগে যায় যদি, ডাক্তার-বদ্যি আসবে-যাবে, সে তো একটা উত্তেজনার ঘটনা—তবে ও কিন্তু হেকিমের হুকুমে চোলতেই পছন্দ করে বেশি। ওতে যে মোগল জমানার মেজাজ আছে মিশে।

অরুণ রায়কে অনেক কিছু বোঝানো যে অসাধ্য সাধনার ব্যাপার তা নোইলে হেকিম-সাহেবের উদ্ধৃতি দিয়েই বোলতে হয় যে, তখনকার জমানায় সে সব এখনকার জাপানি ঝুটা মুক্তো নয়—খাঁটি আরবসাগরের বসরাই মোতিচুর ভস্ম মধু দিয়ে মেড়ে খরোল থেকে খরখরে জিহ্বা দ্বারা লেহনপূর্বক পরিপাক কোরতে অবশ্যই পোটু ছিলেন যে তাঁরা।

এরপর তাঁদের তখনকার সেই শারীরিক উত্তাপে গায়ে গেঞ্জি রাখা অবশ্যই ছিলো অসম্ভব। তাই তো অধিকাংশ মোগল মিনিয়েচারে গেঞ্জিবিহীন অঙ্গরাখা বা পাঞ্জাবির দেহ-দেখানো বে-আবরু আদব সর্বত্রই নজর কাড়ে।

মধু দিয়ে মেড়ে মোতিচুর ভস্ম ভক্ষণের পর গেঞ্জি পোরলে গায়ে ফোসকা পড়বে না তো কি ? তাঁদের তখনকার দেহের উত্তাপে উত্তর মেরুর আইসবার্গকেও হামবার্গারের মতো বাগ মানানো মোটেই মুশকিল ছিলো না।

সারা সরকারি স্কুলে অরুণ রায়ের এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে এতো হৈ-হৈ রৈ-রৈ, কিন্তু সুভো ঠাকুর এইবারে এ-ব্যাপারে নির্বিকার শুধু নয়, নির্বাকও বটে। এ-সবের কোনো কিছুতেই ও যেন আর কোনো ইনটারেস্ট পায় না। তাই তো এ-সব ব্যাপারে মোটেও মাথা ঘামায় না ও। উপরোক্ত ওর একটা ধারণা : অরুণ রায় ওর কেলাসের ওর ভাষায় ওইসব 'রিফর্যাফ'দের সঙ্গে সঙ্গ দিতে বা সখ্যতায় নিতান্তই নারাজ। আর তাই তো ওর ওপর ওদের অতো আক্রোশ।

এরপর উপেন ঘোষদস্তিদার ?—গাবার দস্তিদার পরিবারের কৌলিন্যের কুলগৌরবে বহু গবা জমিদার পরিবারের সঙ্গে ওঁর আত্মীয়তা বা কুটুম্বিতা। এছাড়া, প্রকাশক মহলেও ওঁর ছবির চাহিদা তুঙ্গভদ্রার মতোই তুঙ্গে। তাই অসূয়া হেতু ওই রকম হীন সব ইশারা ইঙ্গিতে ওঁকে বেসামাল কোরে পেড়ে ফেলার ফন্দি-ফিকির।

আশ্চর্যের কথা, এবারে সুভো ঠাকুর অঘোষিত হোলেও মোনে হয় যেন ঘোষণা করে : সখ্যতা যদি ওঁদের কারুর সঙ্গে কারুর হোয়েই থাকে, তাতে অন্যদের হোয়েছেটা কি ? পরের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাকগলানো যেন এদেশের একটা বৈশিষ্ট্য। বিলেতে স্বনামধোন্য শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি ইত্যাদির এমনতরো ঘটনা আকচারই ঘোটে থাকে যখন। ওই যে অস্কার ওয়াইল্ডের সঙ্গে ওদেশের রাজ পরিবারের কারুর ওইরকম একটা ঘনিষ্ঠতার ঘটনা হোয়েছিলো বোলে যে অহরহ কর্ণগোচর হয়। এমন কি এযুগের বিখ্যাত কবি টি-এস-ইলিয়টেরও এ রকম বন্ধু-বাৎসল্যের নানা ব্যাখ্যান কর্ণকুহরে কতো না আসা-যাওয়ার চরণচিহ্ন রেখে গেছে। তাই তো সুভো ঠাকুর আর্ট স্কুলের এমনিতরো ঘটনায় গোড়ার দিকে যেমন নিজের অনীহা ইঙ্গিতে ব্যক্ত কোরেছিলো, পরে বিলেতের, বিশেষ কোরে কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকদের ওইরূপ পরিপ্রেক্ষিতে অমনিতরো অনেক নিদর্শন কর্ণ মারফত নজরে আসায়, ও যেন নিতান্তই নিরুদ্ধাচারণে নিস্তেজ হোয়ে গেছিলো কি তবে ?

তখনকার দিনের আর্ট স্কুলে ছাত্ররা ওই স্কুলের ছাড়াও স্বনামধোন্য বিখ্যাত শিল্পীদের কাজ ছাত্রদের কাজের পাশাপাশিই প্রদর্শিত হোতো। অবশ্য অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুস্থানীয় শিল্পীরা তাঁদের কাজ যে প্রতিযোগিতার জন্যে নয়, তা ইংরেজিতে 'নট ফর কম্পিটিশন'—এই শ্লোগানের হালুম মারফত মালুম কোরিয়ে দিতেন।

সেবার, যেবার অরুণ রায়ের 'উর্বশী' প্রদর্শিত

আর ও বলে : অবনীন্দ্রনাথের শৈলী, অথবা ভাবাদর্শের কোনো কিছুই ওকে ইনস্পায়ার করে না এবং সে সম্বন্ধে আদতে কিন্তু ও নেহাতই নিস্পৃহ। এমন কি, ব্যক্তিগতভাবেও খুল্লতাত হোলেও সেরূপ স্নেহের ঘনায়মান সম্পর্ক কদাচ ছিলো বোলেও ওর মোনে পড়ে না। এ কথা প্রকাশ্যে বলারও কোনো সংকোচ নেই।

দুপাশে কাঁচের দোয়াত, মাঝে ধাতুর নাবিক

হোয়েছিলো, যেবার পূর্ণ চক্রবর্তীর 'বুদ্ধের গৃহত্যাগ' প্রদর্শনীতে দেখা গেছিল, সেইবারই তো সেই একই দেয়ালে দেবীপ্রসাদের ছবিও প্রদর্শিত হয়—তাঁর বিখ্যাত 'পক্ষি-মিথুন' ছবিটি।

দেবীপ্রসাদ সে সময় তখন আর্টিস্টদের মহলে কিম্বদন্তী-পুরুষ। কিন্তু সুভো ঠাকুরের সঙ্গে চর্ম চোক্ষে চোখাচুখির সুযোগ হয় নি তখনও। 'প্রবাসী' কিংবা 'ভারতবর্ষ' মাসিকপত্রে প্রকাশিত ছবির প্রতিলিপি মারফত মাত্র পরিচয়।

সুভো ঠাকুর সেইসব প্রতিলিপি অবলোকনেই দেবীপ্রসাদের প্রসাদপ্রার্থী। তাঁর অজান্তেই তাঁর ভক্তবৃন্দের গোষ্ঠীভুক্ত। সুভো ঠাকুরের কাছে এলেই দেবীপ্রসাদের কাজের প্রশংসায় ও হোতো পঞ্চমুখ। প্রশংসায় যেন চারিধার দিয়ে উপচে পোড়তো ও। ও তখন দেবীপ্রসাদের আঁকা সেই সব ছবিগুলির কথা বোলতে গিয়ে মেঘদর্শনে কেকার কলাপের মতো কোকিয়ে উঠতো : আহা, কি নিখুঁত ড্রইং! কি মনোহর না সেই ভারতীয় ভাবালুতা! গাছ-গাছালি, লতা-পাতার সে কি অপরূপ পরিবেশ। তুলনাহীন, তুলনাহীন! অবনীন্দ্রনাথের নব্যবাংলা স্কুলের এক মহান পরিণতি যেন ও দেবীপ্রসাদের কাজে দেখতে পেত। পূর্ণ চক্রবর্তী, উপেন ঘোষদস্তিদার ইত্যাদিরা অবনীন্দ্রনাথ-গোষ্ঠীর কতখানি তা সুভো ঠাকুর জানে না, তবে দেবীপ্রসাদের যে উত্তরসূরী এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সুভো ঠাকুর বলে : সেইবারেই তো সরকারি আর্ট স্কুলে সেবারের সেই বার্ষিক এগজিবিশনেই দেবীপ্রসাদের অরিজিনাল কাজের এবং সশরীরে দেবীপ্রসাদের সেই তো ওর সঙ্গে প্রথম দেখাদেখি

দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর আঁকা 'অভিসারিকা'

ঘোটেছিলো। কি সে শরীর ধাতব-ভাস্কর্যের সঙ্গে একমাত্র তুলনীয়। ব্রোঞ্জের তৈরি মূর্তির মতো ছিলো সে শরীরের গঠন

সুভো ঠাকুর শুনেছিলো, তিনি যখন প্রাতঃকালে কুস্তির আখড়া থেকে ফেরতা মাটি-মাখা শরীরে বিভোর হোয়ে আড়বাঁশী বাজাতে বাজাতে সেই সাত সকালে বাড়ি ফিরতেন, তখন সদ্য ঘুমভাঙা অনেক কুমারীর ফুলের তোড়া খিড়কি-ধারের খড়খড়ি দিয়ে তাঁর গায়ে অথবা পায়ে এসে পোড়তো।

এই ঘটনাটা শুনলে সতিই ভালো লাগে। সেদিন মেয়েদের কাছে আর্টিস্টদের কদর ছিলো বইকি ও তখনকার দিনের তরুণীদের উদ্দেশে তারিয়ে তারিয়ে তারিফ কোরে বলে : আজকের দিন হোলে এ ঘটনা কি কখনও ঘোটতে পারতো ? সুভো ঠাকুর সেই যে মেয়েটিকে প্রোপোজ কোরেছিলো, সেই মেয়েটিই তো মুখের ওপর বোলেছিলো, তুমি পারফেক্ট প্রেমিক্ অবশ্যই। কিন্তু বিয়ের বাজারে তোমার আদর কিংবা কদর অচল আধলার চেয়ে আরও একটু অল্পই জেনে রেখো মোনের এই বস্তুতান্ত্রিকতা তখনকার মেয়েদের মধ্যে সত্যিই ছিলো অভাব।

সেবার দেবীপ্রসাদ আর্ট স্কুলের সেই এগজিবিশনে যে ছবিটি দিয়েছিলেন, তা তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার একটি উৎকৃষ্ট সৃষ্টি তো বটেই, এমনকি প্রকৃষ্টতম প্রমাণও বলা যেতে পারে। ছবিটি নারী বিবর্জিত। একটি ডালে ঘনিষ্ঠভাবে মাত্র দুটি পাখি। ঘেঁষাঘেঁষি কোরে বোসে। ঠিক তার পশ্চাৎপটে বিরাট এক পূর্ণিমার চাঁদ বিরাজিত আকাশের মাঝে মাঝে কোদালে কাটা মেঘের আবির্ভাব। সেই বিরাটাকার পূর্ণিমার চাঁদটি সম্পূর্ণ গোল্ড লিফিং বা সোনার তবক দিয়ে তৈরি। এমনকি মেঘের গায়ে যে চাঁদের আলোর প্রতিফলন, তাও ওই সোনালী তবক দিয়ে করা। শুধু তাই নয়, পাখি দুটির পাখনার প্রত্যেকটি পালক তুলির আঁচড়ে আলাদা আলাদাভাবে আঁকা। দেবীপ্রসাদ আবিষ্কৃত কি অপূর্ব সেই কাজের শৈলী। কি তার বাহাদুরি ! তা ছবিটি যাঁরা না দেখেছেন, তাঁদের বর্ণনার দ্বারা বোঝানো নিতান্তই মুশকিল।

সেবার সমস্ত প্রদর্শনীতে দেবীপ্রসাদের ছবিটিই সর্বপ্রথম স্থান অধিকার কোরতে অবশ্যই কৃতকার্য হোয়েছিলো।

হবি তো হ সেদিনই সুভো ঠাকুর এগজিবিশনের তথা আর্ট স্কুলের ভিতরের গেটের সামনে দণ্ডায়মান তখন। যখন দেবীপ্রসাদ সশরীরে তাঁর ঈর্ষান্বিত হবার উপযুক্ত শরীরখানি নিয়ে মোটর থেকে নামলেন। হাতে স্টেট এক্সপ্রেস সিগারেটের একটা টিন। কুঞ্চিতপ্রায় ধুতির কোঁচাটি মেঝের ওপর লুণ্ঠিতপ্রায়। সঙ্গে একদঙ্গল অভিজাত বংশীয় তরুণ স্তাবক।

সে একটা রাজকীয় দৃশ্য বটে ! আর্ট স্কুলের

সর্বোচ্চ পদাধিকারী প্রিন্সিপালকে পরিত্যাগ কোরে সিনিয়ার-মোস্ট ছাত্র-শিল্পীরা তখন ঘিরে ধোরেছে তাঁকে।

সেই কারণেই তো সুভো ঠাকুরের আজও মোনে হয় সে যুগে প্রতিভার কদর ছিলো। এযুগে যে পারমিট দিতে পারবে, সেই তো হারমিট সেই তো সমাজের শ্রেষ্ঠ পদাধিকারী।

সুভো ঠাকুর সবেতেই কি রেকর্ড করে? ইস্কুল পালানোতেও ও রেকর্ড রেখেছে। বিলেত থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসাতেও ওর রেকর্ড। লাইফ ক্লাসের মডেল খোঁজার ব্যাপারে স্থানে-অস্থানে যাওয়ার কথা পাছে শালীনতা ভঙ্গ হয়, সেই সঙ্কোচে সুভো ঠাকুরের মতো লোকও সে সব অধ্যায় এখানে অনুল্লেখ রেখে গেলো? এও তো একটা রেকর্ড, নয় কি কিন্তু সবার ওপর রেকর্ড কোরলো ব্ল্যাকবোর্ড ক্লাসে দু বছর এগজামিন না দিয়ে সেঁটে থাকার ব্যাপারে।

এপর্যন্ত ব্ল্যাকবোর্ড ক্লাসে দু'বছর ধোরে রোয়ে গেছে কি কেউ? স্কুলের জন্ম তারিখ থেকে তখন পর্যন্ত এমনতরো কেস কদাচ নজরে পড়েনি কারও। ওর বেলায়, এবারে ও কিন্তু তাই কোরেছে। শেষমেশ কর্তৃপক্ষ, তথা হেডমাস্টার আচারিয়া-সাহেব লজ্জার মাথা খেয়ে ওকে সাজেস্ট কোরে বোললেন, ব্ল্যাকবোর্ড ক্লাস বাদ দিয়ে ও যেন এবার ইণ্ডিয়ান পেন্টিং ক্লাসে ভর্তি হবার চেষ্টা করে যাই হোক, আচার্য অবনীন্দ্রনাথের বংশের ছেলে এর থেকে তাকে কি-ই বা বেশি বলা যায়, বা করা যায়।

ইণ্ডিয়ান পেন্টিং-এর ওই ক্লাসে তখন ঈশ্বরীবাবু হোচ্ছেন শিক্ষক। সবাই বোললে, তোমার ওই ঠাকুর নামে এক কথায় তোমায় ভর্তি কোরে নেবেন। সুভো ঠাকুর কিন্তু ওই ঠাকুর-টাকুর নামের ব্যাপারে অতো কনশাস ছিলো না। ও একদিন ঈশ্বরীবাবুর ক্লাসে হঠাৎ এসে হাজির হোলো এবং ঈশ্বরীবাবুর সঙ্গে দেখা কোরে বোললে, উনি যদি ওকে ওঁনার ছাত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। ও কোনোমতেই ওই ব্ল্যাকবোর্ড ক্লাসের কালো অন্ধকারময় কাঠের তক্তগুলোর মোধ্যে কোনো ইন্সপিরেশনের ইঙ্গিত বা হদিস হাহাকারের মতো হা-হুতাশ কোরেও খুঁজে পায় নি বলাইবাবুও সেই অন্ধকার হোতে আলোকের কোনোরূপ উৎসের সন্ধান দিতে পারতেন বোলে ওর মোনে হয় না। তাই ও ঈশ্বরীবাবুর শরণাপন্ন।

ঈশ্বরীবাবু ওর সঙ্গে সামান্য দু'চারটি কথার পর ওঁনার নিজের ডেস্ক থেকে একটা ড্রইং পেপার বের কোরে ওর সামনে দিয়ে বোললেন, একটা কম্পোজ করোতো ছবি—অশ্বত্থ গাছ দেওয়া একটা মন্দিরের কম্পোজিশন করো।

সুভো ঠাকুর এইরকম হুকুম তামিল কোরতে খুশি মোনে অতীব তৎপর হোয়ে উঠলো। ও তখন এই ছবিটি রাজস্থানী ঢঙে শেষ কোরে ইস্কুলের ছুটির প্রায় শেষ ঘন্টা পড়ার সময় ঈশ্বরীবাবুর হাতে তুলে দিতে তিনি সে কি খুশি বোললেন কোন বাড়ির ছেলে, হবে না? জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই যে এদের হাত পাকা হোয়ে থাকে। আর একে দিয়েছে কি না ব্ল্যাকবোর্ড ক্লাসে! এরা যে জন্ম ইস্তক পাখা বিস্তার কোরে মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়াতে অভ্যস্ত এরা যে আচার্য বংশের—মানে অবনীন্দ্রনাথকেই ইশারা কোরলেন আর কি

সুভো ঠাকুর কিন্তু এ সব ইনডায়রেক্ট স্তুতিবাক্যের কোনো পরোয়াই রাখেনি। আর ও বলে অবনীন্দ্রনাথের শৈলী, অথবা ভাবাদর্শের কোনো কিছুই ওকে ইনস্পায়ার করেনা এবং সে সম্বন্ধে আদতে কিন্তু ও নেহাতই নিস্পৃহ। এমন কি, ব্যক্তিগতভাবেও খুল্লতাত হোলেও সেরূপ স্নেহের ঘনায়মান সম্পর্ক কদাচ ছিলো বোলেও ওর মোনে পড়ে না। এ কথা প্রকাশ্যে বলারও কোনো সংকোচ নেই।

ঈশ্বরীবাবু, ইনি হোচ্ছেন বিখ্যাত পাটনার স্কুল অফ পেন্টিংয়ের শেষ প্রবক্তা। পুরো নাম ঈশ্বরীপ্রসাদ বর্মা। ঈশ্বরীবাবু সুভো ঠাকুরকে যথেষ্ট স্নেহ কোরতেন। কিন্তু সেই ঈশ্বরীবাবুর সঙ্গেও ওর শেষমেশ কিছুদিনের মোধ্যেই হোলো কিনা মোন কষাকষি।

ও দু'হাত তুলে চৈতন্যদেবের ভঙ্গীতে ওর ক্লাস মেটদের বোঝাতে চেষ্টা করে, নহে নহে, রবি ঠাকুর নহে, তার ও অনেক উর্দ্ধতন পূর্ব পুরুষ কবি কালিদাসের কুলগৌরব থেকে ও কিনা ওর বংশলতা টানে। তা নোইলে যে ডালে বোসবে, সেই ডালকেই সুভো ঠাকুর সব সময় কাটতে উদ্যত হয় কেন? এমনতরো ঘটনাও অহরহ ঘোটলে তখন কালিদাসের বংশোদ্ভূত না হোয়ে ওর বংশলতা আর কোথা থেকে টানা যেতে পারে?

আদতে ঈশ্বরীবাবু ছিলেন মোনের দিক থেকে ট্রাডিশনাল। আর সুভো ঠাকুর সেই বয়েসে, সেই সময়, সেই এখন থেকে ষাট-বাষট্টি বছর আগে থেকেও ফর্ম ভাঙার ইনসপিরেশন-এ, ফর্মের সিম্পলিফিকেশন-এ দক্ষতা দেখাবার এক্সপেরিমেন্টে যেন সদাই তা-তা থৈ-থৈ। সাঁওতাল পল্লীর দেওয়ালের গায়ে সাদা খড়ি কিংবা ওইরকম কোনো বস্তু দিয়ে আঁকা মানুষ ইত্যাদির নানারকম আকার—ওর করা সেইরকম কাজগুলো মাস্টারমশায় তথা ঈশ্বরীবাবু দেখে মর্মাহত—পুত্রশোকের মতো বেদনাহত। বোললেন, এতোদিন আমার কাছে কাজ শিখে—এই কি হোলো গুরুদক্ষিণা? কি পাপে তার হোলো এহেন নরক দর্শন, তা কে জানে?

এর উত্তরে লজ্জা-ভয় না পেয়ে সুভো ঠাকুর তার শিক্ষকের মুখের ওপরই বোললে, ওর অস্তিত্বইতো সব কিছুর শালীনতার, সব কিছুর চলতি পদ্ধতির বিরুদ্ধে—কর্দমাক্ত পরিবেশে। ও নাকি নরকের কীট। নরকদর্শন সেই কারণে সর্বক্ষণই তো ওর ঘোটে চোলেছে সর্বক্ষণ, সর্বত্রই।

ধারাবাহিক

বাদাম তাড়ার জাতি, গড়নে নারীর নির্মাণ ফটো: সোমনাথ ঘোষ

মতিউর রহমান চৌধুরী

'ফরাসি প্রেসিডেন্টের মতো ক্ষমতা দিন অন্তত'

জেনারেল এরশাদ শেষ পর্যন্ত পার্লামেন্ট নির্বাচনেই রাজি হয়ে যেতে পারেন। তবে তিনি চান বিরোধীরা তাঁকে নিশ্চয়তা দিন, নির্বাচনের পর তাঁর পজিশন ঠিক রাখবেন। অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট হিসাবেই তিনি ক্ষমতায় থাকতে চান। আর সেটা যেকোন পদ্ধতিতেই হোক। পার্লামেন্ট পদ্ধতিতে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা নেই বললেই চলে। প্রধানমন্ত্রীই এখানে সকল ক্ষমতার অধিকারী। এরশাদ বিরোধীদের বলেছেন, ফরাসী প্রেসিডেন্টের যে ক্ষমতা আছে তা অন্তত দিন। বিরোধী রাজনীতিকরা এখনও তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেননি। সাম্প্রতিক সংলাপে প্রসঙ্গটি এসেছে। তবে আলোচনা প্রাথমিক পর্যায়েই রয়েছে এখনও।

এরশাদ ৮২ সনের সংবিধান পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। ক্ষমতায় এসে সংবিধানটি তিনি স্থগিত করেছিলেন এক সামরিক ফরমান জারি করে। বাতিল করেছিলেন পার্লামেন্ট। সাম্প্রতিক আলোচনায় এরশাদ তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করে সকল নির্বাচনের আগে পার্লামেন্ট নির্বাচনে রাজি হয়েছেন। এখানে অবশ্য তিনি খেলছেন বিরোধী রাজনৈতিক দল ও নেতাদের নিয়ে। পনের ও সাতদলীয় জোট সার্বভৌম পার্লামেন্ট নির্বাচনের দাবি জানালেও দ্বিমত আছে সার্বভৌম শব্দটি নিয়ে। পনের দলীয় জোটের নেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ মনে করেন সার্বভৌম মানে বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান অর্থাৎ ৭২ সনের সংবিধানে বর্ণিত পার্লামেন্টের ক্ষমতা। এ জোটের পক্ষ থেকে এরশাদকে বলা হয়েছে আগে নির্বাচন দিন, নির্বাচন হবার পর মেজরিটি আসন যারা পাবে তারা সরকার গঠন করবে। এ সরকারের কাছেই আপনি ক্ষমতা হস্তান্তর করুন। এ প্রস্তাবে এরশাদ রাজি। তবে সম্মতি চান অন্যান্য জোট ও দলের।

সাতদলীয় জোট অবশ্য সার্বভৌম পার্লামেন্ট বলতে ৮২ সনের সংবিধানের অধীনে পার্লামেন্ট নির্বাচন চান। তাদের মতে এ সংবিধানে পার্লামেন্ট সার্বভৌম। পনেরদলীয় জোট বলেছে এ সংবিধানে

ঢাকার সাম্প্রতিক আন্দোলনে একটি ব্যাঙ্গ চিত্র

পার্লামেন্টকে রাবার স্ট্যাম্পের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। সার্বভৌম প্রশ্নে মতবিরোধ থাকায় এরশাদ এর থেকে ফায়দা লুটতে চান। তাই আলোচনা দীর্ঘায়িত করা হয়েছে। এদিকে জোট দুটোর মধ্যে ক্ষমতা ও সিট ভাগাভাগি নিয়ে মতভেদ শুরু হয়ে গেছে। বাংলাদেশের রাজনীতির এটাই ট্রাজেডি। মে মাসে প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচন হবার কথা ছিল। কিন্তু বিরোধীদের সাথে আলোচনা শেষ না হবার কারণ নির্বাচন অক্টোবর-নভেম্বর পর্যন্ত পিছিয়ে যেতে পারে।

এরশাদ রাজনীতিতে যোগ দেবেন কিনা এখনো স্পষ্ট নয়। যদিও তাঁর মতামত নিয়ে জনদল গঠন করা হয়েছে।

জনদল সংগঠিত না হওয়ায় এরশাদ ক্ষুব্ধ। গত সপ্তাহে জনদল নেতাদের বলেছেন: আপনারা ঢাকায় বসে কি করছেন। টাকা পয়সা, গাড়ি, বাড়ি দেয়া হয়েছে। মন্ত্রীও পেয়েছেন ৫ জন। (অন্য কোন দল থেকে মন্ত্রী নেওয়া হয়নি) এর পরও জনদল ব্যাপক জনগণের সমর্থন লাভে সক্ষম হচ্ছে না কেন? অনেকে বলেন এরশাদ জনদলে নাও যোগ দিতে পারেন। এরশাদের দ্বারা অবশ্য এটা সম্ভব। ঢাকার বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা ইত্তেহাদ লিখেছে এরশাদ তাঁর নিজের সব ঘোষণাকে বাতিল করে দিয়েছেন। বাকি আছে দুটো। এক ঢাকার বানান। Dacca হতে Dhaka করেছেন। দুই তাঁর ছেলে হবার ঘোষণা। এরশাদ ১৯৮৩ সনের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে এক সমাবেশে তাঁর ছেলে হবার কথা ঘোষণা করেছিলেন। ২৬ বছর নিঃসন্তান থাকার পর ১৯৮৩ সনের ১১ জানুয়ারি পুত্রসন্তাম লাভ করেন। C.M.L.A কথাটির অর্থও আজ ঢাকার লোকজনের মুখে মুখে। ক্যানসেল মাই লাস্ট এনাউন্সমেন্ট। এরশাদ সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন একথা বলা যায়। তবে এখানে এরশাদকে ক্রেডিট দিতে হয়। দেশে যাতে অসন্তোষ গোলমাল না হয় সে জন্য চেষ্টা করছেন নানাভাবে। এরশাদ একজন কবি। তাঁর মন খুবই দুর্বল—বলে থাকেন অনেকে। ট্রাক চাপা দিয়ে ছাত্র মারা হয়েছে দুজন। এরশাদ দুঃখ করলেন সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে। তিনদিন পড়ে চলে গেলেন নিহত ছাত্রের বাড়িতে। ক্ষতিপূরণ দিলেন ৫০ হাজার টাকা।

এ নিয়ে অবশ্য যথেষ্ট সমালোচনারও সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান এক জনসভায় বলেন "এরশাদ সাহেব ছাত্র মারা গেলে ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেন। আমি বলছি আপনি মারা যান আপনাকে ৫ কোটি টাকা দেব।"

এরশাদ এমনই। আজ যারা শত্রু কাল তারা মিত্র। সোভিয়েত কূটনীতিকদের দেশ থেকে তাড়ালেন তাঁরা গোলমাল করে এ অভিযোগে। আর মাত্র তিন মাস পরে বলছেন সোভিয়েত আমাদের বন্ধু। ১৪ জন কূটনীতিককে ডিসেম্বর মাসে বহিস্কার করা হয়েছিল। এ মাসে ৫ জন কূটনীতিককে ঢাকা আসার ভিসা দেয়া হয়েছে। একজন কনসাল জেনারেল ও মিলিটারি এ্যাটাচি আছেন তার মধ্যে। সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটি চালু হবে জুন মাসে। জানুয়ারি মাসে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।

ঢাকা এখন শান্ত প্রায়। সভা সমাবেশ হচ্ছে তবে আক্রমণের ভাষা তীব্র নয়। রাজনীতি এখন সংলাপে আবদ্ধ। বঙ্গভবনের কনফারেন্স হল থেকে রাজপথে এলে হয়ত অবস্থা ফের উত্তপ্ত হতে পারে। সম্ভাবনা অবশ্য কম। কারণ আলোচনা সফল হবে এধরনের ধারণাই দিচ্ছেন বিরোধী দল। যদি কোন কারণে আলোচনা ভেঙ্গে যায় তাহলে রাজনীতি আবার সামরিক ফরমানে বন্দী হয়ে যেতে পারে।

অধ্যাপক গোলাম আজমের নাগরিকত্ব নিয়ে আবার নানা প্রশ্ন।

নাগরিকত্ব ছাড়াই ৪ বছর কেমন করে আছেন সে প্রশ্ন সবার। এ ব্যাপারে সরকার নীরব। প্রয়াত জিয়াউর রহমান তাঁকে ঢাকা আসার অনুমতি দিয়েছিলেন। ১৯৮১ সনে মুক্তিযোদ্ধারা এর প্রতিবাদ জানালে জিয়া তাঁর নাগরিকত্ব দিতে সাহস পাননি। এরশাদও দেবেন বলে মনে হচ্ছে না।

৭১ সনে আলবদর বাহিনী সৃষ্টি করা হয়েছিল তাঁর পরামর্শে। এ বাহিনীই বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল নির্বিচারে। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে গোলাম আজম সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দেন। যা প্রকাশিত হয় সব কাগজে। পাকিস্তানী নাগরিক অধ্যাপক আজমের বিবৃতি কি করে ছাপা হলো সে প্রশ্ন তুলেছেন বুদ্ধিজীবীরা। জনদল নেতারাও এর সমালোচনা করেছেন। □

যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই

সুমিত্র দেশপাণ্ডে

গত বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী চার দশকে বিশ্বে, মূলত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, ৯০,০০,০০০ অসামরিক নাগরিকসহ প্রায় ১,৫০,০০,০০০ মানুষ ১০০টি ছোটবড় যুদ্ধে মারা গেছেন এই মত ওয়াশিংটনের নিরস্ত্রীকরণ কমিটির রিপোর্টে প্রকাশিত। এখন পৃথিবীতে সামরিক বাজেটের পরিমাণ বছরে ৬৬,০০০ কোটি ডলার। আড়াই কোটি মানুষ অস্ত্রের অধীন। প্রতি মিনিটে বিশ্বের সামরিক বাজেটে ব্যয় হয় ১৩,০০,০০০ ডলার—প্রতি মিনিটে খাবার ও ওষুধের অভাবে ৩০ জন শিশু মারা যায়। ২৩টি উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষা বাজেটে যা খরচা, তা দিয়ে একটা পারমাণবিক ডুবোজাহাজ তৈরি হচ্ছে। যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ক প্রবন্ধের এই তৃতীয় ও শেষ কিস্তিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুদ্ধের চরিত্র ও প্রধান উদ্যোক্তাদের অভিপ্রায় ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হলো।

দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে ধ্বংস আর মৃত্যুর চেহারা দেখা গেল আরও নৃশংসভাবে। ছ বছর ধরে এই যুদ্ধে ৬১টি দেশ যোগ দিয়েছিল ১৭০ কোটি মানুষের ভাগ্যকে অনিশ্চিত করে তুলে। সশস্ত্র আক্রমণ হয় ৪০টি শহরে, ১১ কোটি মানুষ প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশ নেয়। মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৫ কোটি। যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতির মোট পরিমাণ ৪,০০০,০০০ মিলিয়ন ডলার বা বলা যায় অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর জাতীয় আয়ের ৬০-৭০ শতাংশ।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর জন্ম, জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের তীব্রতায় শেষ কলোনিগুলোয় মৃত্যুর নিশ্বাস সাম্রাজ্যবাদের সংকটকে আরও গভীর করে তোলে। পরিস্থিতির সঙ্গে তাল
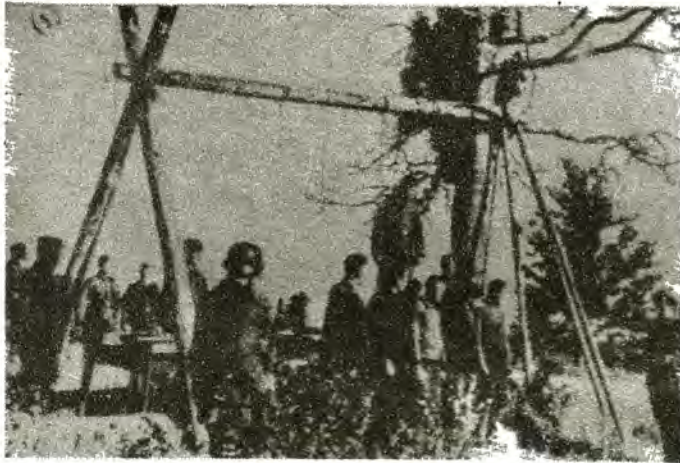
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান নৃশংসতার কয়েকটি ছবি ১· পাঁচজন রুশ নাগরিক সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে নাজি অফিসারের সামনে। ২· বন্দীদের প্ল্যাটফর্মের ওপর তুলে তাদের গলায় ফাঁস পরিয়ে দিচ্ছে। ৩· দুজন নাজি সৈন্য প্ল্যাটফর্ম সরিয়ে নিচ্ছে। ৪· পাঁচ বন্দীর মৃতদেহ ঝুলছে।

মিলিয়ে আন্তর্জাতিক আইনও বদলালো। ১৯৪৫ সালে গৃহীত, বর্তমান কালের আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তি, রাষ্ট্রসংঘের চার্টার পৃথিবীর সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রকে মেনে চলতে হবে। সেই চার্টারের মতে যেকোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই সশস্ত্র আক্রমণ আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী। সব রাষ্ট্রই স্বীকার করে, হিংসাত্মক যুদ্ধ এখন আন্তর্জাতিক অপরাধ।

. এখনও অনেক উদার ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী আছেন যাঁদের মতে যুদ্ধ কোনো অপরাধ নয়। যেমন লুনেবার্গে জার্মান যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সময় বৃটিশ আইন বিশেষজ্ঞ বলেন, হিংসাত্মক আক্রমণ কোনো অপরাধ নয়। আন্তর্জাতিক আইনের এক মার্কিন বিশেষজ্ঞ হ্যান্স কেলসেনের মতে যে কোনো রাষ্ট্রই যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে, যদি সেই রাষ্ট্র নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে (প্রিন্সিপলস অব ইনটারন্যাশনাল ল, হ্যান্স কেলসেন, পৃষ্ঠা ৩৬।

এইভাবেই কিন্তু রেগান গ্রেনাডায় আক্রমণ করেন)। পশ্চিমের অনেক নেতাই কিন্তু বিতর্কমূলক প্রশ্ন যুদ্ধের মাধ্যমে সমাধান করার প্রবল পক্ষে। প্রাক্তন এক মার্কিনী রাষ্ট্রপতির জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, জ্বিগনিউ ব্রজেজিনস্কির মতে, 'আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিজের শক্তি জাহির করাই এখন একমাত্র উপায়। সুযোগ পেলেই তা ব্যবহার করা উচিত, কিন্তু ব্যবহারের আগে তা নিয়ে বাক-বিতণ্ডায় জড়িয়ে না পড়াই শ্রেয়' ('স্টার্ন' পত্রিকা, ৩৩ সংখ্যা, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা ১২৭)। ব্রজেজিনস্কির এই কথা আমরা শুনেছি যখন অন্য কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ না করার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে রাষ্ট্রসংঘে, যখন বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে শক্তি ব্যবহারকে 'নিয়ম' করে তোলা নিয়ে তীব্র নিন্দে করা হচ্ছে।

১৯৭০ সালের ২৪ অক্টোবর 'ডিক্লেয়ারেশন অন প্রিন্সিপল্‌স অব ইনটারন্যাশনাল ল কনসার্নিং ফ্রেণ্ডলি রিলেশনস এ্যাণ্ড কোঅপারেশন এ্যামং স্টেটস ইন এ্যাকরডেন্স উইথ দ্য চার্টার অব দ্য ইউনাইটেড নেশনস'-এর ঘোষণাই হোক বা নুরেমবার্গে আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইবুনালের রায় হোক, যুদ্ধকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় শান্তি ও আন্তর্জাতিক আইন ও মানবতার প্রতি একটি খুনে আসামীর অপরাধের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

অধিকৃত এলাকায় ইসরায়েল যেভাবে নিজেদের ইচ্ছে মতো ভৌগোলিক সীমার বদল ঘটাচ্ছে, রাষ্ট্রসংঘ তাতে আপত্তি জানিয়েছে বার বার। জেরুসালেমের আন্তর্জাতিক 'মর্যাদা'-কে ইসরায়েল ক্ষুণ্ণ করে, ওদের 'নেসেট'-এর (পার্লামেন্ট) অনুমোদন নিয়ে ১৯৬৭-র ২৭ জুন থেকেই জেরুসালেমকে মিলিয়ে নিতে চাইছিল একই প্রশাসনিক কাঠামোর ভেতর। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ১৯৭১-এর ২৫ সেপ্টেম্বর সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব নিয়ে ইসরায়েলকে আন্তর্জাতিক 'মর্যাদা'-র হেরফের করতে নিষেধ করে। উপেক্ষায় ইসরায়েল জানায়, জেরুসালেম শুধু একত্রিতই নয়, অবিচ্ছেদ্য রাজধানী। ১৯৮০-র ২০ অগাস্ট ৪৭৮তম সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রসংঘ আবার ইসরায়েলের এই দখলদারিতে তীব্র আপত্তি জানায়। ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির কথা সবারই জানা—জিমি কার্টারের মধ্যস্থতায় ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট মেনাকেম বেগিন ও মিশরের প্রেসিডেন্ট সাদাত সিরিয়া ও জর্ডনের সমস্যা নিয়ে অধিকৃত এলাকার পরিপ্রেক্ষিতে চুক্তিতে সই করেন। সিরিয়া ও জর্ডনের কোনো প্রতিনিধি সেই আলোচনায় উপস্থিতই ছিলেন না। ভিয়েনা কনভেনশনের ল অব ট্রিটি-র ৩৪ ধারা অনুযায়ী দুই দেশের মধ্যে কোনো চুক্তি তৃতীয় কোনো দেশের ওপর বাধ্যতামূলক হতে পারে না, যদি সে দেশের স্পষ্ট সম্মতি নেওয়া না হয়। অর্থাৎ কোনো দেশ কোনো চুক্তির অংশীদার না হলে, অন্য দুটি দেশের চুক্তি তার ওপর বর্তায় না। সেই দিক থেকে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি সম্পূর্ণ বেআইনী। মিউনিখ চুক্তিতে চেকোশ্লোভাকিয়ার সম্মতি না নিয়ে জার্মানী, ইতালি, বৃটেন ও ফ্রান্স যেমন তার ভাগ্য নির্ধারণ করছিল, ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিও সেইরকমই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এখন পর্যন্ত ১০০-র বেশি যুদ্ধ হয়ে গেছে পৃথিবীতে, প্রায় ১ কোটি ২৩ লক্ষ আক্রমণকারী সৈন্যের সক্রিয় সহযোগিতায়। এক একটা যুদ্ধ চলেছে পাঁচ, সাত, দশ বছর বা তারও বেশি। এই এতগুলো যুদ্ধের ভেতর মাত্র ৩৬টি সংঘর্ষেই মারা গেছে ২ কোটি মানুষ। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর এই যুদ্ধগুলোর প্রধান সংগঠক কখনও 'ন্যাটো' জোটভুক্ত দেশগুলো, কখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন বা ফ্রান্স। ভেঙে পড়া উপনিবেশ, নির্ভরশীল দেশগুলোয় জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের হুমকি ও আন্তর্জাতিক বাজারের বিশাল লাভজনক ব্যবসা হাতছাড়া হয়ে যাবার আশঙ্কা থেকেই প্রধানত এই যুদ্ধগুলোর শুরু। রেগন যেমন ১৯৮২ সালে জেট-ল্যাগের প্রতিক্রিয়ায় ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখে পশ্চিম জার্মানীতে ঘোষণা করেছিলেন, সমাজতন্ত্রকে রুখতে হবে।

ফ্রান্সের কথাই যদি ধরা যায়, দেখা যাবে ফ্রান্স আক্রমণ করেছে ডিমোক্রেটিক রিপাবলিক অব ভিয়েতনাম (সেপ্টেম্বর ১৯৪৫, মার্চ ১৯৪৬, ডিসেম্বর ১৯৪৬, জুলাই ১৯৫৪) কোরিয়ার বিরুদ্ধে (জুন ১৯৫০, জুলাই ১৯৫৩) যুদ্ধে নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স ও তাদের তাঁবেদাররা; ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আঘাত হানে ১৯৬৪-র অগাস্ট থেকে ১৯৬৮-র নভেম্বর ও ১৯৭২-র এপ্রিল থেকে ১৯৭৩-র জানুয়ারি, পৃথিবীর জঘন্যতম যুদ্ধাপরাধ বলে এখন যা ইতিহাসে চিহ্নিত ১৯৬৩-র এপ্রিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবা আক্রমণ করে।

১৯৪৫-র সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৯-র ফেব্রুয়ারি অবধি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থানকে দমন করবার জন্য সেখানকার গুয়োমিনডাঙ সরকারকে ১১৩,০০০ সৈন্য, ৬০০ বিমানবাহিনী ও ১৫৭ যুদ্ধজাহাজ পাঠায়। জাপানের কোয়াংতান সৈন্যদের তাড়িয়ে চীনের উত্তরাঞ্চলকে সেদিন মুক্ত করতে সাহায্য করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন।

মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে দমন করার বিশ্বব্যাপী পরিকল্পনাতে ১৯৪৫ সালের মে মাসে ফ্রান্স আলজিরিয়ার মুক্তিযুদ্ধকে দমন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাঠানো ৫০০ বিমান ও ১৫০ যুদ্ধজাহাজের সঙ্গে ২৫০,০০০ ফরাসী সৈন্য ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৫৪-র জুলাই পর্যন্ত লাওস ও কম্বোডিয়ার মানুষদের 'শান্ত' হতে বাধ্য করেছে। ১৯৪৫ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষিত হলেও বৃটেন ও নেদারল্যাণ্ডস ৮০,০০০ সৈন্য পাঠায় ঐ নতুন দেশটিকে ধ্বংস করতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এটাই হলো নতুন ধরন—পৃথিবীর যেখানে মানুষ নিজেদের স্বাধীনতার দাবী তুলবেন, নিজেদের জাহির করতে চাইবেন, তাঁদের শেষ করে দাও। ফ্রান্স জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে ধ্বংস করেছে মাদাগাস্কারে (১৯৪৭-র মার্চ, ১৯৪৮-র ডিসেম্বর), তিউনিসিয়া মরোক্কোয় (১৯৫২-৫৬), আলজিরিয়ায় (নভেম্বর ১৯৫৪-মার্চ ১৯৬২), কামেরুনে (১৯৫৫-৬২), শাদ-এ (১৯৬৮, ১৯৭৮, ১৯৮৩); বৃটেন ধ্বংস করেছে স্বাধীনতার দাবী মালয়ায় (১৯৪৮-৬০), মিশরে (১৯৫১-৫২), কেনিয়াতে (১৯৫২-৫৬), সাইপ্রাসে (১৯৫৫-৫৯), ওমানে (১৯৫৫-৫৯, ১৯৬৫), ইয়েমেনে (১৯৫৬-৫৮), জর্ডন (১৯৫৮) ও কুয়েতে (১৯৬১)। ভিয়েতনাম বাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দমন করেছে ফিলিপাইনস (১৯৪৮-৫৩), পুয়ের্তো রিকো (১৯৫০), গুয়াতেমালা (১৯৫৪), লেবানন (১৯৫৮), পানামার (১৯৬৪) মানুষদের আত্ম-আবিষ্কারের দাবী। চিলিতে, বেইরুটে, গ্রেনাডায় আর সব শেষে নিকারাগুয়ার নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সমস্ত শক্তি দিয়ে লড়েছে ও লড়ছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধগুলোর একটি বৈশিষ্ট্য হলো আক্রমণকারী কোনো একটি দেশ নয়, অধিকাংশ সময়ই কয়েকটি দেশের জোট এই আক্রমণ পরিচালনা করে বা প্রত্যক্ষ সমর্থন দেয়। যেমন, কোরিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের নেতৃত্বে, ১৬টি দেশ জোট বাঁধে। মিশরকে আঘাত হেনেছিল (১৯৫৬-৫৭) বৃটেন, ফ্রান্স ও ইসরায়েল। ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জোট বাঁধে (১৯৬২-৭৩)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, নিউ জিল্যাণ্ড, দক্ষিণ কোরিয়া ও থাইল্যাণ্ড। ১৯৬৪-র শরতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বৃটেন ও বেলজিয়াম কঙ্গো আক্রমণ করে। ডোমিনিকান রিপাবলিক আক্রান্ত হয় (১৯৬৫-৬৬) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, হণ্ডুরাস, নিকারাগুয়া ও হণ্ডুরাসের জোট থেকে। ১৯৭৮-এ ন্যাটো জোট জাইরের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে দমন করবার অভিযান চালায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ঔপনিবেশিক শক্তি পৃথিবীর ৫৯·৯ শতাংশ এলাকা শাসন করত। জনসংখ্যার প্রায় ৬৩·৬ শতাংশ এই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোর অধীনস্থ ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম, জাপান, জার্মানীরও উপনিবেশ ছিল। বর্তমানে সেই উপনিবেশের এলাকা এখন হ্রাস পেতে পেতে সমস্ত পৃথিবীর মোট এলাকার মাত্র শতাংশে এসে ঠেকেছে। ১৯৪৫ সালে রাষ্ট্রসংঘের চার্টারে সই করে ৫১টি রাষ্ট্র—এখন স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা ১৫৬। মুক্তি সংগ্রামে জয়লাভ করে এখন ৯০টি রাষ্ট্র স্বাধীনতা পেয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের প্রথম সাধারণ সভায় আফ্রিকা মহাদেশ থেকে সদস্য ছিল মাত্র ৯টি দেশ—এখন ঐ মহাদেশের ৫০টি স্বাধীন দেশ রাষ্ট্রসংঘের সদস্য।

জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ও ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীতে প্রতিটি দেশে প্রতিরোধ তীব্র আকার নিলেও দুর্বল ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শক্তিদের কাছ থেকে হুমকি আসছে। আফ্রিকাতে, এই সাম্রাজ্যবাদী জোটের প্ররোচনায় ১৯৫০ থেকে ৪০টি সামরিক অভ্যুত্থান, ১৬টি যুদ্ধ, কয়েক ডজন সশস্ত্র মোকাবিলায় ১·৭ মিলিয়ন মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক আইনানুসারে একটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী একমাত্র সেই দেশেরই মানুষ। ১৯৬২ সালেই রাষ্ট্রসংঘে এই প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে মূল গোলমালের কারণই এই প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের প্রতিযোগিতায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর প্রভুত্ব করা। আফ্রিকা মহাদেশের রাজনৈতিক চেহারা পাল্টে গেলেও আফ্রিকার প্রতি ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর দৃষ্টিভঙ্গী বদলায় নি। জেইরে-তে সশস্ত্র আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ঐ দেশের কপার, কোবাল্ট, ইউরেনিয়াম, হীরে ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর পশ্চিমী অধিকার জাহির করা।

ন্যাটো জোট তাদের ক্ষমতা উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত প্রসারিত করেছে—আফ্রিকার মানুষদের অনুমতি ছাড়াই। জিমি কার্টারের মনে হয়েছিল আফ্রিকা ও ভারত মহাসাগরে মার্কিনী প্রভাব বিস্তারে আর উদাসীন থাকা অনুচিত (ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট বুলেটিন, জুলাই, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা ১) এবং সেই প্রভাব বিস্তারের প্রস্তাবকে কার্যকর করেন তৎকালীন ন্যাটো প্রধান আলেকজাণ্ডার হেইস। কিন্তু কোন অধিকারে এই সামরিক প্রভাব বিস্তারের সিদ্ধান্ত হলো? ন্যাটোর কাজ করবার এলাকা, তো সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেই নির্দিষ্ট। আফ্রিকার কোনো দেশ ন্যাটোর সদস্য নয়। তাই ন্যাটোর আইনেই ন্যাটো আফ্রিকাকে তার কাজের সীমানার মধ্যে ধরে আইনবিরুদ্ধ কাজ করেছে। আফ্রিকার ভালোমন্দ দেখবার স্বীকৃত সংস্থা অরগানাইজেশন অব আফ্রিকান ইউনিটি। ন্যাটো এই ও-এ-ইউ-কে ধ্বংস করতে চায়।

১৯৬০ সালের ১৪ ডিসেম্বর 'ডিক্লেয়ারেশন অন দ্য গ্রান্টিং অব ইনডিপেনডেনস টু কলোনিয়াল কানট্রিস এ্যাণ্ড পিপলস্' গৃহীত হয় উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকে স্বীকৃতি জানিয়ে এবং সেই সংগ্রামকে সাহায্য করবার আইনগত অধিকারকে সমর্থন করে। কিন্তু উপনিবেশ-বিরোধী মুক্তি সংগ্রামকে দমন করবার জন্য ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো নানা ধরনের বাহিনী গঠন করেছে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঝটিকা বাহিনী (র‍্যাপিড ডিপ্লয়মেন্ট ফোর্স), শান্তিবাহিনী, আন্তঃআফ্রিকা বাহিনী, বহুজাতিক সেনাবাহিনী। রাষ্ট্রসংঘ বহুজাতিক শান্তিবাহিনী তৈরি করতে পারে আইনগত অধিকার থেকেই। কিন্তু যেমন আন্তঃআফ্রিকা বাহিনী গঠন করা হচ্ছে কোন অধিকার থেকে? ও-এ-ইউ-কে, এ ব্যাপারে কোনো আলোচনাতেই ডাকা হয় নি উন্নয়নশীল দেশের নেতারা তাই এ ধরনের একপক্ষের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সেনাবাহিনী গঠনের তীব্র সমালোচনা করেছেন। মাদাগাস্কারের রাষ্ট্রপতি ডিডিয়ের রাটসিরাকা-র মতে, অন্য দেশকে আক্রমণ করবার এ এক সামরিক প্রসাধন মাত্র। নাইজেরিয়া বলেছে, অন্য একটি মহাদেশ থেকে হঠাৎ আফ্রিকার উন্নতির জন্য বাহিনী গঠন করা সম্পূর্ণ আইনবিরোধী। সাইনাই উপত্যকাতেও একটি শান্তিবাহিনী গঠন করবার প্রস্তাব দিচ্ছে মার্কিনী প্রশাসন। আরব লীগের কোনো একটিও সদস্য রাষ্ট্রের একজন সৈন্যও এই বাহিনীতে থাকবে না আসলে শান্তিবাহিনীর নাম করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভূমধ্যসাগর থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত এলাকায় নিজের দখলদারি নিয়ে মধ্য ও দূরপ্রাচ্যকে ভাবত মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগর—এই দুই দিক থেকে চেপে ধরতে চায়।

এই তথাকথিত শান্তিবাহিনী গড়ার অছিলা হিসেবে তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা বৃটেন কোনো গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের মুক্তি সংগ্রামকে উগ্রপন্থী হিংস্রতা বলে প্রচার করে। তাদের মতে প্যালেস্টাইনের মুক্তি সংগ্রাম তাই 'টেররিজম', গ্রেনাডায় কিউবার (ও বৃটিশ) বিশেষজ্ঞরা বিমানঘাঁটি বানালে তা মার্কিনী স্বার্থের পরিপন্থী, নিকারাগুয়াতে স্বাধীন সরকার তাদের অসহ্য, শ্রীলংকার ত্রিঙ্কোমালি বন্দর তাদের দরকার, এমনকি মহাকাশও তাদের চাই। ফলে এই 'টেররিস্ট' মুক্তি সংগ্রামকে দমন করতে নিকারাগুয়ার চারদিকে 'শান্তিবাহিনী' মাইন বসায়, এল সালভাদোরের স্বাধীনতা যুদ্ধকে দমন করতে 'শান্তিবাহিনী' যায়, বেইরুটে যায় মেরিন, গ্রেনাডা আক্রান্ত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অবদমিত মানুষের স্বাধীনতার যুদ্ধমাত্রেই 'টেররিজম'। 'ইনটারন্যাশনাল টেররিজম' দমনের নামে স্বাধীনতার লড়াইকে ধ্বংস করতে তাই ২০০,০০০ সৈন্যের ঝটিকা বাহিনী গড়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যারা পৃথিবীর যেকোনো জায়গায় মার্কিন স্বার্থ রক্ষা করবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাকে বলে 'টেররিজম', রাষ্ট্রসংঘ তাকেই স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বীকৃতি দেয়। দক্ষিণ আফ্রিকার 'কালো' মানুষদের লড়াইকে সমর্থন জানানো হয়েছে রাষ্ট্রসংঘের ২০ ও ২৫তম অধিবেশনে, যেখানে মার্কিন প্রশাসন শ্বেতাঙ্গ সরকারকে সাহায্য করে চলেছে ৩০৭০তম সিদ্ধান্ত (xxviii) ও ৩২৪৬তম সিদ্ধান্ত (xxix) অনুযায়ী স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রাম রাষ্ট্রসংঘে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকৃত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পি· এল· ও·-কে টেররিস্ট সংগঠন বলে সাউথ ওয়েস্ট আফ্রিকান পিপলস্ অরগানাইজেশন (সোয়াপো) তাদের কাছে টেররিস্ট—গত ১৫ বছর ধরে যারা আফ্রিকার মানুষের মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব দিচ্ছে। কে ঠিক? রাষ্ট্রসংঘ? না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রসংঘের ১৫৫টি সদস্য রাষ্ট্রের যৌথ অভিমত? নাকি একলা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাবী?

তাহলে—কু ক্লুকস্ ক্ল্যান, জিউইশ ডিফেন্স লীগ, ওমেগা-৭—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই সংগঠনগুলোর চরিত্র কি মুক্তির প্রতীক? সারা পৃথিবীর লোক এই সংগঠনগুলোর কুখ্যাত মাফিয়া হত্যাকারী চরিত্রের কথা জানেন। ১৯৭৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর, রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার ৩২তম অধিবেশনে স্পষ্ট বলা হলো, "the inalienable right to self-determination and independence of all peoples under colonial and racist regimes and other forms of alien domination....(it) upholds the legitimacy of their struggle, in particular the struggle of national liberation movement."

আধুনিক যুদ্ধের মূল উদ্যোক্তা এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও তাদের বন্ধু দেশগুলোর জোট—ন্যাটো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কায়দা এখন পুরোনো। শান্তির নামে এখন যুদ্ধ বাধায় মার্কিনী প্রশাসন। পৃথিবীর মানুষ এখন শরীর দিয়ে অশান্তি করে যুদ্ধের অবসান চায়। আমরা চাই—শান্তি। যুদ্ধ নয়। শান্তি চাই।

নতুন প্রজন্মের এই উচ্চারণে হাতেখড়ি হোক।

শেষ

তামিলনাড়ু

শ্রীলঙ্কা—ভারতঘেরা ত্রিভুজ

যদিও বর্তমানে শ্রীলঙ্কা সরকার ভালো সাজবার চেষ্টা করছেন, তবুও এটা নিশ্চিত জানা গেছে যে ত্রিঙ্কোমালির বিরাট তেল মজুত রাখবার সুযোগ-সুবিধে এখন একটি মার্কিনী কোম্পানীর দখলে। তামিল নাড়ুতে পাওয়া নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেল, যে কনসোর্সিয়াম ত্রিঙ্কোমালি অয়েল ট্যাঙ্ক ফার্মের লিজ নিয়েছে, সেটি মার্কিনী সংস্থা এবং এইভাবে ভারত মহাসাগরে সবচাইতে ভালো প্রাকৃতিক বন্দরের সুবিধে পেয়ে যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তেলের ব্যাপারটা কেবল ধোঁকা দেবার জন্য। উদ্দেশ্য আসলে ত্রিঙ্কোমালির ভৌগোলিক সংস্থানকে সামরিক কাজে লাগানো।

প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা উল্লেখ করা অসঙ্গত হবে না, 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকার প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায়, শ্রীলঙ্কায় তামিল হত্যার পর প্রধান রচনা 'শ্রীলঙ্কা ভারতঘেরা ত্রিভুজ'-এ আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলাম, 'শ্রীলঙ্কা এখন প্রধানত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের কাছে ঋণে বাঁধা।....১৯৮০ সালের ২৩ জানুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে তার সামরিক উপস্থিতি বাড়াবার কথা ঘোষণা করে। পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়। দিয়েগো গার্সিয়া দ্বীপে ইতিমধ্যেই মার্কিন ঘাঁটি বেশ মজবুত। তাদের চোখ এখন ত্রিঙ্কোমালি বন্দরের দিকে। ত্রিঙ্কোমালি বন্দরের সামরিক গুরুত্বের কথা মনে করে শ্রীলঙ্কার নামকরা ভৌগোলিক এস. এফ. ডি. সিলভা বলেছিলেন, 'ত্রিঙ্কোমালির দখলদার যে হবে, ভারত মহাসাগরের মালিক সেই।' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই তথ্য সম্পর্কে সচেতন বলেই, বছর দুয়েক আগে মার্কিনী ভাইস এ্যাডমিরাল আলবার্ট ট্রস্ট ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে মার্কিনী সশস্ত্র বাহিনীর এ্যাডমিরাল রবার্ট লঙ ত্রিঙ্কোমালি ঘুরে যান। 'ওয়াশিংটন পোস্ট' কাগজে বলা হয়, মার্কিনী নৌবাহিনীর ঘাঁটি হিসেবে ত্রিঙ্কোমালি আদর্শ। ১৯৮২ সালে 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' লেখে, ১৯৮০-৮১ সালের পেন্টাগন রিপোর্ট অনুযায়ী পূর্বতন বৃটিশ নৌবাহিনীর ঘাঁটি ত্রিঙ্কোমালিকে এক আধুনিক কার্যকর ঘাঁটিতে পরিণত করবার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মার্কিনী প্রশাসন মনে করে।' (প্রতিক্ষণ, ১৭ আগস্ট, ১৯৮৩)।

ঠিক ১০ মাস পরে আমাদের এই ভবিষ্যৎবাণী একেবারে আক্ষরিক মিলে যাবে এটা ভাবা যায় নি। ত্রিঙ্কোমালি অয়েল ট্যাঙ্ক ফার্ম, যার নামের আড়ালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ত্রিঙ্কোমালিতে সত্যি ঢুকল, তাদের ১০০ টি বিরাট মজুত ভাণ্ডার আছে ৭০০ একর জমিতে। বৃটিশরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই তেলের ঘাঁটি তৈরি করে এবং এখন অব্যবহৃত হলেও ভারত মহাসাগরে এখন এটি সবচাইতে বড় ঘাঁটি। বারমুডায় অবস্থিত মার্কিনী এক কোম্পানীর নামে এই ঘাঁটি লিজ নেবার নামে মার্কিনী যুক্তরাষ্ট্র ত্রিঙ্কোমালির গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক বন্দর নিজের আওতায় এনে নিল, একেবারে ভারতবর্ষের তলপেটে।

'কোস্টাল করপোরেশন অব বারমুডা' নামে এই কোম্পানী কয়েক বছর আগেও শ্রীলঙ্কাকে এই ত্রিঙ্কোমালির তেলের ঘাঁটি লিজ হিসেবে দিয়ে দেবার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তামিল ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট তখন পার্লামেন্টে আপত্তি তোলে, কোম্পানীর নামে আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই এ বন্দর হাতে নিতে চায়। ফলে কোনো চুক্তি হতে পারে নি। ভবিষ্যতে এই লিজ দেবার বিপদ সম্পর্কে ভারত সরকারও তখন আপত্তি জানান। তখন জোট নিরপেক্ষ ভিত্তিতে এই বন্দরকে কাজে লাগাবার কথা ওঠে। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয় না গত মার্চ মাসে লিজ নেবার কথা উঠছে দেখে ঐ এলাকার সদস্য ও শ্রীলঙ্কা সরকারের কাছে আপত্তি জানিয়েছেন।

এখন জানা গেল, তিনটি কোম্পানী—সিঙ্গাপুরের 'অরোলিউম', সুইটজারল্যাণ্ডের 'ট্রাডিনাফট' ও পশ্চিম জার্মানীর 'অয়েলট্যাঙ্কস' —মিলে গড়া কনসোর্শিয়ামের টেণ্ডারই গৃহীত হয়েছে। ভারতবর্ষও টেণ্ডার দিয়েছিল। সিঙ্গাপুরের কোম্পানীটি ১৯৮২ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুরে রেজিস্ট্রি হয় এবং এক লক্ষ শেয়ার ক্যাপিটালের পুরোটাই বারমুডার 'অরোলিউম' কোম্পানীর। প্রথম এই কোম্পানীর কোনো টেণ্ডারই ছিল না। কিন্তু পরে অন্য একটি মার্কিনী কোম্পানী নিজেদের টেণ্ডার প্রত্যাহার করে নিয়ে এর জায়গা করে দেয়। ফলে বোঝা যাচ্ছে, শ্রীলঙ্কায় গোলমাল না বাধালে এই ঘাঁটি পেতো না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

নিজস্ব প্রতিনিধি

ফলে বোঝা যাচ্ছে, শ্রীলঙ্কায়
গোলমাল না বাধালে
এই ঘাঁটি পেতো না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

কলকাতার আলেকজাণ্ডার চোমা ডি কোরোস

বাসন্তী হাওয়ার এপ্রিল মাস বিদেশী এক ভারত-পথিকের জীবনের তিনটি উজ্জ্বল মুহূর্তকে চিহ্নিত করে রেখেছে। ঠিক দুশো বছর আগের এক এপ্রিল (৪ তারিখ, ১৭৮৪) সুদূর হাঙ্গেরির ট্রানসিলভানিয়ায় তাঁকে পৃথিবীর মুখ দেখিয়েছিলো, অন্য এক এপ্রিল (১১ তারিখ ১৮৪২) তাঁর জীবন পরিক্রমার অন্তে দার্জিলিংয়ের মাটিতে শেষ বিছানাটি পেতে দিয়েছে। মাঝের আর এক এপ্রিল (১৮৩১) তাঁকে প্রথম কলকাতার সঙ্গে পরিচিত করায়। আলেকজাণ্ডার চোমা ডি-কোরোস-এর কাছে এপ্রিল নিষ্ঠুর বড়ো এবং এপ্রিল আলোর দিশারী!

ভাবতে আশ্চর্য লাগে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার বছর সতেরোশ চুরাশি সালটি চোমা ডি কোরোসেরও জন্মের প্রথম শুভক্ষণ। আর সেই এশিয়াটিক সোসাইটির এক গৃহকোণে বছর কয়েক অবস্থান করেই তিনি তাঁর তিব্বতচর্চার ফসল তুলে দিয়েছিলেন ছাপার অক্ষরে সোসাইটির জার্নাল, এশিয়াটিক রিসার্চেস মারফৎ বিশ্ববিদ্যার দরবারে। মাত্র দশটি বছর ছিলেন কলকাতায় এই জ্ঞানের তাপস, হাঙ্গেরির ভাষা ও জাতির উৎস সন্ধানে এক অতৃপ্ত গড়ুর-ক্ষুধা নিয়ে যিনি পর্যটন করেছিলেন পৃথিবীর পথে—ট্রানসিলভানিয়া থেকে বুখারেস্ট, আলেকজান্দ্রিয়া, আলেপ্পো, দামাস্কাস তেহরান হয়ে সেই ১৮২১ সালে। তারপর দক্ষিণে কাবুল, লাহোর, শ্রীনগর ছেড়ে লেহ অঞ্চলে। এক বছর পর লাদাখে এক ইংরেজ পর্যটক জর্জ মুরক্রফটের সঙ্গে দেখা হতেই তাঁর জীবনচর্যার পথও মোড় ঘুরলো। মুরক্রফট তাঁকে তিনশো টাকা দিলেন, বললেন তিব্বতচর্চায় মনোনিবেশ করতে। লাদাখে কয়েকজন বন্ধুর কাছেও চিঠি লিখে ডি কোরোসকে পরিচিত করালেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন তাঁর কাজের জন্য বেশ কিছু বইপত্তর জোগাড় করে দেবেন। চোমা এর বিনিময়ে তিব্বতী ভাষার ব্যাকরণ ও একটি অভিধান সংকলন করে দেবেন বলে কথা হল। চোমার জীবনীকাররা অবশ্য সেই ব্রিটিশ মুরক্রফটের আগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। নিষিদ্ধ দেশ তিব্বতের গোপন খবরাখবর সংগ্রহে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন মুরক্রফট এরকমের একটা ধারণা ছিলো ওই জীবনীলেখকদের। কিন্তু সম্প্রতি দিল্লীর ন্যাশনাল

আর্কাইভসে সংরক্ষিত মুরক্রফট-এর এক তৎকালীন রিপোর্ট (৪৩ সংখ্যক, পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, ১০ অকটোবর ১৮২৩) থেকে বোঝা গিয়েছে, চোমা ডি কোরোসের তিব্বতীশাস্ত্র অধ্যয়নে উৎসাহ দেবার ব্যাপারে এমন কোনো উদ্দেশ্য বোধহয় ছিলো না জর্জ মুরক্রফটের। একথাটি এখানে উল্লেখের কারণ এই যে সেই সংশয়-বিহ্বলতার যুগে চোমা ডি কোরোস সবসময়ে জ্ঞানপিপাসুর আগ্রহ নিয়েই দেশে দেশে ঘুরেছেন এবং জীবনধারণে যে কৃচ্ছ্রতার পরিচয় রেখেছেন তার তুলনা প্রাচীন ভারতের তপোবনচারীদের সহজ সরল দিন যাপনের সঙ্গেই একমাত্র করা যেতে পারে।

আজ পৃথিবীর জ্ঞানীগুণীদের কাছে আলেকজাণ্ডার চোমা ডি কোরোসের পরিচয় 'তিব্বততত্ত্বের পুরোধা পণ্ডিত' হিসেবে। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম পর্বে তাঁর তিব্বতচর্চার ফসল কয়েকটি গ্রন্থ ও বেশ কিছু নিবন্ধে প্রকাশিত হয়েছিলো ১৮৩৪ থেকে ১৮৩৮—এই চার বছরে। ১৮৩৪- এ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশ করে 'গ্রামার অব টিবেটান ল্যাঙ্গোয়েজ ইন ইংলিশ' এবং 'ডিকসনারি টিবেটান অ্যাণ্ড ইংলিশ'। অনেককাল পরে তাঁর 'স্যান্সক্রিট-টিবেটান-ইংলিশ ভোকাবুল্যারি' বা 'মহাব্যুৎপত্তি' গ্রন্থের অনুবাদ ও সম্পাদনা প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালে। এশিয়াটিক সোসাইটির বিভিন্ন পত্রিকায় এই চার বছরে তিনি লিখেছেন তিব্বতের ভৌগোলিক পরিচয় নিয়ে, তিব্বতী চিকিৎসাশাস্ত্রের বিশ্লেষণ, শাক্যমুনির জীবন বিষয়ে তিব্বতী ধারণা, শাক্যপণ্ডিতের সুভাষিত রত্ন-নিধি, বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন রীতিনীতি এমনকি ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের একখানা তিব্বতী পাশপোর্টও তাঁর প্রবন্ধ মালার বিষয়বস্তু হয়েছিলো। তাঁর এইসব লেখা একবার ই. ডি. রস-এর সম্পাদনায় ১৯১১ সালের জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংকলিত হয়েছিলো। খুব সম্ভব, এখনো কোনো গ্রন্থবদ্ধ হয় নি চোমার

আজ পৃথিবীর জ্ঞানীগুণীদের কাছে আলেকজাণ্ডারচোমা ডি কোরোসের পরিচয় 'তিব্বততত্ত্বের পুরোধা পণ্ডিত' হিসেবে। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম পর্বে তাঁর তিব্বতচর্চার ফসল কয়েকটি গ্রন্থ ও বেশ কিছু নিবন্ধে প্রকাশিত হয়েছিলো ১৮৩৪ থেকে ১৮৩৮, এই চার বছরে।

এর এই রচনাবলী।

সে কথা থাক। তার আগে জেনে নেওয়া যাক কবে কেমন করে কলকাতা তথা এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হল চোমা ডি কোরোসের। চোমা তখন ঘুরছেন চরকির মতো এখান থেকে সেখানে। দেশে দেশে নয়া ভাষা শিখে নিচ্ছেন। হাঙ্গেরির ছেলে তেহরানে এসে মাস চারেক থেকে শুধরে নিলেন তাঁর ভাঙা ইংরেজি। তেহরান থেকে ছুটলেন মঙ্গোলিয়ার পথে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে। এশিয়ার পথে নতুন নাম নিলেন 'সেকেন্দার বেগ' নিজের নামের আলেকজাণ্ডার শব্দটিকে এশীয় উচ্চারণে সাজিয়ে নিয়ে। পরে একদিন তিব্বতের মানুষেরা তাঁকে ডেকেছিলো তাঁদেরই দেওয়া আদরের নামে 'ফিরাঙ্গী দাস' বলে। শুধু তাই নয়। আরো অনেকদিন পরে যখন কলকাতা ছেড়ে চোমা উত্তর-পূর্ব বাংলার পথে বেরিয়েছিলেন তখন তাঁর পাসপোর্টে এক ফরাসী নাম নিয়েছিলেন 'মোল্লা এসকান্দার চোমা অ্যাজ মুলক্-ই-রুম'।

লেহ, লাদাখ, জাঙ্গলাতে কিছুকাল কাটিয়ে মুসৌরিতে এলেন চোমা। ইতিমধ্যে কয়েকজন লামার কাছে তিব্বতী বৌদ্ধসাহিত্য পাঠ সেরেছে পিঠের ঝুলিতে পুঁথি পত্তরও জমেছে বিস্তর। শুধু 'খানাপিনা ও নাচাগানার' শৈল শহর মুসৌরির অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ তাঁর ভালো লাগছে না তখন। তাছাড়া পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের কাজকর্মের প্রতি তীক্ষ্ন নজর পড়েছে ব্রিটিশ সরকারের। এহেন সন্দেহের সন্ধিক্ষণে সিমলার পলিটিক্যাল অফিসার ক্যাপ্টেন কেনেড়িকে চিঠি লিখে চোমা বললেন পঞ্চাশ টাকার এক মাসোহারার বন্দোবস্ত করে দিতে যাতে তাঁর তিব্বতের পড়াশুনো চলতে পারে। ১৮২৫- এর জানুয়ারি সেই চিঠির উত্তর এলো মে মাসে ব্রিটিশ রাজধানী কলকাতা থেকে। বোধহয় সেই প্রথম যোগাযোগ হল কলকাতার সঙ্গে চোমা ডি কোরোসের। অবশ্য এ যোগ নিতান্তই পরোক্ষ পরিচয়। ইতিমধ্যে মুরক্রফ্‌ট মারা গিয়েছেন। ক্যাপ্টেন কেনেড়ির সহানুভূতি আছে কিন্তু তিনি তো আর পণ্ডিত নন তাই নিজেই এবার উদ্যোগ নিলেন কলকাতায় এসে একবার ব্রিটিশ সরকারকে বোঝাবেন মাত্র তিন বছরের জন্য তাঁর তিব্বত বাস এবং মাসিক পঞ্চাশ টাকার বৃত্তির বন্দোবস্ত করে দিতে। গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট রাজি হলেন। তারপর তিন বছর কাটিয়ে প্রচুর পুঁথিপুস্তক সংগ্রহ করে ১৮৩১-এর এপ্রিলে কলকাতায় পৌঁছোলেন। ৫ মে রিপোর্ট করলেন ব্রিটিশ সরকারের সচিবের কাছে। তাঁর দীর্ঘ আট বছরের তিব্বতীশাস্ত্র সাধনার ফল নিয়ে একদিন আশ্রয় জুটলো এশিয়াটিক সোসাইটির একখানা ঘরে। সোসাইটির পাঠাগারের মধ্যে তাঁর খুপিটি হয়ে উঠলো যেন আরেকটি গ্রন্থাগার। তার চার দেওয়ালে চারটে কাঠের বাক্‌স, বই-পুঁথিতে ঠাসা। সেই পুঁথিপত্রের কয়েদখানায় চোমা সোসাইটির ক্যাটালগ তৈরি করেন। তিব্বতীগ্রন্থের অনুবাদ করেন, দরকারমতো অভিধানের ছাপার তদারকি করেন তবু সোসাইটি কিংবা সরকারের কাছে একটি পয়সা নেন না।

১৮৩৩ সালে সোসাইটির প্রথম লাইব্রেরিয়ান ডবলিউ এল গিবনস-এর উত্তরাধিকার এসে বর্তালো আলেকজাণ্ডার চোমা ডি কোরোসের হাতে, ইতিমধ্যে জেমস প্রিন্সেপের আগ্রহে ১৮৩৪-এর ৬ ফেব্রুয়ারি এশিয়াটিক সোসাইটির অনারারি মেম্বার করা হয়েছে তাঁকে। বছরখানেক বাদে হাঙ্গেরির লিটারারি সোসাইটির সচিব জানালেন চোমাকে, হাঙ্গেরির এই সুসন্তানের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে গণ চাঁদা তুলে সাহায্য করতে চান। কিন্তু সেই প্রবাদপ্রতিম বুনো রামনাথের মতো একগুঁয়ে পণ্ডিত চোমা দারিদ্র্যকে ভূষণ করে শুধু ম্লান হেসে গেলেন! সেসময় চোমা শিখছেন সংস্কৃত ভাষা। খোঁজ খবর নিচ্ছেন অন্যান্য ভারতীয় ভাষা রপ্ত করা যায় কিভাবে। বাংলাও শিখছেন—কথ্যভাষায়, চেষ্টা করছেন মারাঠী এমনকি মৈথিলীও মাঝে একবার তিব্বতী গ্রন্থ 'তাঞ্জর'-এ ব্যাকরণকার চন্দ্র গোমিন-এর নাম পেয়ে লিখলেন এর নাম থেকেই চন্দননগরের উৎপত্তি। তারপরই একদিন ইচ্ছে হল জ্ঞানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়বেন উত্তর-পুব বাঙলার গাঁয়ের পথে। মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে! গঙ্গায় নৌকা ভাসিয়ে পৌঁছোলেন মালদহের ঘাটে। সেদিন ১৮৩৬-এর ২০শে জানুয়ারি। মালদা থেকে লেখা এক চিঠিতে বিখ্যাত লিপিবিশারদ ও এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারি জেমস প্রিনসেপকে জানালেন, কেমন করে মাঝি ও অন্যান্যদের তিনি পয়সা মেটাচ্ছেন সরল বিশ্বাসে। তারপর আবার এক ছোট নৌকা ভাড়া করে পাড়ি দেবেন কিষাণগঞ্জের পথে। অবশেষে একদিন সিকিম রাজের দর্শনপ্রার্থী হবেন। সেখানে অধীত বিদ্যার কথা লিখে জানাবেন পরে প্রিনসেপকে। বছরখানেক পর আবার পড়াশুনোর ডাকে তিনি ফিরে এলেন এশিয়াটিক সোসাইটির পুরোনো ঘরে। চারধারে বইয়ের দেওয়াল, মাঝে একখানা মাদুর পাতা, সেখানেই বসা, শোয়া, কাজ করা। বেড়ানো মানে লাইব্রেরির করিডোরে কয়েকবার পায়চারি। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, অদ্ভুত সব চিন্তার জালে মগ্ন হয়ে, কখনো নিজের ভাবনায় ও ভাবে স্মিতহাস্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠে, একাগ্রীব্রাহ্মণের মতো লেখার ডেস্কে নুয়ে চোমা ডি কোরোস নকল করে যাচ্ছেন সংস্কৃতের পুঁথি। ধীরে ধীরে পাঁচটি বছর কেটে গেল, তিব্বতী ভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ এবং অন্যান্য প্রবন্ধাবলী রচনার কাজ শেষ হয়েছে। হাঙ্গেরির সেই জ্ঞানতপস্বীর মনের মধ্যে আবার উথলে উঠলো সেই জিজ্ঞাসা যা বুকে করে ট্রানসিলভানিয়ার কোরোস গ্রামের মানুষটি পৃথিবীর পথ পরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন একদিন। ওঁর ধারণা ছিলো হাঙ্গেরীয় জাতির উৎপত্তি হয়েছিলো এই এশিয়ায়, হয়ত তিব্বতে। তাই হাঙ্গেরীয় ভাষা ও সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন আবার এই আটান্ন বছরের পাণ্ডিত্যের রাজ্যে স্বেচ্ছানির্বাসিত মানুষটি। ১৮৪২-এর ৯ ফেব্রুয়ারি এশিয়াটিক সোসাইটির কাছে বিদায় বাণীতে জানালেন তাঁর কৃতজ্ঞতার কথা, তাঁর রচনাপঞ্জী সোসাইটির করকমলে রেখে যাওয়ার কথা, তারপর লিখলেন মন এখন চললো

মধ্য এশিয়ার পথে। এবার গঙ্গার উজান বেয়ে, উত্তর-পূর্ব বাঙলার তরাই ছুঁয়ে ২৪ মার্চ পৌঁছলেন হিমালয়ের কোলে দার্জিলিংয়ে। সিকিম রাজের সহায়তায় লাসার পথে পাড়ি দেবেন ভেবে দিন কাটাচ্ছেন দার্জিলিংয়ে। হঠাৎ ৬ এপ্রিল জ্বরের প্রকোপে দেহ উঠলো তেতে। দার্জিলিংয়ের সুপারিনটেনডেন্ট এ. ক্যাম্বেল সাহেব দেখতে এলেন। জ্বরে ধুঁকছেন, জিভে বেশ ময়লা, দেহের চামড়া শুকিয়ে টানটান, মাথা ধরে আছে। ওষুধ এনে দিতে চাইলে বললেন এসব ছাড়াই তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। ক্যাম্বেল-এর রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে সাত তারিখে একটু ভালো বোধ করলেও চোমাকে তিনি আবারো ওষুধ খেতে বললেন। হাঙ্গেরীয় অগ্নিশিখা হাস্যমুখে অদৃষ্টকে পরিহাস করলেন শুধু! ন'তারিখ ডাক্তার গ্রিফিথকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন ক্যাম্বেল সাহেব। জ্বর আবার এসেছে, হতবিহ্বল চেহারা, ভুল বকছেন, মুখচোখ বসে গিয়ে হলদে হয়ে গিয়েছে শরীর! ভয় করতে লাগলো। অনেক কষ্টে একটু ওষুধ খাওয়ানো হল। কপালের দুপাটিতে মালিশ করা হল। দশ তারিখ একটু ভালো কিন্তু কথাবার্তা অসংলগ্ন অস্পষ্ট, সন্ধ্যের দিকে জ্ঞান হারিয়ে গেল। পরদিন ভোর পাঁচটায় সব শেষ! বারো তারিখ সকাল আটটায় দার্জিলিংয়ের কবরখানায় সমাহিত করা হল আলেকজাণ্ডার চোমা ডি কোরোসের মরদেহ। কয়েকজন ইংরেজের জমায়েতে শেষ মন্ত্র পড়লেন ক্যাম্বেল সাহেব। এশিয়াটিক সোসাইটির কাছে শেষযাত্রার বিবরণী দিতে গিয়ে ক্যাম্বেল আরো জানিয়েছিলেন— তাঁর ফেলে যাওয়া সম্পত্তির মধ্যে চার বাকস বই, নীলরঙের একটি স্যুট, কয়েকটি জামা আর একটি ভাত ফোটাবার হাঁড়ি। তাঁর খাদ্য বা পানীয় বলতে একটু চা যা খেতে তিনি খুব ভালোবাসতেন, আর সাদামাটা সেদ্ধভাত যা তিনি খুব কমই খেতেন। একখানা মাদুর বিছিয়ে চারদিকে বাক্স ভর্তি পুঁথিপত্র নিয়ে তিনি ওখানেই বসতেন, খেতেন, ঘুমোতেন আর পড়াশোনা করতেন। রাতে পোশাক ছাড়তেন না, দিনে বাইরে যেতেনও না, কোনোদিন মদ স্পর্শ করেন নি কিংবা তামাক বা অন্য কোনো মাদকও ছুঁয়ে দেখেন নি। বিশ্বাস হয় না ইনি কি কোনো ইউরোপীয় মানুষ? না প্রাচীন ভারতের সনাতনী শিক্ষায় লালিত পালিত কোনো টুলো পণ্ডিত। দার্জিলিংয়ের শীতল পাথরের কবরে কতদূর থেকে ঘুমোতে এলেন এই জ্ঞানের তীর্থপথিক!

দার্জিলিং কিংবা কলকাতায় চোমা ডি কোরোসের দুটি স্মৃতি আছে। একটি তাঁর সমাধিফলক। সেখানে লেখা চোমা স্যাণ্ডোর-এর দুই মনুমেন্ট—একটি ব্যাকরণ অন্যটি অভিধান। কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির পুরোনো বাড়ির ভেতর বারান্দায় তাঁর ব্রোঞ্জ মূর্তি। ১৯০৯ সালে জনৈক শিল্পী বি· হোলো-র তৈরি পাথরের আসল মূর্তিটি আছে হাঙ্গেরির অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস-এ। তারই এক ব্রোঞ্জ কপি সোসাইটিকে তৈরি করে পাঠিয়েছিলো হাঙ্গেরিয়ান অ্যাকাডেমিক অব সায়েন্সেস সম্ভবত ১৯১২ সালের মাঝামাঝি সময়ে। সে বছর জুলাইয়ের মডার্ন রিভিউ লিখেছিলো—'এ ম্যাগনিফিসেন্ট ওয়ার্ক অব আর্ট, ওয়েল ওয়ার্দি টু র‍্যাঙ্ক উইথ দি নিউমারাস ট্রেজারস হুইচ দ্য সোসাইটি পজেজেস।' চোমার চিন্তাশীল মুখের পাশে ডান হাতে পালকের কলম ধরা, বাঁ হাতে একটি পুঁথি। ভালো করে দেখে এসেছি সেটি এক চিত্রিত তিব্বতী পুঁথি। □

শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী

বিহার

অবিচার, অত্যাচার, সুবিচার

সুগিয়া মাঝিয়া ও তাঁর ননদ মাইকে মাঝিয়াকে হাজারিবাগের এচক পুলিশ থানার অধীনে সেমরাডেভ গ্রামের দুজন অরণ্যরক্ষী তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে মার্চ মাসের ২৩ তারিখে। এতোদিন এই সংবাদটি অজানা ছিল। সম্প্রতি জানা গেছে। সেদিন এই দুই আদিবাসী মহিলা বিকেলের পর তাঁদের কুঁড়েতে বসেছিলেন। এমন সময় ঐ দুই অরণ্য রক্ষী প্রবেশ করে। টেনে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি জিপে তুলে কাছের জঙ্গলে এই দুই মহিলাকে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁরা সেখানে ধর্ষিত ও প্রহৃত হন। অনেক রাতে তাঁরা হেঁটে বাড়ি ফিরে আসেন।

মাইকো মেঝেন ও সুগিয়া মেঝেন

গ্রামের মুখিয়ার সঙ্গে তাঁরা হাজারিবাগে গিয়ে পুলিশের ডেপুটি সুপারের সঙ্গে দেখা করেন।

ডেপুটি সুপার বলেন সদর থানাতে যেন অভিযোগ দায়ের করা হয় এবং ঐ দুই মহিলাকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসাগত পরীক্ষা করবার প্রস্তাব দেন। সদর থানার কর্তৃপক্ষ তাঁদের অন্য একটি থানায় পাঠায় এবং সেখানেই শেষ পর্যন্ত তাঁরা অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। ২৪ মার্চ সন্ধ্যেবেলা ঐ দুই মহিলাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁদের ভর্তি করা হলেও কোনো রকম চিকিৎসা তাঁরা পান নি, পরীক্ষাও না। দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করবার কোনো উদ্যোগও এর ভেতর দেখা যায় নি। বনবিভাগের বড়কর্তারা এই কেসটিকে যথারীতি ধামাচাপা দিতে চাইছেন। মাইকে এবং সুগিয়া যথারীতি এই সামাজিক উদাসীনতার নিরুপায় বলি।

মোতিহারি জেলেও এরকম একটি ঘটনা হয়েছে। মোকিমা খাতুন বলে

দুই আদিবাসী মহিলা বিকেলের পর তাঁদের কুঁড়েতে বসেছিলেন। এমন সময় ঐ দুই অরণ্য-রক্ষী প্রবেশ করে। টেনে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি জিপে কাছের জঙ্গলে এই দুই মহিলাকে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁরা সেখানে ধর্ষিত ও প্রহৃত হন। অনেক রাতে তাঁরা হেঁটে বাড়ি ফিরে আসেন।

একজন বিচারাধীন বন্দীকে সংঘবদ্ধভাবে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। ২৫ মার্চ রাত্রে খাবার পর মোকিমা তার সেলে গিয়ে ঢোকে। পরের দিন সকালে তাকে মৃত অবস্থায় দেখা যায়। স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে—এই মর্মে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট দেবার জন্য ডাক্তারদের চাপ দিলেও তাঁরা নতি স্বীকার করেন নি। সংবাদ পাবার পর সেখানকার ডি. এম. ও এস. পি-কে চাপ দিয়ে দ্বিতীয়বার তিনজন ডাক্তারকে দিয়ে পোস্টমর্টেম করাবার ব্যবস্থা হয়। দ্বিতীয়বার প্রমাণিত হলো, মোকিমাকে হত্যা করা হয়েছে। অন্যান্য বন্দীর মতে মোকিমাকে সংঘবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে তারপর খুন করা হয়েছিল।

যেমন দক্ষিণ বিহারে নালন্দা-মুঙ্গের সীমান্তে চামার ও বেলদারদের ছোট গ্রাম বাবুবিঘায় ঘটছে। আশেপাশের সম্ভ্রান্ত রায়তদের বহুকাল ধরে এরা সস্তায় শ্রমিক যোগান দিয়ে আসছে। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত পরিশ্রম করেও তাঁদের দুবেলা খাওয়া জোটে না, কারণ জোতদার যে টাকা দেয়, তাঁরা সেটাই নেন। জানেনও না যে ন্যূনতম মজুরি পাবার জন্য সরকারের একটা আইনও আছে। তাঁরা গান গেয়েও উপার্জন করেন কিছু। সেটা উৎসবের সময়। কিন্তু তাঁদের শ্রমের মতো তাঁদের গানটাও সস্তারই। কিন্তু এই অচেতন সম্প্রদায়ের ওপর এই অমানবিক অবিচারের প্রথম প্রতিবাদ আসে রামপিরত দাসের কাছ থেকে। তিনিই প্রথম লেখাপড়া জানা লোক ওঁদের মধ্যে।

রামপিরত অন্যান্য সকলকে ডেকে জানান, যে-ন্যূনতম মজুরি পাবার কথা তাঁদের কাউকেই সেই মজুরি দেওয়া হয় না। এ ব্যাপারে রামপিরতের কথায় সবাই প্রতিবাদ জানাবার সিদ্ধান্ত নেন। সুযোগও এসে যায়। পাশের গ্রামের একজন কুখ্যাত জোতদার বিয়ে উপলক্ষে বাবুবিঘার ব্যাণ্ড পার্টি ঠিক করতে আসে। জোতদারকে খুশি করবার জন্যই ওরা এতদিন গান গেয়ে এসেছে। এবার টাকা চেয়ে বসল। জোতদার ধমকে শাসিয়ে গেলেন যে, ওদের উনি জীবনের মতো শিক্ষা দেবেন।

এই ঘটনা প্রায় ন'মাস আগের। গ্রামবাসীদের অজান্তে গত বছর জুন মাসে সেই জোতদারের ভাড়া করা গুণ্ডা গ্রামে ঢোকে রাত্রিবেলা। ১৪ বছরের পার্বতী কুমারী জানালো, 'কুঁড়ের বাইরে আমরা শুয়েছিলাম, যখন গুণ্ডারা গ্রামে ঢোকে। প্রথমে বোম ছুঁড়ে সবাইকে ভয় পাইয়ে দেওয়া হলো। আমার ওপরে একটি টর্চের আলো পড়ে। আমি আঁৎকে উঠতেই গুণ্ডারা আমার জামাকাপড় ছিঁড়তে থাকে। তারপর কি হয় জানি না। জ্ঞান হতে দেখি আমি হাসপাতালে।' নির্বিচারে চলে অত্যাচার আর ধর্ষণ। ন'মাস বাদেও সেই রাতের আতঙ্ক কেউ ভোলেন নি। পার্বতীর বাবা পিয়ারিলাল দাশ বললেন, 'পার্বতীর বিয়ের কথা পাকা ছিল। এখন কে তাকে বিয়ে করবে?'

সারমেরা পুলিশ স্টেশনে দায়ের করা মামলায় ধর্ষণের কোনো কথাই নেই। কর্তৃপক্ষের সজাগ পাহারায় পাটনা বা বিহারশরীফের কোনো সাংবাদিক এই খবর পান নি। কিন্তু গ্রামবাসীরা ক্ষান্ত হন নি। শেষে এই খবর বেরিয়েও পড়ল। নতুন দিল্লির ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল ইনস্টিট্যুটের ডঃ জোসে কানানাইকাল হরিজনদের ওপর ধর্ষণ ও অত্যাচারের জন্য মামলা দায়ের অস্বীকার করায় সংবিধানের ১৪, ১০(১) (এ) এবং ২১ ধারা লঙ্ঘিত হ[…] দায়ের করেন সু[…] নালন্দার জেলা জজ[…] রিপোর্ট দেবার আ[…] কোর্ট। সেই রিপোর্[…] ও অত্যাচারের অভি[…] হয়েছে।

রিট আবেদনে […] জোতদারদের অত্যা[…] তাঁদের পরিশ্রমের বি[…] মজুরিও না দেওয়ার […] সুপ্রীম কোর্ট এঁদের […] এগিয়ে এসেছেন। বি[…] জমি দিতে বলেছেন […] ১১, ১৯৮৪-তে বিহ[…] উকিল গোবর্ধন বলেন, জমি দেওয়া হয়েছে। […] মাসে যাঁরা অত্যাচার […] তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থ[…] বলে জানানো হয়। রা[…] 'কানানাইকাল ছাড়[…] কোনোদিনও সুবিচার […] কানানাইকাল কিভা[…] হলেন? সেটা কেউ […] হয়তো দিল্লিতে কারও […] তিনি উদ্বুদ্ধ হয়ে থাক[…]

নিজস্ব প্রতিনিধি

কলানবগ্রামের শিক্ষানিকেতন

'বর্তমানে শিক্ষা-নিকেতনের মর্মস্থলে আঘাত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শিক্ষা-নিকেতনের সমস্ত উন্নয়ন-কর্মের কেন্দ্র উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য পৃথক পরিচালক-সমিতি গঠন করিবার চেষ্টা হইতেছে।'

বর্ধমানের কলানবগ্রামে 'শিক্ষা-নিকেতন' নামের যে প্রতিষ্ঠানটি গত তিরিশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে, সেখানে বর্তমানে একটি জটিল সমস্যার সূত্রপাত হতে চলেছে। এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, এখন একমাত্র জীবিত প্রতিষ্ঠাতা নব্বই বৎসর বয়সী বিজয় কুমার ভট্টাচার্য আগামী ১৫ই মে, ১৯৮৪ থেকে আমরণ অনশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁর প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য এবং অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনে।

বিজয় কুমার ভট্টাচার্যকে যাঁরা জানেন, তাঁরা জানেন এই সিদ্ধান্ত অসার কোনো হুমকি মাত্র নয়। আজীবন গান্ধীবাদী, আদর্শনিষ্ঠ, কর্মবীর এই মানুষটি নিজগুণেই দলমতনির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধাভাজন। কলানবগ্রামের 'শিক্ষা-নিকেতন' পশ্চিমবঙ্গের বুনিয়াদী শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। স্বেচ্ছাসেবার আদর্শে, স্থানীয় জনসাধারণের দরিদ্রতম অংশকে সঙ্গে নিয়ে, গত তিরিশ বছরে শিক্ষা নিকেতন ঐ অঞ্চলের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে অবিচ্ছেদ্যভাবে। সব বৃদ্ধিরই যেমন সমস্যা থাকে, তেমন সমস্যাই বর্তমান সংগঠনকে যখন নিয়ে চলেছে প্রায় অচল অবস্থার দিকে, তখনই বিজয়বাবু সংকল্প নিলেন জীবনের বিনিময়েও প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষা করবার।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এবং রাজ্যের শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষাব্রতী মানুষের কাছে খোলা চিঠিতে আবেদন জানিয়ে তিনি বলেছেন, বয়সের ভারে

বাইরের শক্তি যখন স্তিমিত, তখন অন্তরের শক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষা করার চেষ্টা তাঁর নৈতিক দায়িত্ব।

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছে তাঁর আবেদনে বিজয়বাবু বলেছেন, 'গণতান্ত্রিক দেশে স্বেচ্ছাসেবী সেবা-প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছামতো সেবার কাজ করিবার স্বাধীনতা থাকা উচিত। সে সেবার পথ যদি সরকারের নির্দিষ্ট পথ হইতে ভিন্ন হয় তাহা হইলেও সরকারের তাহাতে বাধা দেওয়া উচিত নয়।'

এই অনশনের সং[…] বিজয় কুমার ভট্টাচার্যকে […] না পারার অর্থ একটি আ[…] তাঁর আজীবন সাধনা[…] আমরা তাঁকে এই উপ[…] করতে পারি না। সমস্ত […] মানুষের কর্তব্যবোধ এ[…] একটি সত্বর সমাধানই […] করবে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষ[…] পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত কর[…] সরকারের চেষ্টা সম্প[…] অবহিত। সম্প্রতিকালে, […] মিশন পরিচালনভার গ্র[…] মুখ্যমন্ত্রীর সহিষ্ণু মনোভা[…] এই প্রসঙ্গে স্মরণ করব। […] ব্যক্তিগত নিষ্ঠা এবং […] সততার অনুরাগী ঐ […] কমিউনিস্ট নেতা বিনয় চৌ[…] আমরা তাই সরকারকে […] জানাব অধিগ্রহণের সিদ্ধ[…] রেখে, ব্যাপারটিকে এখুনি […] স্তরে নিয়ে যেতে এবং […] একটি সমাধান খুঁজে বের […]

নিজস্ব প্রতিনিধি

কল্যাণ নন্দী

ভারতীয় এভারেস্ট অভিযান ১৯৮৪

নভশ্চর রাকেশ শর্মা যখন পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিলেন, সেই সময় কুড়ি সদস্যের এক দুরন্ত ভারতীয় পর্বত অভিযাত্রী দল সমতল ছাড়িয়ে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গের দিকে গুটি গুটি পায়ে এগোচ্ছিলেন। দুটোই দুঃসাহসিক অভিযান। একটা যানে চেপে আর একটা পায়ে হেঁটে।

মহাকাশ থেকে রাকেশের ক্যামেরা বেশ কয়েকবার ভারতের ওপর চোখ বুলিয়েছে। বিশেষ করে হিমালয়ের ওপর। তাতেও ধরা আছে ভারতীয়রা ধীর পদক্ষেপে শিখর অভিমুখে উঠছেন।

এই এভারেস্ট অভিযান বিভিন্ন দিক থেকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে এটাই প্রথম অসামরিক প্রচেষ্টা। এটাই প্রথম সামরিক বাহিনী ও সাধারণ পর্বতারোহীর মিলিত অভিযান এই প্রথম ভারতীয় মহিলারা এভারেস্ট অভিযানে সামিল হলেন। কুড়ি সদস্যের এই অভিযাত্রী দলে সাত জন মহিলার মধ্যে আছেন চন্দ্রপ্রভা অটওয়াল, রিতা গম্বু, রেখা শর্মা, হর্ষবন্তী বিস্ত, বেচিন্দ্রি পাল, সারাবতী প্রভু, মীনা আগরওয়াল। এই অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন হিমালয়ান মাউন্টিনীয়ারিং ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপল দর্শন কুমার খুল্লার। আর ডেপুটি লীডার লে: ক: প্রেমচাঁদ।

এ লেখা লেখার সময় ভারতীয় মাউন্টিনীয়ারিং ফাউণ্ডেশন আয়োজিত প্রথম এভারেস্ট অভিযানের পর্বতারোহীরা বীরবিক্রমে লোৎসের প্রান্তদেশে তৃতীয় শিবির স্থাপন করে সাউথ কলে চতুর্থ শিবির স্থাপনের তোড়জোড় শুরু করেছিলেন। কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুন ঐ শিবির স্থাপন সম্ভব হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দক্ষিণ কলের চতুর্থ শিবির থেকেই সাধারণত অভিযাত্রীরা শিখর আরোহণের উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত যাত্রা শুরু করে থাকেন। সফল এভারেস্ট যাত্রায় যে ক'টি কঠিন ধাপ পরপর পেরতে হয় তা হচ্ছে—খুম্বু আইস কল, পশ্চিমপ্রান্ত, লোৎসে দিক, দক্ষিণ কল, দক্ষিণ শিখর ও মূল শিখর। ভারতীয়রা অনেকটাই এগিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমাগত আবহাওয়া খারাপ হওয়াতে দলনেতার নির্দেশে দলের দুই সদস্য তৃতীয় শিবির থেকে দ্বিতীয় শিবিরে নেমে এসেছেন। দলের অন্য সকলে প্রথম ও মূল শিবিরে অনুকূল আবহাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন।

এই অভিযানকে সফল করার জন্যে প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকে। প্রায় দু'বছর ধরে তিনটি প্রাক-এভারেস্ট অভিযানের মাধ্যমে ঝাড়াই বাছাই চলে। প্রথম স্তরে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে সিকিমের 'কাব্রুডোম' ও গঙ্গোত্রী অঞ্চলের 'গঙ্গোত্রী' শিখর অভিযান হয়। দ্বিতীয় স্তরে ৮৩-র সেপ্টেম্বরে 'মানা' শিখর অভিযান হয়। এই দুই পরীক্ষার পর সত্তর জন থেকে উনিশ জনকে ছেঁকে তোলা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কয়েকজন বাঙালী থাকলেও শেষ উনিশে একজনও স্থান পাননি। ব্যাপারটি আক্ষেপের। অনেকের মতেই, প্রাথমিক পর্যায়ে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েও অন্তত একজনের সুযোগ না পাওয়াটা নাকি সত্যিই আশ্চর্যের!

ভারতীয় অভিযাত্রীরা সফল

হবেন—এ আশা আমাদের আছে। এই ফাঁকে আমরা এভারেস্টের অতীতকে একটু দেখে নিই। আমাদের জানা আছে, ১৮৫২ সালে রাধানাথ শিকদারের গণনা থেকেই আবিষ্কৃত হয় পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান পূর্ব নেপাল হিমালয়ে। এবং আবিষ্কৃত এই ১৫নং শৃঙ্গের নামকরণ হয় সার্ভেয়ার জেনারেল জর্জ এভারেস্টের নাম অনুসারে। পরে অবশ্য ঐ শৃঙ্গের স্থানীয় নামও জানা যায়। তিব্বতী ভাষায়—চোমোলুঙমা। নেপালী ভাষায়—সাগরমাথা। চীনা ভাষায়—কোমোলুঙমা বা যোলমোলুঙমা। আর এখন সারা বিশ্ব যাকে থার্ড পোল বলেই জানে।

দক্ষিণ কল ধার ধরেই অধিকাংশ অভিযাত্রীদল এভারেস্টে উঠেছেন। অথচ প্রথম এভারেস্ট অভিযান শুরু হয়েছিল উত্তর কল ধার ধরে অর্থাৎ তিব্বতের দিক দিয়ে। ১৮৯৩ সালে প্রথম এভারেস্ট অভিযানের পরিকল্পনা হয়েছিল। তখন নেপাল বা তিব্বত কোন দিক দিয়েই যাওয়ার অনুমতি ছিল না। ১৯২১ সালে দলাই লামার অনুমতি নিয়ে প্রথম বৃটিশ অভিযান হয়। দ্বিতীয় হয় ১৯২২ সালে। তারপর হয় ১৯২৪-র সেই রোমাঞ্চকর অভিযান। সে অভিযানের দুই সদস্য জর্জ ম্যালরি ও অ্যাণ্ড্রু ইরভিন, আঠাশ হাজার ফুটের ওপর থেকে হারিয়ে যান। সে কথায় পরে আসছি। দলাই লামা এরপর তিব্বত হিমালয়ের ধ্যানগম্ভীর পরিবেশকে বার বার বিরক্ত করার জন্যে আট বছর পথ বন্ধ করে দেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কিছুদিন অভিযান বন্ধ ছিল। ১৯৫০ সালে নেপালের পথ উন্মুক্ত হয়। এরপরই আসে ১৯৫৩-র বহু আকাঙ্খিত দিনটি। ২৯ মে সকাল ১১-৩০ মি: পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচুতে উঠে প্রথম নিঃশ্বাস নেওয়ার সৌভাগ্য লাভকরেন হিলারি আর তেনজিং।

প্রথম ভারতীয় অভিযান হয় ১৯৬০ সালে। সেবার প্রবল তুষার ঝঞ্ঝার কবলে পড়ে মাত্র ৭০০ ফুট বাকি থাকতে নেমে আসতে হয়েছিল। ১৯৬২-র দ্বিতীয় অভিযানে চূড়োর নাগাল পেতে যখন দরকার আর মাত্র ৪০০ ফুট তখন প্রকৃতি বাদ সাধল। ভারতীয়রা সাফল্যের মুখ দেখে তৃতীয় বারে ১৯৬৫তে। দলের ন'জন সদস্য শীর্ষে ওঠেন।

এভারেস্ট অভিযানের ইতিহাসে ১৯৭৫ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম মহিলা জাপানের জুঙ্কু তাবেই ঐ বছর শীর্ষে ওঠেন। নর্থ কল দিয়ে ওঠেন চীনা দল। আর দক্ষিণ পশ্চিম দিক দিয়ে প্রথম সফল হন ক্রিশ বনিংটনের দল। এভারেস্টে ওঠার পঁচিশ বছর পূর্তিতে অস্ট্রিয়ার অভিযানে রেনহোল্ড মেসনার ও পিটার হেবলার বিনা অক্সিজেনেই ওঠেন। অবশ্য এর আগে ১৯২৪-র সেই অভিযানে নরটন ও হাওয়ার্ড সোমারভেল বিনা অক্সিজেনে ২৮,১২৬ ফুট উঠেছিলেন। এই মেসনার ১৯৮০তে এককভাবে ওঠেন। চমকের পর চমক।

এতদিন বসন্ত আর শরতেই অভিযান হোত। ১৯৮০-র ফেব্রুয়ারিতে অর্থাৎ ঘোর শীতে পোলিস দল শৃঙ্গে উঠলেন। এরপর আসে আরো বড় চমক। ১৯৮০তে তিব্বতের দিক দিয়ে অভিযানের সময় জাপানীরা ঘোষণা করলেন, চীনা পর্বতারোহী ওয়াঙ হুয়াঙ পাওর দেখা জনৈক ইংরেজের মৃতদেহ খোঁজার চেষ্টা হবে। তখন সারা বিশ্ব কৌতূহলী হয়ে উঠল। ৫৬ বছর আগের সেই ম্যালরি-ইরভিনের হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা আবার নড়ে চড়ে উঠল। কোন কোন মহলের বিশ্বাস, শীর্ষে আরোহণ করার পর দুর্ঘটনাটি ঘটে। তাই ওদের দেহ সমেত ক্যামেরা যদি অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়, তবে সেই ফিল্মই প্রমাণ করবে, এভারেস্ট অভিযানের ইতিহাস নতুন ভাবে লেখা হবে কি না! জাপানীদের সেই অভিযান সফল হয়েছিল। কিন্তু এভারেস্ট অভিযানের ইতিহাস নতুন ভাবে লেখা হয়নি। সেই অভিযানের তিনজন চীনা অভিযাত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ১৯২৪-র রহস্য আবার অতল গহ্বরে তলিয়ে যায়।

ইতিহাস রেখে আবার ভারতীয় অভিযানের কথায় ফিরে আসি। অভিযান চলাকালীন যাতে প্রতিটি সদস্যের শরীর ও মন সুস্থ থাকে সেই দিকে দৃষ্টি রেখে যথেষ্ট সময় হাতে নিয়ে এই অভিযান শুরু হয়। প্রত্যেক সদস্যই যাতে হিমালয়ের ঐ অঞ্চলের আবহাওয়ার সঙ্গে নিবিড়ভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন, তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বেস ক্যাম্পে পাথরের ও বরফের খাড়াই দেওয়ালে ওঠা-নামার মাধ্যমে পর্যাপ্ত অনুশীলন চলে। এই অভিযানের শুরুতে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, ৩০ এপ্রিলের মধ্যে চুড়োয় উঠতে হবে। এর আগে এপ্রিল মাসে অন্য কোন পর্বতঅভিযাত্রী দল শিখরে ওঠেননি। বিধি বাম দিকে না হেললে ভারতীয়রা এই এপ্রিলে উঠেই এক নতুন নজির সৃষ্টি করতে পারতেন। ভারতীয়দের হাতে এখনও একমাস সময় আছে। আবহাওয়া একেবারে অনিশ্চিত না হলে নিশ্চিত লক্ষ্যে পৌঁছতে এই সময় যথেষ্ট। ভারতীয়রা ইতিমধ্যে ৭,৩২০ মিটার (তৃতীয় শিবির) উঠেছেন। এভারেস্টের শিখরে উঠতে তাঁদের উঠতে হবে মোট ৮,৮৪৮ মি:। দক্ষিণ-পূর্ব গিরিশিরা ধরে যাওয়ার পথে দক্ষিণ কলে শিবির স্থাপন বেশ দুরূহ ব্যাপার। সেখানে প্রতিনিয়তই তুষার ঝঞ্ঝা ও হিমানী সম্প্রপাতের ধকল সইতে হয়। ভারতীয়রা আপাতত এইখানে বাধা পেয়েছেন। প্রকৃতি কিছুটা শান্ত না হলে এই বাধা টপকানো সহজ নয়। অযথা সাহস দেখানোর অর্থ যেচে মৃত্যু ডেকে আনা।

বেস ক্যাম্পে একজন শেরপার মৃত্যুর ফলে স্বভাবতই অভিযাত্রীদের বাড়তি সাবধানতা নিতে হচ্ছে। এ পর্যন্ত মাত্র চারজন মহিলা পর্বত অভিযাত্রী পৃথিবীর সর্বোচ্চ জমিতে দাঁড়াবার সাহস দেখিয়েছেন। তাই এই অভিযানের অন্যতম লক্ষ্য ভারতীয় মহিলা অভিযাত্রীদের শৃঙ্গে তোলা।

এ পর্যন্ত যে খবর এসেছে, তাতে জানা গেছে, মহিলারা ভালই উঠছেন। তিনজন দ্বিতীয় শিবির পর্যন্ত উঠে আবার দলনেতার নির্দেশে প্রথম শিবিরে নেমে এসেছেন। এই অভিযাত্রী দলকে অবশ্যই মে-র মধ্যে অভিযান শেষ করতে হবে। হিমালয়ে সাধারণত বর্ষা শুরু হয় জুনের প্রথম সপ্তাহেই। বর্ষা শুরু হয়ে গেলে অভিযান চালানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই ভারতীয়রা একটু চিন্তায় আছেন। তবে এই সাময়িক বাধা অবশ্যই কাটিয়ে উঠবেন।

ভারতীয়রা চিন্তা মুক্ত হোন আর অভিযান সফল করে ফিরে আসুন—সমতলে বসে এ ছাড়া আর কিই বা আমরা কামনা করতে পারি।

কমপক্ষে চারটি সন্তান, নইলে ছাঁটাই

আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞদের প্রধান সমস্যা, জনসংখ্যার বিস্ফার কিভাবে কমানো যায়। এ নিয়ে তর্কও চলছে—জনসংখ্যাই আসল সংকট, নাকি জনসংখ্যাকে উৎপাদন-মুখী কাজে লাগাতে না পারার ব্যর্থতাই দায়ী। পৃথিবীর সব দেশের সমস্যা কিন্তু জনবিস্ফার নয়। যেমন রুমানিয়ায়। সেখানে জনসংখ্যা ক্রমাগত কমে আসছে। তাই সরকার এখন মহিলা শ্রমিকদের মাসে একবার করে রক্ত পরীক্ষা করবেন। দেখা গেল ৭·৪৩ লক্ষ গর্ভবতী মহিলার মধ্যে মাত্র ৪০ শতাংশ সন্তানের জননী হয়েছেন। বাকীদের গর্ভপাত হয়ে যাওয়ায় সরকার উদ্বিগ্ন। এখন বিবাহিতাদের প্রত্যেককে ৪ সন্তানের জননী হতেই হবে। নইলে ছাঁটাই।

—সানডে অবজারভার

আড়িপাতার সুযোগ চাই

টেলিফোনে আড়িপাতা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক বার বিতর্ক হয়েছে। স্বাধীন দেশ বললেও ঐ দেশের সাধারণ নাগরিকরা সবসময়েই কড়া নজরে থাকেন, যাতে হঠাৎ অন্যরকম হাওয়া ঢুকে না যায়। মার্কিনী ইনফরমেশন এজেন্সির প্রধান চার্লস উইকের স্বভাবই, বড় বড় রাজনৈতিক নেতার টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে কথা হলেই তা 'ট্যাপ' করা। এ নিয়ে গোলমাল হলে কংগ্রেসে এ ধরনের কাজ বন্ধ করার কথা ওঠে। রিপাবলিকান দল এই আইনী সংশোধন বাতিল করে দেন। সংশোধন হলে গোয়েন্দাগিরির প্রধান উপায়ই তো বন্ধ হয়ে যাবে!

—নিউ টাইমস

পিনোশেটের বিলাস

চিলির সামরিক জুন্টার নেতা, জেনারেল পিনোশেট, এক অদ্ভুত বাড়ি তৈরি করছেন। বাড়িটা ছ'তলা হবে। দুর্গের মতো। এই দালানের ওপরতলাটা বানানো হবে স্প্যানিশ মার্বেল ও বেলজিয়ান কৃষ্টাল দিয়ে। প্রাসাদের ভেতরেই আলাদা জিম, সিনেমা ও সুইমিং পুল থাকবে। কিন্তু এতো গেল শরীরের প্রসাধন। পিনোশেটের মনের শান্তির জন্য বেসমেন্টে বোমা থেকে আত্মরক্ষার আশ্রয়, একটা গোটা রেজিমেন্টের থাকার জায়গা ও গোলাবারুদ। আলিয়েন্দের হত্যাকারী, চিলির এই সামরিক শাসকের এই 'ফুটুনীর পয়সাও জোগাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; যেমন তারা জুগিয়েছিল আলিয়েন্দে হত্যার পয়সা। —ফরাসী সংবাদসংস্থা

রাস্তাই যখন ডাস্টবিন (বৃটিশ পদ্ধতি)

ভারতবর্ষে এখন বহুতল বাড়ির যুগ। বম্বের নারিম্যান পয়েন্ট অনেকটাই মিনি ম্যানহাটানের মতো মনে হয়। মালাবার হিলসের বহুতল বাড়ি থেকে ছুঁড়ে ফেলা ময়লার পাহাড়ের ছবি উঠেছিল সংবাদপত্রে, একাধিকবার। কিন্তু এটা কেবল ভারতীয় স্বভাব ভাবলে ভুল হবে। বারমিংহামে নিয়ম হয়েছে, বহুতল বাড়ির কেয়ারটেকারদের বাধ্যতামূলকভাবে হেলমেট পরতে হবে। কারণ আর কিছুই নয়, বাড়ির ওপর থেকে ফ্ল্যাটকর্তারা খালি বোতল, ভাঙা জার মাধ্যাকর্ষণের ওপর ছেড়ে দেন। সেই আচমকা পতনের হাত থেকে মাথা বাঁচাতেই এই সুরক্ষা।

—দা টাইম

নেশাভাঙের আন্তর্জাতিকতা

কানাডাতে ওষুধের চোরাচালানের ওপর কড়া নজর রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। গত বছরে, কানাডার পুলিশ ১৩ টন মারিজুয়ানা ও প্রায় একই পরিমাণ গাঁজা ধরেছে। স্মাগলার হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ১২৮ জনকে। কিন্তু চোরের দলে থাকলেও তো সমান অপরাধ। ফলে ১১,৫০০ জন কানাডার নাগরিক অভিযুক্ত হয়েছেন নিষিদ্ধ নেশার জিনিস ঘরে রাখার অপরাধে। কিন্তু সমস্যা মেটে নি। এই স্মাগলারদের মোট বার্ষিক আয় ৯·৪ বিলিয়ন কানাডিয়ান ডলার। প্রধান স্মাগলিং কেন্দ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

—নিউ ইয়র্ক টাইমস

টিয়াপাখির ঠোঁটটি লাল

অপরাধীদের ধরতে নানা ধরনের উপায় আছে। ফোরেনসিক বিশেষজ্ঞরা কেবলমাত্র চুল দেখে বা কখনও মাথার খুলির সাহায্যে বা শুধুমাত্র রক্তের ছাপ বা সামান্য চিহ্ন দেখেও হত্যার কিনারা করতে পারেন। কিন্তু টিয়াপাখিকে কাজে লাগানো? টেক্সাসের বেটাউনের পুলিশ সেই কাজও করেছেন। চুরি হবার পর একটি টিয়াপাখি ডাকছিল, 'ওভার হিয়ার রবার্ট, ওভার হিয়ার, রনি।' হাতের ছাপ ও টিয়াপাখির এই ডাকের সাহায্যে তারা দুই ডাকাতকে ধরে। একজনের নাম রবার্ট, একজনের নাম রনি।

—এসোসিয়েটেড প্রেস

'না, না, আমি ঠিক আছি'

পর্তুগালের ফ্যাকটরির মালিকরা মুশকিলে পড়েছেন। নিয়ম আছে, দুপুরবেলা খাবার পর, কোম্পানি চেয়ারম্যান থেকে শ্রমিক, প্রত্যেকে ওয়াইন ও কয়েক গেলাস বাগাকো খান। বাগাকো পর্তুগালের নিজস্ব মদ। কিন্তু খাবার পর, মধ্যাহ্নভোজন সেরে এলে কিন্তু কারখানায় উৎপাদন তো কমেই যায়, বাড়ি ফিরে যাবার সময় দুর্ঘটনাও বেড়ে যাচ্ছে। কারখানা কর্তৃপক্ষ তাই নিশ্বাস পরীক্ষার বন্দোবস্ত করেছেন। একটি সরকারি তামাক প্রতিষ্ঠান এই পরীক্ষা চালাবেন বলে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু শ্রমিকরা বলেন, 'না, না, আমি ঠিক আছি।'

—অবজারভার

আর্থিক অবস্থা

শশাঙ্ক সেন
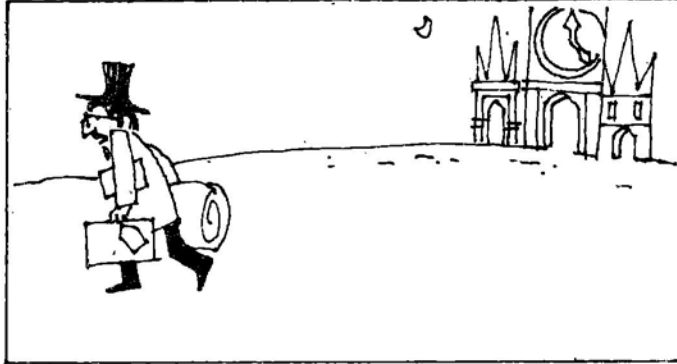
গত কয়েকসংখ্যা ধরেই বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিক বা ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রবাসীদের এদেশে অর্থ বিনিয়োগের বা এদেশে ফিরে এলে সম্পত্তি ইত্যাদি ব্যাপারে করসংক্রান্ত সুযোগ সুবিধে পাবার নানা আইনকানুন নিয়ে আলোচনা করেছি। এটাই তার শেষ কিস্তি। সিকিউরিটি, ডিভিডেণ্ড আর সম্পদকর আইনের বিভিন্ন ধারা উপধারা অনুসারে সুবিধে পাবার আরও নানা তথ্য এই নিবন্ধে দেওয়া হল। আশা করা যায় সংশ্লিষ্ট সমস্যার বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও সমাধান এই নিবন্ধগুলোতে পাওয়া যাবে।

কর ছাড়ের আরও সুযোগ

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোতে এই ধারা অনুযায়ী বিনিয়োগ করা যেতে পারে—

১) কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের সিকিউরিটিতে।

২) এই ছাড়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দিষ্ট বিজ্ঞপ্তি থাকলে কোনো কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক বা কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক সহ কোনো কো-অপারেটিভ সোসাইটির ডিবেনচার।

৩) ছাড়ের জন্য বিজ্ঞাপিত হলে কেন্দ্রীয় সরকারের যেকোনো প্রকল্পের ডিপোজিট।

৪) ভারতীয় কোম্পানীর শেয়ার।

৫) ইউনিট ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়ার ইউনিট।

৬) কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মরট্‌গেজ ব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সহ যে সমস্ত ব্যাঙ্কিং সংস্থা ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন এ্যাক্টের অধীনে পড়ে, তাদের ডিপোজিট।

১৯৮৩ সালের ফিনান্স বিলে এই সূত্রটি ঢোকানো হয়েছে, ১·৪·১৯৮৪ থেকে তা কার্যকর হবার কথা।

৬ক) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিজ্ঞাপিত, (৬) সূত্র অনুসারে, আইনগতভাবে স্থাপিত নয়, কিন্তু পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোনো ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের ডিপোজিটের ওপর সুদ।

৭) যে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ভারতের শিল্পায়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী হারে টাকা দেয়, বা নির্মাণকার্যের জন্য ভারতে রেজিস্ট্রিকৃত কোম্পানীর ডিপোজিট। কিন্তু সেই সংস্থাগুলোকে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পেতে হবে সেকশন ৩৬-এর সাব-সেকশন (১)-এর (৮) ধারা মোতাবেকে।

৮) নগর বা গ্রাম বা দুইই উন্নয়নের জন্য ভারতে স্থাপিত কোনো প্রতিষ্ঠানের ডিপোজিট।

৯) (৬) ধারা অনুযায়ী স্থাপিত নয় এমন কো-অপারেটিভ সোসাইটির ডিপোজিট।

১০) কো-অপারেটিভ সোসাইটির শেয়ার সেকশন ৮০-কে অনুসারে কোনো করদাতা ছাড় পাবার যোগ্য হলে, ৮০কে অনুসারে বাদ যাবার পরই অবশিষ্ট ডিভিডেণ্ডের আয়কেই এই সেকশনের নিয়মানুসারে ছাড় পাবার জন্য হিসেবের মধ্যে ধরা হবে।

ইউনিট ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট, ১৯৬৩, ৮০ এল ধারা অনুসারে, করদাতার পুরো আয় হিসেব করবার সময়, ১৯৬১ সালের ইনকাম ট্যাক্স এ্যাক্টের নিয়ম মতে করদাতা কর্তৃক গৃহীত ইউনিটের আয়কর হিসেবে যদি তাদের ডিডাকশনের মধ্যে ধরা না হয়, তাহলে এই ধারা অনুসারে ৩,০০০ টাকার বেশি বাদ দেওয়া যাবে না।

৪· ওয়েলথ ট্যাক্স এ্যাক্ট মোতাবেকে আপনি কোনো কোনো সম্পদের ক্ষেত্রে কর রেহাই পেতে পারেন। সেগুলো হলো, ১০ বছরের ট্রেজারি সেভিংস ডিপোজিটস্ সার্টিফিকেটস, ১৫-বছরের এ্যানুইটি সার্টিফিকেট, পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপোজিট, পোস্ট অফিস ক্যাশ সার্টিফিকেট, পোস্ট অফিস ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট, পোস্ট অফিস ন্যাশনাল প্ল্যান সার্টিফিকেট, ১২-বছরের ন্যাশনাল ডিফেন্স সার্টিফিকেট এই সার্টিফিকেট বা ডিপোজিটের পরিমাণ প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুমোদিত পরিমাণের চাইতে বেশি হতে পারবে না।

আপনি এই সুবিধেগুলো পেতে পারেন।

১৬ সি) মূল্যায়নের দিনে যে বছর শেষ হচ্ছে, তখন কোনো ব্যক্তি ভারতের নাগরিক বা ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রবাসী হলে, বিজ্ঞাপিত কোনো কেন্দ্রীয় সরকারের সেভিংস সার্টিফিকেট।

কিন্তু সংশ্লিষ্ট নিয়ম ও ১৯৭৩ 'ফেরা' (ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন এ্যাক্ট) অনুযায়ী সেই ব্যক্তি যদি ভারতের বাইরে কোনো দেশ থেকে বিনিময়যোগ্য বৈদেশিক মুদ্রায় এই সার্টিফিকেট কেনেন, তাহলেই একমাত্র সুবিধে পাওয়া যাবে। এই ধারার ব্যাখ্যা—

ক) যদি কারও বাবা বা ঠাকুরদা বা তিনি নিজে অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তাহলে তাঁকে ভারতীয় বংশোদ্ভূত বলা হবে

খ) মূল্যায়নের দিনে যে বছর শেষ হচ্ছে, তখনকার হিসেবে আয়কর আইনের অর্থ অনুযায়ী যদি কোনো ব্যক্তি ভারতের আবাসিক না হন, তাহলে সেই ব্যক্তিকে ভারতীয় আবাসিক বলে ধরা হবে না।

গ) 'বিনিময়যোগ্য বৈদেশিক মুদ্রা'-র অর্থ সংশ্লিষ্ট আইন এবং ১৯৭৩ সালের 'ফেরা' (১৯৭৩-এর ৪৬) আইনানুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যাকে বিনিময়যোগ্য বৈদেশিক মুদ্রা বলে গণ্য করে।

১৬ সি ধারার ক্ষেত্রে, (১৯৮২ সালের ফিনান্স এ্যাক্টের সেকশন ৩৪-এর ধারা ক-এর উপধারা (৫) অনুসারে) ১৯৮৪ সালের ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর করার জন্য নিম্নলিখিত (১৬ সি) ও (১৬ সি এ) ধারাটি বদলানো হবে—

'(XVIC) in the case of an individual, being a citizen of India or a person of Indian origin who is not resident in India, during the year ended on the valuation date, any foreign exchange asset'

এই ধারার জন্য ব্যাখ্যা—

ক) কোনো ব্যক্তির বাবা ঠাকুরদা বা সেই ব্যক্তি নিজে অবিভক্ত ভারতে জন্মালে তাঁকে ভারতীয় বংশোদ্ভূত বলে গণ্য করা হবে।

খ) মূল্যায়নের দিনে যে বছর শেষ হচ্ছে, তখনকার হিসেবে আয়কর আইনের অর্থ অনুযায়ী যদি কোনো ব্যক্তি ভারতের আবাসিক না হন, তাহলে সেই ব্যক্তিকে ভারতীয় আবাসিক বলে ধরা হবে না।

গ) 'বৈদেশিক মুদ্রার সম্পত্তি'-র অর্থ আয়কর এ্যাক্টের ১১৫ সি সেকশনের ধারা বি অনুসারে নির্দিষ্ট।

১৬ ডি) কোনো ব্যক্তি বা অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপিত ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট বণ্ড।

২৩) কোনো ভারতীয় কোম্পানীতে যেখানে করদাতা একজন ব্যক্তি বা অবিভক্ত হিন্দু পরিবার সেখানে ধারা (২০) বা (ধারা ২০ এ) অনুসারে নথিবদ্ধ নয় এমন শেয়ার।

২৫) ১৯৬৩ ইউনিট ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট মোতাবেকে স্থাপিত ইউনিট ট্রাস্টের ইউনিট।

এই ব্যাপারে ৩৫,০০০ টাকা পর্যন্ত বিশেষ সুবিধে আছে, সেকশন ৫(১-এ) অনুযায়ী সর্বাধিক ১,৬৫,০০০ টাকার সীমা পেরিয়ে গেলে।

এইরকম আরও অনেক সুবিধে আছে। ☐

মিলন দত্ত

সঞ্চালী ও তার মতো মেয়েরা

গত ২৩শে এপ্রিল চুঁচুড়া কোর্টে একটি তিন বছরেরও বেশি পুরনো মামলার রায় বেরল। মামলাটা ছিল গৃহবধূ হত্যা বিষয়ক। ইদানীং প্রতি বছর এ ধরনের মামলা দায়ের হচ্ছে সাড়ে ছশ-রও বেশি তবে বেশিরভাগ মামলাই মাঝপথে খারিজ হয়ে যায় যথেষ্ট প্রমাণ এবং সাক্ষীসাবুদ না প্যাওয়ার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গৃহবধূ হত্যার ঘটনাগুলো হয় এত পরিবারকেন্দ্রিক গোপন এবং দীর্ঘ পরিকল্পনা এবং পরম্পরা প্রসূত যে আদলতের পক্ষে এ ধরনের মামলা নিষ্পত্তি করা খানিকটা অসুবিধাজনকও বটে। তাছাড়া আমাদের আদলতের চলার নিজস্ব ধরনটিতেই জড়িয়ে আছে এত দীর্ঘসূত্রতা অমনোযোগিতা যে সেটাও বেশ অসুবিধারই। তবে গৌরী ঘোষ হত্যা মামলায় যেমন পাওয়া গিয়েছিল মৃত্যুকালীন জবানবন্দি এবং তার রায় এই তো 'সেদিন বেরল—বেশ তাড়াতাড়িই। মামলার রায় হয়েছে গৌরীর শ্বশুরবাড়ির সবার যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড

আর চুঁচুড়ার সঞ্চালী হত্যা মামলা, যার রায় বেরল ২৩শে এপ্রিল—সাজা পেয়েছে পরিবারের সবাই (একজন বৃদ্ধা পিসি ছাড়া) দু বছর সশ্রম কারাদণ্ড আদালতে এটা প্রমাণ করা গিয়েছিল যে শ্বশুর বাড়ির একটি ঘরে ১৯৮০ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসের নির্মল সকালে সঞ্চালীকে কেউ গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে। কিন্তু আদলতের নাকি সন্দেহের অবকাশ থেকে গেছে হত্যাকারী কে সে ব্যাপারে, কিন্তু এটাও আবার বোঝা গেছে এই হত্যার সঙ্গে কেবল শাশুড়ি গীতা চ্যাটার্জী যুক্ত নয়, তার স্বামী অবসরপ্রাপ্ত আয়কর অফিসার শৈলেন চ্যাটার্জী, দুই খুড়শশুর রমেন ও যোগেন চ্যাটার্জী (এদের একজন ডাকবিভাগের কর্মী), কেমিস্ট্রিতে তার গবেষণা শেষ করে উপাধি লাভ করা দেওর তপন চ্যাটার্জী এবং সর্বোপরি ব্যাঙ্ক- অফিসার স্বামী স্বপন চ্যাটার্জীও এ হত্যার অংশীদার।

হত্যার কারণ জানার পরেও, কীভাবে হত্যা করা হল, তা জানতে পেরেও এবং স্থান সঠিকভাবেই নির্ণীত হওয়ার পরেও আদালত দুবছরের বেশি সাজা মঞ্জুরে করতে পারলনা কেন? কেন সন্দেহের অবকাশ' থেকে যায় হত্যাকারীকে দ্বিধাহীন চিহ্নিত করণের ব্যাপারে? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমাদের

একটু পিছিয়ে বলে যেতে হবে সঞ্চালীর মৃত্যুর দিনটিতে।

১৯৮০-র ২৬শে জানুয়ারি সঞ্চালীর বাপের বাড়িতে ঠিক দুপুরবেলা একটা উড়ো ফোন আসে। ফোন করে কেউ খবর দেয় যে সঞ্চালী ভীষণ বিপদে, সে গুরুতর অসুস্থ। সঞ্চালীর বাবা, মা এবং কাকাদের চুঁচুড়া পৌঁছতে বিকেল হয়ে গিয়েছিল। সঞ্চালীর শ্বশুর বাড়ির কাছাকাছি যেতেই পাড়ার লোকেরা তাঁদের বলেন সঞ্চালী হাসপাতালে। রিক্সা ওঁদের সোজা চুঁচুড়া হাসপাতালের মর্গে নিয়ে গিয়ে হাজির করে। তখন-প্রায় সন্ধ্যা। চুঁচুড়া সদর হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ মৃন্ময় দাসঘোষ ঐ ক্ষীণ আলোর মর্গে সঞ্চালীর ময়নাতদন্ত করতে চাইলে তাঁকে বিরত করার চেষ্টা করেন সঞ্চালীর বাবা। কারণ ডাক্তার সমস্ত আইনকানুন জেনেও বিধি বহির্ভূতভাবে সূর্যাস্তের পরে মর্গের ক্ষীণ আলোয় ময়নাতদন্ত করতে চাইছিলেন। ডাঃ দাসঘোষ তাড়াহুড়োর একটা দায়সারা ময়নাতদন্ত করেনও, কিন্তু বাড়ির লোক এবং স্থানীয় জনতার মুখোমুখি ভয় পেয়েছিলেন মিথ্যা লিখতে এবং সম্ভবত সত্য লেখার ব্যাপারেও তাঁর অসুবিধা ছিল—তাই তিনি মৃতদেহ আরও ভালোভাবে ময়নাতদন্তের জন্য কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের ফোরেনসিক মেডিসিনের প্রফেসারের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এবং পরে আদালতের সাক্ষ্যে বলেছিলেন, '২৬-১-৮০-র মৃত্যুর ময়নাতদন্ত আমার কাছে অসুবিধাজনক বলে আমি এই মৃত্যু বিষয়ে কোনো মতামত দিতে পারছিনা। যেহেতু আমি এই কাজে বিশেষ পারদর্শী নই, তাই আমার পক্ষে এই ময়নাতদন্ত করা অসুবিধাজনক। তাছাড়া আমি যখন ময়নাতদন্ত করছিলাম, তখন মর্গের সামনে বিশাল জনতা দাঁড়িয়ে ছিল এবং রিপোর্ট লেখার সময়ে তারা আমাকে বিরক্ত করছিল। সেই করণেই আমি উন্নততর মতামত চেয়েছিলাম।' এই আপাত নির্দোষ স্বীকারোক্তি দিয়ে ডাঃ দাসঘোষকে দোষমুক্ত ভাবার কারণ নেই। সঞ্চালীর বাবার সঙ্গে তার আচরণ, সঞ্চালীর মৃত্যুকে সাধারণ আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা ইত্যাদি ঐ ডাক্তারকে সঞ্চালীর শ্বশুরবাড়ির ঐ চক্রান্তের সঙ্গে যুক্ত প্রমাণ করেছে।

তাই আদালতের রায়ের সঙ্গে একথাও উচ্চারিত হয়েছে 'ডাঃ এস· দাসঘোষ অপদার্থ, দায়িত্বজ্ঞানহীন', যে মতামত তিনি দিতে পারতেন তিনি তা দেননি' 'এরকম ডাক্তার সমাজের পক্ষে বিপদ জনক'।

অথচ এ ব্যাপারে কোনো কথা শোনা গেলনা হেলথ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন-এর। তাঁরা এমন ডাক্তারের বিরুদ্ধে একটি ধিক্কার-বাক্য উচ্চারণ করেননি—অন্তত আমরা তা শুনতে পাইনি। কিন্তু যখন সঞ্চালীর মৃতদেহকে সৎ ময়নাতদন্তের জন্য, মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয়ের জন্য, মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসার ডাঃ জে· বি· মুখার্জীর কাছে আনা হয়েছিল, তখন অ্যাসোসিয়েশন প্রতিবাদে চুঁচুড়া ময়নাতদন্ত বন্ধ করেছিল। অনেক জল ঘোলা হয়েছিল এ নিয়ে। সমাজের এমন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বসে ডাক্তারদের এই অসততা সত্যিই ভয়াবহ এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে শঙ্কার।

আসলে চুঁচুড়ার যে বাড়িতে মর্মান্তিকভাবে মরতে হয়েছে একবছরের পুত্রের মা সঞ্চালীকে, সে বাড়ির প্রভাব ঐ মফস্বল শহরের সমস্ত হোমরাচোমরা মানুষদের ওপর। সে প্রভাব থেকে যেমন মুক্ত নয় স্থানীয় হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার তেমনি মুক্ত নয় পুলিশ ফলে এ মামলার পুলিশের ভূমিকাও ছিল অসৎ এবং একপেশে।

ঘটনার দিন সন্ধ্যায় সঞ্চালীর কাকা থানায় ডায়েরি লেখাতে গেলে সে ডায়েরি নিতে প্রথমে অস্বীকার করে পুলিশ। পুলিশ ওদের বারবার বোঝাতে চেয়েছিল এটা সাধারণ আত্মহত্যা। কিন্তু চাপে পড়ে ডায়েরি নিতে হয় পুলিশকে। এবং পরে ময়নাতদন্তে সঞ্চালীকে বলপূর্বক হত্যা প্রমাণিত হলে মামলায় যুক্তও হতে হয় পুলিশকে। ভয়ে স্থানীয় পুলিশ প্রায় সব সময়েই পক্ষপাতী এবং নির্লিপ্ত। তাই সঞ্চালীর শ্বশুরবাড়ির কাজের মেয়েটির গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্যকে নষ্ট করেছে পুলিশ মামলার গুরুত্ব কমিয়ে দেবার জন্য, সঞ্চালীর স্বামী স্বপনের এক সহকর্মীর সাক্ষ্যকে নষ্ট করেছে সাক্ষ্যের দিনক্ষণ গুলিয়ে দিয়ে। অবশ্য পুলিশের এ ভূমিকা নতুন কিছু নয়। পুলিশ নামের সঙ্গে যেন ওতপ্রোত হয়ে গেছে 'অসততা' শব্দটি। কিন্তু যেটা আমাদের অবাক করে তা হল ডাক্তারদের ভূমিকা।

চারপাশের এই চক্রান্তে হয়ত আদালত আরও বিভ্রান্ত হত, সুষ্ঠু বিচারে আরও বাধা আসত, যদি না এ মামলা সরকার পক্ষের ব্যারিস্টার জে· কে· দাসের হাতে যেত। তাঁর নিষ্ঠা এবং অভিজ্ঞতাই মামলাকে পৌঁছে দিতে পেরেছে এই ফলাফলে।

তবে সঞ্চালীর বাবা এবং কাকার সুষ্ঠু বিচারের জন্য আকুতি আর তাঁদের এই ধৈর্যশীল দীর্ঘ লড়াই উদাহরণ হয়ে থাকার মতো। সঞ্চালীর বাবার একটি কথা এক্ষেত্রে বেশ প্রনিধানযোগ্য 'আমাদের এই লড়ে যাওয়া তো কেবল আমার মৃতা মেয়ের মামলার রায়ের জন্য নয়, সেই সমস্ত অসহায় মেয়েদের জন্যও, যাদের প্রাণ দিতে হয় সঞ্চালীর মতো পণ আর যৌতুক আর সামাজিক অবিচার আর অন্যায়ে।' □

ডাঃ শ্রীকুমার রায়

দারকর্মনি মৈথুনে

ত্রিভুবন-যৌবন-চঞ্চলকরা জনৈক সুন্দরী একবার বার্নার্ড শ-কে বলেছিলেন—আপনার উচিত আমাকে বিয়ে করা, কারণ, আমাদের ছেলেমেয়ে পাবে আমার রূপ আর আপনার বুদ্ধি। কথাটার মধ্যে শ-র দৈহিক অসুন্দরতা সম্বন্ধে কতটা কটাক্ষ বা ক্ষুরধার বুদ্ধি সম্বন্ধে কতটা শ্রদ্ধা উপ্ত ছিল বলা যায় না, তবে প্রত্যুৎপন্নমতি শ নাকি উত্তরে সুন্দরীকে বলেছিলেন—ঠিকই, তবে উল্টোটাও তো ঘটতে পারে!

আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাও সেই রকম মা বাবার মাধ্যমে মাতৃ-পিতৃকুলের আকার প্রকারগত গুণাবলীই যে শুধু ছেলেমেয়েতে অর্সাবে তার কোনো মানে নেই, পূর্বপুরুষদের শারীরিক বা মানসিক বিকৃতি ইত্যাদি দোষগুলি আহরণ করার সম্ভাবনাও বংশধরদের সমান। এমনকি চিকিৎসকরা বলেন, ডায়াবিটিস্, ক্যানসার, হিমোফিলিয়া নামে রক্ত তঞ্চন দোষ, ড্যাসেনস্ মায়োপ্যাথি [যেখানে শরীরের মাধ্যাকর্ষণ বিরোধী (antigravity) পেশীগুলি আপাতদৃষ্টিতে বেশ সুগঠিত, কিন্তু খুবই দুর্বল], রঙকানা ইত্যাদি বেশ কয়েকটি রোগ বা রোগের প্রবণতা (Trait) বংশানুক্র। অল্প বয়সে মাথায় টাক পড়ার মতো উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কিছু ছোটখাটো বিকৃতির হয়ত বিশেষ কোনো ব্যক্তিগত বা সামাজিক তাৎপর্য নেই, কিন্তু বামনত্ব বা আঙ্গিক প্রতিবন্ধীত্ব, রাতকানা ইত্যাদি গুরুতর বিকৃতি চিন্তার কারণ বই কি। ব্যাধি হলে তো কথাই নেই।

এই সব ব্যাধি-বিকৃতির প্রতিরোধে এক সময় আমাদের কিছুই করার ছিল না, দৈবায়ত্ত বলে অসহায় দর্শক হয়ে থাকতাম। বড় জোর বিয়ের আগে ছেলেমেয়েদের ঠিকুজি কোষ্ঠী মিলিয়ে বলার চেষ্টা করা হত, জোটকের সন্তানভাগ্য কেমন। কিন্তু বংশানুবিদ্যা বা জেনেটিকস্-এর সাহায্যে আজকাল প্রায় গাণিতিক নির্ভুলতায় ভবিষ্যৎবাণী করা সম্ভব যে, কোনো আক্রান্ত বা আপাতসুস্থ (অথচ বংশানুক্রমিক ব্যাধি-বিকৃতির জিন শরীরে প্রচ্ছন্নভাবে বহন করছে) দম্পতির কতগুলি ছেলেমেয়ে রোগাক্রান্ত হবে বা ভবিষ্যৎ প্রজন্মে ছড়িয়ে দেবে। এর জন্যে বংশানুবিদ্‌দের নিজস্ব ছকও (Genetic Horoscope) আছে।

এক জাতীয় যমজ (Uniovalar twin) ছাড়া পৃথিবীর কোনো ব্যক্তিই আকৃতি বা প্রকৃতিতে আর একজনের হুবহু প্রতিচ্ছবি হতে পারে না; প্রত্যেকের মধ্যেই পরিবেশ নির্ভর এবং স্বোপার্জিত কিছু স্বাতন্ত্র্য আছেই। তবে ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সবার মধ্যেই পিতৃ-মাতৃকুলের কিছু বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান। তাই আমরা কথায় বলি "বাপ কা বেটা" বা "নরানাং মাতুলক্রম"। বংশানুবিদ্যার জনক গ্রেগর জোহন মেনডেল শতাধিক বছর আগে লক্ষ্য করেছিলেন যে, প্রাণী বিশেষের গায়ের রঙ, দৈর্ঘ ইত্যাদি দৈহিক বৈশিষ্ট্যেরও যুগল প্রতিনিধি আছে তার সমস্ত কোষ নিউক্লিয়াসে, যে যুগলের একটি বাবার এবং অপরটি মা'র কাছ থেকে পাওয়া। ১৮৫৬ সাল থেকে শুরু করে ১৮৬৩ পর্যন্ত বিভিন্ন রকমের শুঁটি নিয়ে পরীক্ষা করার পর মেণ্ডেল বংশানুসৃতির কয়েকটি নিয়মও আবিষ্কার করেছিলেন। ১৯১০ সালে গ্যারড প্রথম লক্ষ্য করলেন, শুধু মানুষের (বা অন্য প্রাণীর) গঠন বৈচিত্রেই নয়, Alkaptonuria, Phenyl Ketonuria ইত্যাদি কয়েকটি বিপাকীয় ব্যাধিও মেণ্ডেলের নিয়ম মেনেই এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে অর্সায়।

তারপর থেকে বংশানুবিদ্‌রা আরও অনেক ব্যাধি-বিকৃতির জেনেটিক সূত্র আবিষ্কার করেছেন এবং বর্তমানে এই সব ব্যাধিগুলিকে প্রাথমিকভাবে দু'ভাগে ভাগ করা হয়—(ক) কতগুলি ব্যাধি-বিকৃতিতে ছেলেমেয়ে উভয়েই আক্রান্ত হতে পারে। যেমন ছেলে বা মেয়ে বামন দুইই আমাদের চোখে পড়ে। আবার (খ) পিতৃকুলের অল্প বয়সে টাক পড়ার প্রবণতা কিম্বা মাতৃকুলের হিমোফিলিয়া ব্যাধি শুধু ছেলেদেরই দেখা যায়। এই শেষোক্তদের চিকিৎসকরা বলেন Sex linked genetic diseases। বংশের জিন-এ ব্যাধির প্রবণতাটা প্রবল (dominant) না সুপ্ত (recessive) তদনুযায়ী উপরি উক্ত প্রাথমিক বিভাগের প্রত্যেকটিকে আবার দু ভাগে ভাগ করা যায় এবং তাদের বংশানুসৃতির নিয়মকানুনও আলাদা।

ছেলে বা মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে খবরের কাগজের "পাত্রী চাই পাত্র চাই" পৃষ্ঠা কিম্বা ঘটক নিশ্চয় আপনাকে বেয়াই-বেয়ানের সঙ্গে প্রাথমিক যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবে কিন্তু পাকা কথার আগে Genetic Councilor-এর পরামর্শ নেওয়াটা অবশ্য প্রয়োজন। বিশেষ করে বর্তমান দিনকালে সে প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়ে গেছে। কারণটার ব্যাখ্যা দরকার।

বিবাহোপযোগী ছেলেমেয়েদের মধ্যে ত্রুটিপূর্ণ জিন আছে কি না, আজকাল তা বলে দেওয়া সম্ভব। এমন কি বিজ্ঞানীরা গর্ভাবস্থাতেই সন্তানের ক্রোমোজোম অনুধাবন করে সে ছেলে না মেয়ে, তার মধ্যে ত্রুটিপূর্ণ জিন আছে কি না, এসব বলে দিতে পারেন। এই সব গবেষণার ফলে কয়েকটি জিনিস বেশ স্পষ্ট—প্রথমত আজকের পারমাণবিক যুগে জিন মিউটেশনের আশঙ্কা এবং সম্ভাবনা নিঃসন্দেহে বেড়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, আগেকার দিনে সন্তানরা ত্রুটিপূর্ণ জিন (এবং তার ফলে মারাত্মক ব্যাধি) নিয়ে জন্মালে তারা হয়ত প্রজননের বয়েস পর্যন্ত বাঁচত না, সুতরাং পরের প্রজন্মের আবির্ভাবও ঘটত না। আজকাল কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রচুর উন্নতির ফলে সে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তৃতীয়ত, এ কথা অনস্বীকার্য যে হৃদয়বৃত্তি, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণে পাত্র পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রটা আজকের দিনে অনেক পরিব্যাপ্ত। মনু, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্যের যুগকে হয়ত আর বেশিদিন ধরে রাখা যাবে না। মনু স্মৃতিতে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল—বিবাহের ব্যাপারে বর্ণ হিন্দুদের সগোত্র এবং সপিণ্ডন প্রথা, অর্থাৎ পিতৃকুলের ঊর্ধ্বতন সাতপুরুষ এবং মাতৃকুলের পাঁচ পুরুষের মধ্যে বিবাহ অচল—"অসপিণ্ডা চ যা মাতুঃ অসগোত্রা চ যা পিতুঃ/সা প্রশস্তা দ্বিজাতীমাং দারকর্মণি মৈথুনে।" এঁদের উক্তির তাৎপর্য বর্তমান যুগের জেনেটিশিয়ানরাও অস্বীকার করেন না। তাঁরাও লক্ষ্য করেছেন Consanguinous Marriage-এ পরবর্তী প্রজন্মে বংশানুক্রমিক ব্যাধির সম্ভাবনা ভীষণভাবে বেড়ে যায়। কিন্তু উপায় কি? ছেলে হয়ত মার্কিন নাগরিকত্ব চায়, তাকে ওদেশের মেয়েই বিয়ে করতে হবে কিম্বা মেয়ে কারুর প্রেমে পড়েছে, আপনাকে মত দিতেই হবে। তখন আর সগোত্র, সপিণ্ডন প্রথার প্রশ্নই আসে না। তবু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে Genetic Councilor-দের পরামর্শ নেওয়াটা বাঞ্ছনীয়। বুঝতেই পারছেন, পাশ্চাত্য Free Society গুলিতে এ সমস্যা কত তীব্র আকার ধারণ করেছে। যদি দেখা যায় Geneticaly mismatched বিবাহের সন্তান সাংঘাতিক ব্যাধির জিন বহন করছে, সেক্ষেত্রে ওসব দেশের বংশানুবিদরা গর্ভপাতের পরামর্শও দিয়ে থাকেন। □

অমল পাল

প্রত্যেক ফোঁটা জলই দামি

সুশীলের বাড়িতে ছেলের মুখে-ভাতের নেমন্তন্ন। বলেছে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং সহকর্মীদের অনেককেই। আয়োজন খুবই সংক্ষিপ্ত—মটন-বিরিয়ানি আর দই-মিষ্টি। গ্র্যাণ্ড খাওয়া। খেতে বসে অব্দি একটা জিনিস দেখছি যে জল খাওয়ার কোনো গ্লাস দেওয়া হয় নি। একজন গামলা হাতে আরেক জন জলের জগ হাতে লাইনে-লাইনে ঘুরে আমাদের ডান হাতটিকে প্রাক-ভোজন প্রক্ষালনে সাহায্য করে তাকে তার নিজের কর্মপোযোগী করে দিয়ে চলে গেলেন। ভাবলাম, মেঝেটিকে যথাসম্ভব খটখটে রাখার জন্যে হয়ত বা এই ব্যবস্থা।

পদ সংখ্যা যদিও কম, কিন্তু স্বাদের কোনো তুলনা নেই। তাই জল-খাওয়ার জায়গাটুকু খালি রেখে বাকিটুকু ঠেসে ঠুসে ভরা গেল। সব শেষে এল বোতল। শেষ করে জল চাইতেই ফের এল বোতল। আবার জল চাইতে আবারও বোতল। এ কী রসিকতা! ভর পেট খাইয়ে-দাইয়ে জল খাওয়ার ব্যবস্থাই রাখেনি সুশীল। সমস্ত ব্যাপারটাই নির্জলা। শুধু নানা ব্র্যাণ্ডের কোল্ড ড্রিঙ্কের অঢেল ব্যবস্থা। বুঝতে পারলাম না, সুশীল কি ভুলে গেল যে লোকজনকে এপ্রিল-ফুল করার তারিখ ১লা এপ্রিল, ২২শে এপ্রিল নয়। নাকি এ নতুন আমদানি করা কোনো সফিস্টিক্রেসি। সুশীলের মতলব যাই থাকুক না কেন, তাতে ওর প্রেস্টিজ থাকুক আর নাই বা থাকুক, জল আমি খাবই। অন্তত হাত ধোয়ার সময় আজলা ভরে খেয়ে নেব। ভরপেট খেয়ে জল না খেয়ে কখনো থাকা যায়? খাওয়ার পর দেখি বন্ধুটি আমার সে পথও মেরে রেখেছে। হাত ধোয়ার কোনো ব্যবস্থাই রাখেনি। হাতে হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেল একটা করে মোটা টয়লেট টিসু পেপার—হাত মোছার জন্য। খাওয়া শেষে আমরা কজন সহকর্মী এক কোণে একটা ছোট্ট জটলা পাকিয়ে একটু বিশ্রাম করছি আর ক্ষণে ক্ষণে সিগারেট টেনে জল না খাওয়ার অতৃপ্তি মেটানোর চেষ্টা করছি। কিন্তু তাতেও অস্বস্তিটা কাটল না, দেখে প্ল্যানটা মাথায় এল—কাছাকাছি হরির

বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম পর্বটা সারলে কেমন হয়? একটু এলিয়েও নেয়া যাবে, আবার জলও খাওয়া হবে।

হরিকে কথাটা পাড়তেই ওর যেন তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। এমনিতে তো সে খুবই অতিথিপরায়ণ—কতদিনই তো বাড়ি টেনে নিয়ে গিয়ে এটা ওটা ভালোমন্দ খাইয়ে আপ্যায়ন করেছে। আজ আবার এমন ফসকে যাওয়ার মৎলব কেন? নাকি ভরপেট খাওয়ার পর ওর বাড়িতে গিয়ে আজ আর কিছুই খেতে পারব না বলে?

হরিকে এক রকম জোর করে ধরেই নিয়ে চললাম ওর বাড়ির দিকে—আমরা তিনজনে। আমাদের বাসে ওঠার কোনো লক্ষণই দেখতে না পেয়ে হরি যেন কেমন একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল। পায়ে পায়ে এক সময় হরির বাড়ির দরজায়ও পৌঁছে গেলাম। হরির পক্ষে আমাদের এড়ানোর কোনো রাস্তাই রইল না দেখে সে আমাদের এক অদ্ভুত অনুরোধ করে বসল। 'তোমরা শুয়ে বসে বিশ্রাম কর আমার কোনো আপত্তি নেই। আরও কিছু খেতে চাও তো আনিয়ে বা বানিয়ে দেয়া যাবে। কিন্তু কেউ জল খেতে চাইবে না। বিকেলে চা খাওয়ার সময় বড়জোর এক কাপ করে চা দিতে পারব'।

হরি আরও বলল যে, গরম পড়ার পর থেকেই ওদের এদিকে খুব জল-কষ্ট চলছে—বিশেষ করে খাবার জলের। দূরের একটা টিউব-ওয়েল থেকে খাবার জল ওদের কাজের লোকটি নিয়ে আসে—সেও আবার আজ ডুব মেরেছে। সকালে সে নিজে একটা ড্রাম নিয়ে গিয়েছিল জল আনতে। কিন্তু লাইন দেখে আর নেমন্তন্নের কথা মনে করে জল না নিয়েই চলে এসেছিল। খাবার জলের কলসিতে তলানি যা পড়ে আছে, তাতে করে বাড়ির কজনার রাত্রের মতো চলে যাবে। এতক্ষণে হরির ব্যবহার আর সুশীলের ব্যবস্থাপনার গূঢ়ার্থ আমাদের কাছে স্পষ্ট হল। জলের অভাব কথাটা ভাবতেও যেন কেমন লাগে। জলই একমাত্র জিনিস যা আমাদের এখনো পয়সা দিয়ে কিনতে হয় না। যা এই মাগ্গি-গণ্ডার বাজারে এখনও নির্দ্বিধায় কোনো বাড়ির দরজায় বা যে কোনো মনুষ্য-বসবাসের জায়গায় গিয়ে চাওয়া যায়।

আমাদের চারপাশের পরিবেশে এক মরুঅঞ্চল ছাড়া এত যে নদীনালা, ডোবাপুকুর, খালবিল সবই তো জলে জলময়। যদিও আগের তুলনায় এই 'জলময়'-তার পরিমাণে টান ধরেছে অনেকখানিই। আর বৃষ্টির দিনগুলোতে তো কখনো কখনো জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে এই জলের অতি বর্ষণে। আমাদের আশেপাশে যে কোনো জায়গায় তো কিছু পাইপ ঢুকিয়ে দিয়ে একটা পাম্প বসিয়ে দিলেই অঢেল জল। জলের এই সহজলভ্যতা আর প্রাচুর্যের চিত্রটি যে আর আগের মতো অত সহজলভ্য নয়, সেই উপলব্ধিতেই যেন আমরা পৌঁছলাম সেদিন। মানুষ সমেত এই পৃথিবীর যাবতীয় পশুপাখী কীটপতঙ্গ ও উদ্ভিদরা তাদের বেঁচে থাকা, পুষ্টি এবং বৃদ্ধির জন্য যে শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপ চালায়, তার সব কিছুরই সমাধা হয় এই জলের মাধ্যমে। তাই জল-ই জীবন। জীবভেদে তার শতকরা ৬০ ভাগ থেকে ৯৫ ভাগই হলো এই জল। জীবদেহস্থিত এই জল প্রতিক্ষণেই বাষ্পাকারে কিংবা মলমূত্র ও ঘামের আকারে দেহ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাই প্রতিদিনই জীবদেহে এর অভাব পূরণের জন্য দরকার হয়ে পড়ে প্রচুর জলের। কিন্তু মজা হচ্ছে, স্থলজীবদের ব্যবহার-উপযোগী জলের পরিমাণ আর পাঁচটা খনিজ পদার্থের মতোই সীমিত। পৃথিবীর সমস্ত জলের পরিমাণকে যদি ২০ লিটার ধরা হয়, তবে এর মধ্যে স্থলজীবীদের ব্যবহার-উপযোগী জলের পরিমাণ হবে একটি চা-চামচের এক চামচ মাত্র এর প্রত্যেকটি ফোঁটা অতি মূল্যবান।

তেল কোম্পানিগুলো রাস্তাঘাটে হোর্ডিং লাগিয়ে এর ব্যবহারকারীদের তেলের প্রতিটি ফোঁটার মূল্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। কিন্তু জলবিক্রির কোনো কোম্পানি না হওয়া পর্যন্ত কি আমাদের সীমিত এই জলের প্রত্যেকটি ফোঁটাই যে কত দামি তা বোঝার মতো জ্ঞান বা মানসিকতার প্রসার আমাদের মধ্যে হবে না?

তেল ছাড়াই মানুষ সভ্যতার পথে অনেক রাস্তা হেঁটে এসেছে—কিন্তু জল ছাড়া জীবকূল ২৪ ঘন্টার পথও চলতে পারবে?

খাদ্য সমস্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা, শক্তি উৎপাদন সমস্যা ইত্যাদি হাজারো সমস্যার সেরা সমস্যা হলো এই 'জল সমস্যা'। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই সেরা সমস্যাটি সম্পর্কে আজও আমরা সবচেয়ে বেশি নিস্পৃহ ও উদাসীন। তাই যখন দেখি যে, শহরের রাস্তায় কিংবা অধুনা সি· এম· ডি· এ-র কল্যাণে শহরতলিতেও গড়ে ওঠা টাইম-কলের মুখ থেকে পানীয় জলের ধারা কাজে অকাজে অবারিত ধারায় বয়ে যাচ্ছে, তখন অন্য যে কোনো অনুভূতির থেকে যেটা আমার মধ্যে সবচেয়ে বেশি কাজ করে, সেটা হলো 'ভয়'। □

পূর্ণেন্দু পত্রী

শিলচরে আড়াই দিন

মোটমাট পঞ্চান্ন মিনিট আকাশে ওড়ার কথা বলা বাহুল্য, আমার নয়, ইম্ফলগামী আকাশ-বাসটির। পঞ্চান্ন মিনিট পরে মাটিতে বা এয়ারপোর্টের শান-বাঁধানো চত্বরে পা পড়লেই শিলচর কিন্তু মাত্র দশ মিনিট লেট করে আকাশ-বাসটা এ কোথায় পৌঁছে দিল আমাকে? কলকাতা থেকে আকাশ-বাসে পঁয়ষট্টি মিনিটের হাই-জাম্প-এর পরও আবার কি করে সেই কলকাতাতেই. সে যেন এক উত্তরহীন ধাঁধা ধাঁধাটা আরো জট পাকায় আকাশ-ছোঁয়া দিগন্তের দিকে তাকালে এয়ারপোর্ট থেকে শহরে যাওয়ার এদিকে-ওদিকে মেটে-সবুজ পাহাড়ের সার। টিলার মত উঁচু জমিতে সার সার গাছ-সবুজ চা বাগান আর বাঁশ-ঝাড়। টিনের চালের বাড়িঘর গানের বিলম্বিত লয়ের ওঠা-নামার মতো উধাও রাস্তা। দুধেলা-গাই-এর শান্ত চোখের মতো বরাক নদীর উপরে উটের কুঁজের মতো ব্রীজ। কলকাতার 'ক' খুঁজে বের করা শিবেরও অসাধ্যি। অথচ, প্রকৃতি সরে গিয়ে, সামনে মানুষ এসে দাঁড়ালেই, কলকাতা

আমার নাম পার্থপ্রতিম মৈত্র। আমি সুপার এইটে একটা ছবি করতে চাইছি। নিছক ছবি করার জন্যে ছবি-করা নয় এটা আমাদের আন্দোলনের একটা অংশ, সিনেমাকে তথাকথিত এসট্যাবলিসমেন্টের বাঘ-নখের মুঠো থেকে ছিনিয়ে গ্রামে-গ্রামান্তরে পৌঁছে দিতে চাই আমরা। আজ্ঞে না, কোনো ফিনানসিয়ার নেই আমাদের পৃষ্ঠপোষকতার। আমার এই সব বন্ধুরা হাটে-বাজারে, দোকানে-ব্যাঙ্কে, স্কুলে-কলেজে চাঁদা তুলছে। এতেই করবো। ছবির নাম, আসরাফ আলির স্বদেশ। চিত্রনাট্য লিখেছি। আপনাকে দেখাতে চাই। একটু সময় দেবেন?

আমি তপোধীর। তপোধীর ভট্টাচার্য। আমরা এই পত্রিকাটা বের করি। 'শতক্রতু'। আপনি তো ব্যস্ত থাকবেন খুব, এ ক'দিন। আমরা একটু আলাদা করে বসতে চাইছিলাম। আমাদের কবিতা লেখাজোখা ইত্যাদির সমস্যা নিয়ে....।

আমরা বের করি 'ইত্যাদি'। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতা পত্র। অনেক আগে আপনি একবার লিখেছিলেন। এই সংখ্যাগুলো রেখে গেলাম। একটু পড়ে দেখবেন। আপনার মতামত শুনতে চাই।

এই ভাবে ধাপে ধাপে দীপক হোম চৌধুরী-র 'আগামী পৃথিবী', সাইক্লোস্টাইলে ছাপা 'ময়ূখ' যার শিরোদেশে সরব বিজ্ঞাপন—'আমাদের এই খাপখোলা নিরামিশাষী তরবারি', শিলচর প্রগতি লেখক শিল্পী কলাকুশলী সমিতির মুখপত্র 'দিশারী'

পৌঁছবার আগের দিন রাত্রে আচমকা জল-ঝড়ের সাইক্লোন। মাঝরাতের অন্ধকারে হৈহৈ ডাকাতি যেন। কিন্তু নিতে পারে নি কিছুই। যা নিতে চেয়েছিল সবই ফেলে গেছে ঊর্ধ্বশ্বাসের দৌড়ে। শিকড় উপড়ানো গাছ, কাঠের কাঠামো উপড়োনো করোগেটের চাল, সিমেন্টের ভিত্ উপড়োনো ল্যাম্পপোস্টের খুঁটি, ভিজে মাঠ, স্যাঁতানো পথ, নেতিয়ে পড়া গাছ-গাছালিতে আগের রাতের সেই গোপন লুটপাটের ছবি তখনও তরতাজা। এয়ারপোর্ট থেকে শহরে যাওয়ার পথে গাড়ির মধ্যে বিজিৎ চৌধুরীর চোখে-মুখে কুণ্ঠা। কবি শ্রীমতী অনুরূপা বিশ্বাসের উচ্চারণে ক্ষমাপ্রার্থনা।

—আপনার খুব কষ্ট হবে। আজ সারাদিন হয়তো আর কারেন্ট আসবে না। শিলচরে এই রকম। কাল তো ছিল সাইক্লোন। এমনি ঝড়-জলেও এক অবস্থা হোটেলের নাম হ্যাপী লজ। দু-রাত্তিরের বাসস্থান তারই তিনতলার একটা কুঠরিতে। আকাশ কাঠ-কয়লার গনগনে উনোন বাতাসে তারই হল্কা। আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করে নিজের ডেরায় ফেরার সময় বিজিৎবাবু সলজ্জ হেসে জানালেন

—কারেন্ট যাতে আসে তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি আমরা। আসা অসম্ভব। তবে সম্ভাবনা আছে একটাই। আজ অনেক হোমরা-চোমরা সরকারি অফিসারের বাড়িতে বিয়ে।

—আমার কষ্ট নিয়ে আপনারা ভাববেন না। আমি বরং আপনাদের অনুষ্ঠান নিয়ে ভাবছি। কারেন্ট না এলে তো অনুষ্ঠানই হবে না।

দুপুরের খাওয়া সেরে বিছানায় গা এলাতেই সারা শরীর যেন ফুটো - হওয়া জলের পাইপ। তখন মনকে বোঝালুম, তুই যে শিলচরে আছিস ভুলে যা। মনে কর কলকাতাতেই এখনো। আর সত্যি সত্যি, শিলচরে নয়, কলকাতায় ভাবতেই গায়ের অর্ধেক জ্বালা জুড়িয়ে হিম।

শিলচরে যাওয়া বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের ডাকে। সম্মেলনের কাজ যেমন চলে চলছে।

অনুষ্ঠান শেষ হলেই স্ত্র
এক ঝাঁক টগবগে
যৌবনের নাকি স্বপ্নে
অধিকাংশই কবি। কেউ
সঙ্গে গল্প লেখকও
সিনেমাকে বিপ্লবের হা
সদিচ্ছা। এক অনুষ্ঠান
অনুষ্ঠানের ফাঁকা সময়
ভীড়ে জমজমাট। কখনো
কুঠরি ছাপিয়ে, কখনো গা
সিমেন্ট-বাঁধানো গোল
কখনো সম্মেলনের বারান্
পা ছড়িয়ে আগ্রহী ক
তাদের মুখে প্রশ্নের শে

চলচ্চিত্রের সঙ্গে কবি
একটু বুঝিয়ে বলবেন?
আপনাদের তৈরি ছবি মু
কেন? ছন্দে কবিতা
অনাধুনিক? কবি হ
প্রাবন্ধিক হতে হবে বল
কমিটমেন্ট ছাড়া লেখক
না? ইত্যাদি, ইত্যাদি

সবচেয়ে জটিল প্রশ্ন
অবশ্য কবি শক্তিপদ ব্রহ্ম
আমার দিন সকালে
সংগঠনের আপিসে
আপিসটা আবার বি
দোতলার বৈঠকখানায় ই
আপিস শুনলে যা মনে হ
দিশারীর কাজকর্ম তা
রকমের। তাদের কাজ ন
গান লেখা, গান গাওয়া,
অনুষ্ঠান করে বেড়ানো, ন
আবিষ্কার। কিন্তু এসব ছাড়ি
এসবকে জড়িয়ে তাদের ম
মুখটা যে-কোনো
সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে,
সংহতির স্বার্থে। শক্তির প্র
কাজের জগতের ভিন্ন
থেকে লেখার জগতের
মূল্যবোধকে বজায় রে
করে? উত্তর দিতে গিয়ে
হল খানিকটা আত্মচরিত

যত এগিয়ে আসে এ
রিপোর্টিং-এর কাল-বেলা, ত
মনের ভিতরের সারেঙ্গীতে বে
যায় করুণ ছড়। পৌঁছবার ত
জানতাম, শিলচরেও পে
আধখানা কলকাতা, তাহলে
বিজিৎবাবুকে ফিরতি-টিকিট
দিতাম অত তড়ি-ঘড়ি?

অরুণ মিত্র

নিজেকে নিয়ে লেখা

গোপন অগোপন ভাবনা আর আচরণ সমেত যে-মানুষ আমি (যে-কোনো আমি), সেই গোটা মানুষটাকে সবার সামনে খুলে ধরা এক বিষম কাজ। এ-কাজ করতে কজন প্রস্তুত, ইচ্ছুকই বা কজন ? এ তো নিজের সঙ্গেই এক লড়াই, নিজেকে এই ভেতর থেকে বাইরে টেনে আনা, তাকে দেখা এবং দেখানো। কোনো লেখককে বাইরের সঙ্গে যে-যুদ্ধ করতে হয় তার চেয়ে এ-যুদ্ধ বেশি কঠিন। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নিজেকে বিশেষ অংশে প্রচ্ছন্ন রাখা মানুষের এক জন্মগত স্বভাব। তাকে অতিক্রম করা সহজ নয়, সেজন্যে সংগ্রাম করতেই হয় নিজের সঙ্গে। লেখকের পক্ষে কাজটা হল আত্মবীক্ষণের। 'আত্মানং বিদ্ধি' তপস্বীদের সাধনার বিষয় বটে, কিন্তু সে-জানাটা ব্যক্তির মধ্যেই সমাহিত থেকে যায়। কিন্তু প্রকাশ করাই হচ্ছে লেখক-ধর্ম। সুতরাং এ-ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে বলার ব্যাপারটা থাকেই।

ফ্রান্সের লেখকদের মধ্যে অনেককাল ধরেই আত্ম-উন্মোচনের একটা ধারা আছে। দুই আকারে এটা রূপ নিয়েছে (১) আত্মজীবনী, (২) দিনলিপি। আত্মজীবনী অবশ্য সব সাহিত্যেই আছে, বাংলাতেও। কিন্তু স্ব-জীবনের পরিচয় দেওয়ার ব্যাপারে ফরাসী লেখকরা যতদূর গিয়েছেন, অন্য সাহিত্যে তা দেখা যায় না। বেশ বোঝা যায়, অন্য ব্যক্তি, ঘটনা ইত্যাদি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁরা সমানভাবে বিষয় করেছেন নিজের সম্বন্ধে সমগ্র অভিজ্ঞতাকে। সুতরাং তাঁদের এ-শ্রেণীর রচনাকে ঠিকভাবে বর্ণনা করতে হলে বোধহয় বলা উচিত নিজের পরিচয় দেওয়া নয়, নিজের পরিচয় নেওয়া। বলতে গেলে ফ্রান্সে এর সূত্রপাত ষোলো শতকে মঁতেঞ-র রচনায়। আত্মজীবনী তিনি লেখেননি বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত নিবন্ধের তিনি জনক, যিনি লেখেন 'আমিই আমার গ্রন্থের বিষয়বস্তু।' অকপট আত্মকথার প্রথম অসামান্য নিদর্শন আঠারো শতকে রুসো-র 'কঁফেসিয়ঁ'। পরবর্তী কালে এই ধারায় আরো অনেক রচনাই প্রকাশিত হয়, কিছু রচনা বেশ প্রসিদ্ধিও লাভ করে, যা বস্তুত লেখকের প্রসিদ্ধির সঙ্গেই সম্পর্কিত। প্রথমেই নাম করতে হয় উনিশ শতকের অন্যতম প্রধান ঔপন্যাসিক স্ত্যাঁদাল-এর। তিনি নানান ভাবে তাঁর নিজের পরিচয় মেলে ধরেন। অন্য নামে এক আত্মজীবনীতে তিনি লেখেন 'আমার পঞ্চাশ বছর বয়েস হতে চলেছে, নিজেকে জানার সময় এসে গেছে।' এই জানার উদ্দেশ্যে নিজের আচরণ বর্ণনায় তিনি অসঙ্কোচ। তাঁর কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ শাতোব্রিয়াঁ-র স্বরচিত জীবনকাহিনীও উল্লেখ্য। তিনি যদিও স্ত্যাঁদাল-এর মতো দুঃসাহস দেখাননি, কিন্তু তিনিও বলেন 'আমি প্রধানত লিখছি নিজের কাছে নিজেকে বর্ণনা করার জন্যে, আমি আমার দুর্বোধ্য হৃদয়কে ব্যাখ্যা করতে চাই।' তবে সব চাইতে চাঞ্চল্যকর আত্মবিশ্লেষণ আঁদ্রে ঝিদ-এর। তিনি তাঁর জীবন চিত্রণে কোনো কিছুই গোপন করেননি, এমনকি তাঁর সমকামী আচরণও। আমি এ-গ্রন্থের এক ইংরেজি অনুবাদ দেখেছি যার মধ্যে অনেক জায়গা তারা-চিহ্ন দেওয়া, মানে সে-সব জায়গায় মূল রচনা ছাঁটাই করা হয়েছে। একেই কি বলে English prudery ? প্রসঙ্গত উল্লেখ করি স্যুররেয়ালিস্ট অনুপ্রেরণায় আরাগঁ-র লেখা 'পেইজাঁ দ্য পারী' (প্যারিসের কৃষক) গ্রন্থটির। এতে প্যারিসের এক অঞ্চলের বর্ণনায় তিনি কাল্পনিক আত্মকথার ভঙ্গিতে বেশ্যাসংসর্গের যে-শরীরতথ্য সম্বলিত বিবরণ দিয়েছেন তা ফ্রান্সের বাইরে কোনো প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক লিখবেন বলে ভাবা কঠিন। অবশ্য এ-গ্রন্থের আসল গুণ অন্যত্র। আরাগঁর অসাধারণ সৃজনকল্পনা এবং তাঁর ভাষার ইন্দ্রজাল এর পাঠককে আচ্ছন্ন করে ফেলে। মুক্ত আত্মকাহিনীর লেখকদের মধ্যে প্রবীণ ঝ্যুলিয়্যাঁ গ্রীনও বিশিষ্ট। তাঁর ক্ষেত্রে বিশেষ এক আগ্রহের বিষয় এই যে, তিনি জন্মসূত্রে মার্কিন, কিন্তু আবাল্য ফ্রান্সের অধিবাসী এবং আজ তিনি সম্মানিত ফরাসী ঔপন্যাসিকদের একজন।

নিজের সম্বন্ধে এবং অপরের সম্বন্ধে সমগ্র অভিজ্ঞতা বিবৃত করার অন্য উপায় হল দিললিপি বা রোজনামচা। এটাও ফরাসী সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট অংশ, যা অন্য সাহিত্যে সম্পূর্ণ অলভ্য না হলেও নগণ্য। ইংরেজিতে স্যামুয়েল পেপিস-এর দিনলিপি অবশ্য বিখ্যাত, কিন্তু পেপিস যথার্থ সাহিত্যিক ছিলেন না। কিন্তু ফরাসীতে দিনলিপি লিখেছেন অনেক প্রধান সাহিত্যিক। স্ত্যাঁদা তাঁদের মধ্যে প্রাচীন তাঁর এ-রচনায় তিনি নিজের সম্বন্ধে কোনো গোপন কথাই গোপন করেননি। আধুনিক কালেও বহু বিশিষ্ট লেখকের দিনলিপি স্মরণীয়, যেমন ঝ্যুল র‍্যানার এবং শার্ল দ্যু বস-এর। আরো নিকট কালে ফ্রাঁসোয়া মারিয়াক-এর কিছু রচনাকে এই শ্রেণীভুক্ত করা যায়। কিন্তু আঁদ্রে ঝিদ-এর দিনলিপির মতো বহুপঠিত আর কোনোটিই নয়। এই সময়ে লেখা মার্সেল ঝুয়াঁদো-র 'ক্রনিক মারিতাল' (দাম্পত্যের ধারাবৃত্তান্ত) দিনলিপিরই এক রকমফের। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কের দৈনন্দিন খুঁটিনাটি মারফৎ জীবন-জিজ্ঞাসায় বিচলিত এই রচনা প্রকাশযোগ্যতার কোনো সীমা মানেনি।

নিজেকেই যদি সমগ্রভাবে এমন অবজেকটিভ দৃষ্টিতে দেখা যায়, বিচার করা যায়, তবে অপরকে যে আরো অনায়াসে করা যায় তাতে আর সন্দেহ কী ? সে-বিষয়ে যে কোনো দ্বিধা নেই তার পরিচয়ও ফরাসী আলোচনায় সহজলভ্য। যত বড়ই হোন না কোনো লেখক, যত বিরাটই হোক না তাঁর খ্যাতি, তাঁর সৃষ্টি এবং জীবন বিশ্লেষণও সমালোচনার ঊর্ধ্বে কখনোই নয়। এবং তাঁর সম্বন্ধে বিরূপ মত ঘোষণায় কোনো উপলক্ষই বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। আঁদ্রে ঝিদ এবং আলবের কাম্যু-র মৃত্যুর পরই তা দেখা গিয়েছিল তাঁদের সাহিত্যকর্মের প্রতি নানা লেখকের অনুরাগ এবং বিরাগ একই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছিল পত্রিকার পৃষ্ঠায়। এমনিতে সর্বক্ষণের তর্কবিতর্ক তো আছেই। খ্যাতিমান প্রবীণ সাহিত্যিকদের ফরাসীতে সাধারণত সম্বোধন করা হয় 'গুরু' বলে ('মেত্র্')। সুতরাং অনেক গুরুর বাস ফ্রান্সে, অথচ গুরুবাদ নেই। এটা নিশ্চয়ই এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

সমস্ত দেখার এবং সমস্ত বলার এই যে ঝোঁক, এর প্রভাব ভাষাতেও না পড়ে পারে না। তাই কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করি উনিশ বিশ শতকে শব্দ ব্যবহারে শ্লীল-অশ্লীল ভব্য-অভব্যের সীমারেখা যেন ক্রমে মুছে যাচ্ছে। জীবনের স্থূল কোনো সত্য যদি কোনো বিশেষ শব্দকে আশ্রয় করে থাকে, তবে তা প্রত্যক্ষ অথবা তির্যক তাৎপর্যে ব্যবহার করতে আপত্তি কী, মনোভাবটা স্পষ্টত এইরকম। আধুনিক ফরাসী ভাষার চরিত্রের এই দিক নিয়ে বাংলায় আলোচনা করা যদি সম্ভবপর হয়, করা যাবে কোনো দিন। □

বই পাড়া বই পড়া

অরুণ সেন

জীবনানন্দ দাশ যে 'সমারূঢ়' কবিতায় লিখেছিলেন 'অজর অক্ষর অধ্যাপক'-এর কথা, যে কেবল মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খোঁটে, তারা কারা ? এ কবিতাটি তিনি যখন লেখেন, কেউ কি তাঁর চোখের সামনে ছিলেন ? বিশেষ কাউকে ব্যঙ্গে বিদ্ধ করার জন্য তিনি এটা লিখেছেন ? অনেককাল ধরেই এ নিয়ে লেখালেখি ও গবেষণা হচ্ছে। গবেষকরা অবশ্য এটা কবুল করেছেন, কাকে নিয়ে লেখা না জানলেও কবিতাটির উপভোগে ইতরবিশেষ ঘটে না। তবে জানতে তো ইচ্ছে করে। অন্তত জীবনীগত কারণে। নাম উঠেছে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এমনকী সজনীকান্ত দাসেরও, যদিও শেষোক্ত জন কখনই অধ্যাপক ছিলেন না।

এ অবধি কোনো আপত্তির ছিল না। কিন্তু কবিতাটির নায়ক ঐ ছায়াপিণ্ড যেভাবে ভিলেন হিসেবে গেঁথে আছেন পাঠকের মনে, তাতে তাঁর পক্ষেও যে কিছু বলার থাকতে পারে, তা আমরা ভুলে যাই।

জানি না ওঁদের মধ্যে কে কী বলেছিলেন বা লিখেছিলেন, তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তিনি জীবনানন্দ-র গুণগ্রাহী ছিলেন না। নিশ্চয়ই বিরুদ্ধেই কিছু বলেছেন বা লিখেছেন। এবং যে সময়ে কবিতাটি রচিত হয়েছিল, সে সময়ের পক্ষে তা খুব অস্বাভাবিকও নয়।

কিন্তু জীবনানন্দ কেন এত চটেছিলেন ? সেই সমালোচকের বক্তব্য নির্বোধ কিংবা ভাষা নিষ্ঠুর হয়েছিল বলে ? নাকি শুধুই তাঁর কবিতা ভালো না লাগার অপরাধে ? কোনো কবিই কি নিজের কবিতার বিরূপ সমালোচনাকে কখনই সহজভাবে নিতে পারেন ? বা উল্টো করে বলা যায়, কোনো কবির অনুরাগী সমালোচকও তো হতে পারেন বক্তব্য বা ভাষায় নির্বোধ, তার প্রতি কি কবির আনুকূল্যের অভাব ঘটে ? অর্থাৎ যে সমালোচক কবির কবিতার 'পাণ্ডুলিপি, ভাষা, টীকা' খুঁটে কবির পক্ষেই কথা বলেন, তাঁকে কি অপছন্দ করতে পারেন 'সমারূঢ়'-র কবিরা ?

এটা খুবই স্বাভাবিক। কবিতায় এভাবেই জড়িয়ে থাকবেন কবি, সেটাই তো সংগত।

কিন্তু জীবনানন্দ যে সেই সমালোচককে পালটা প্রশ্ন করেছেন, 'বরং নিজেই তুমি লেখনাকো একটি

কবিতা'—এটা কিন্তু যুক্তি হিসেবে অচল। তাহলে তো জীবনানন্দ নিজেই যে হক্সলি-র নাটক সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন, এখানে 'বিদ্যার সাবলীলতা' আছে, কিন্তু জ্ঞানের সেতুসংযোগ নেই, এমনকী পরামর্শ দিয়েছিলেন কীভাবে কোন নকশায় লিখলে সেটা কাব্যনাট্যে উত্তীর্ণ হবে—তা পড়ে কি তাঁকে প্রশ্ন করতে হবে, 'বরং তুমি নিজেই লেখ না একটি নাটক ?'

এর পেছনে যে মনোভাবটা চালু থাকে, তা হলো, কবিতা বিষয়ে বা নিজের কবিতা বিষয়ে বা অপর কবির কবিতা বিষয়েও একজন কবির মতামতেরই শুধু আছে মূল্য। অকবির মতামতের মূল্য নেই।

জীবনানন্দের মনের কথাই ধরা যাক। তিনি বলেছেন, 'অনুভব করেছি কবিতার স্পষ্ট, কুশল, যথাসম্ভব নির্ভয়ে চিন্তনীয় আলোচনা সেই যুগের কবিদেরই করা উচিত। যাদের মন কবিতা-সৃষ্টির জন্যে তৈরি নয়, কাব্য-আলোচনায় তারা পরিচ্ছন্নতা, পাণ্ডিত্য, ভালো অন্তঃপ্রবেশ দেখাতে পারলেও কবিতা সম্বন্ধে তাদের বোধ, আমার ভয় হচ্ছে, শেষ গভীরতা লাভ করতে গিয়ে প্রায়ই ব্যর্থ হয়, বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে।'

বুদ্ধদেব বসু তো আরো এক পা এগিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, কবিতা বিষয়ে কোনো কবির মতামত ভ্রান্ত হলেও বেশি মূল্যবান।

তবু বাঁচোয়া আমাদের আরেক বড় কবি শঙ্খ ঘোষ এতে সায় দিতে পারেন নি। তিনি পাউণ্ডের কথা উদ্ধৃত করেছেন ঠিকই, 'গাড়ি বিষয়ে ঠিক ঠিক জানবার জন্যে তার কাছে যাওয়াই ভালো—গাড়ি যে বানায় ; গাড়ির আরোহী নিশ্চয়ই সে ব্যাপারে তত নির্ভরযোগ্য নয়'—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন, 'নিজেদের রচনা বিষয়ে বলতে গিয়ে কবিরা প্রায়ই গোলমাল করে বসেন, এক-এক সময়ে এক-এক রকম বলেন, এবং তাঁদের উপর নির্ভর করা ঠিক হবে কিনা ভেবে আমরা ঈষৎ উদ্‌ভ্রান্তই হয়ে পড়ি।'

জীবনানন্দ দাশ বা বুদ্ধদেব বসু বা শঙ্খ ঘোষ প্রত্যেকের অনুভবের মধ্যে যে সত্যি সত্যিই বিরোধ আছে এমন হয়ত নয়—তাঁরা কে কীসের উপর জোর দিচ্ছেন, তার পেছনে আছে তাঁদের নিজের নিজের অভিজ্ঞতার ভালোমন্দ। হয়ত এও, কীভাবে কবিকে দেখা হবে তা নিয়ে সময়ের ধারণার অদলবদল।

একসময় কবিকে মনে করা হত দ্রষ্টা, স্বতন্ত্র তাঁর বেদি—এখন ভাবা হচ্ছে মানুষই, ভুলচুকে ভরা মানুষ। নিশ্চয়ই আলাদা মানুষ—কবিতা যিনি লেখেন না তাঁর থেকে আলাদা। যদিও অকবির মধ্যে যেমন তেমনি কবির মধ্যেও থাকে বোধ ও ক্ষমতার নানা ওজন, তবু মানতেই হবে, কবির অভিজ্ঞতায় জীবনের বা জগতের যে রূপ প্রকাশ পায় তার মূল্য অসীম। শক্তি চট্টোপাধ্যায় যে বলেন, 'এখন লেখক ও পাঠকের মধ্যে তফাৎ একটাই। লেখক লেখেন, পাঠক পড়েন। অনায়াসেই যা অবস্থা তাতে আজকে পাঠক লিখতে পারেন এবং লেখক তা পড়তে পারেন'—এসব কথাকে নিশ্চয়ই কবির প্রশ্রয় হিসেবেই গণ্য করা ভালো। কবির কবিতা বিষয়ক মতামতের পৃথক মূল্য ও গরিমা সবসময় স্বীকার্য।

কিন্তু সেজন্যই সমালোচনারও স্বতন্ত্র জমি, স্বতন্ত্র ভূমি, স্বতন্ত্র মূল্যকেও খারিজ করা যায় না। এবং সেটা যে কবির সমালোচনা নয়, সে কারণেই তার স্বতন্ত্র ধরনের যাথার্থ্য আছে। কখনোই তা কবির মতামতের সঙ্গে তুলনীয় নয়, কবির মতামতের অনুসারী নয়। তাঁর আত্মপ্রত্যয় কবিকে কখনো ক্ষুব্ধ করলেও সেজন্যই যে তা নিন্দনীয় এমনও নয়। কবিকে শুধু কবির মতো করেই বুঝে নিতে হবে এই দায়ও তাঁর নেই।

হয়ত জীবনানন্দ বা অন্য বহু কবির ক্ষোভের পেছনে সমালোচকের ঐ আত্মপ্রত্যয়ের যে বিকার তার চাপ থাকতে পারে। বহু সমালোচনাতেই তা থাকে। তখনই 'পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা'-র ক্লোজড় স্টাডি, আধুনিককালে যাকে নব্যরীতি হিসেবে নন্দিত করা হয়, তাকেই মনে হতে পারে 'মাংস কৃমি খুঁটি'—প্রয়োগের ভুলে 'কাব্যের দরকারি পট পরিসরে'র আলোচনাকে মনে হতে পারে জ্ঞানের চেয়ে পাণ্ডিত্যের প্রকোপ। সেজন্য তো ঢাকি সুদ্ধু মনসাকে বিসর্জন দেওয়া চলে না।

সে কথা যে জীবনানন্দ একেবারেই ভাবেন নি তা নয়। তাঁকেও দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলতে হয় : 'কবিতা কী—কী করে রচিত হয়—কবিতায় কী কাজ হয়—খুব আশ্চর্যের বিষয় এ সম্বন্ধে নিষ্কবি গদ্য-সমালোচকেরা অনেক সময় এমন অজর দৃষ্টির প্রমাণ দিতে পারেন যে কী করে তা ভেবে কবির আত্মস্থ মন মাঝে মাঝে ভেঙে পড়ে খুব সশ্রদ্ধ ও সত্য বিস্ময়ে। অথচ সে সব লেখকেরা এক লাইনও কবিতা লেখেন নি।'

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে যথোচিতভাবেই জীবনানন্দ একথা বলতে ভোলেন নি, 'বিদেশী সমালোচক তাঁরা সব।' আমাদের দেশে সমালোচনা সাহিত্যের সেই ঐতিহ্য যদি গড়ে উঠে না থাকে, সাহিত্য পাঠের একটা শক্ত জমি যদি তৈরি না হয়ে থাকে, তার জন্য খেদ করার আছে নিশ্চয়ই। শুধু একথা পালটা বলে সান্ত্বনা নেই যে 'প্রত্যেক দেশের সাহিত্য সেই সমালোচনার মানই পায় যার যোগ্য সে'—কারণ আর যাই হোক তাতে তো সমালোচনার সম্মান বাড়ে না। □

অলৌকিক, বিভ্রান্তিকর ও ধর্মীয় জালিয়াতি

কল্যাণ নন্দী

বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান। উৎস মানুষ সংকলন, কলকাতা ৬৪। দ্বিতীয় প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪। দাম ৯ টাকা।
বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ। উৎস মানুষ সংগ্রহ, কলকাতা ৬৪। ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩। দাম ৬ টাকা।

> ধর্মের দোহাই দিয়ে লোক ঠকানোর ব্যবসা চারদিকে ছড়ানো। ভারতবর্ষের মতো দেশে ধর্মীয়-কুসংস্কারের তো অন্ত নেই। অলৌকিকবাদ, অবতারবাদ, বিভিন্ন তুকতাকে বিশ্বাস গ্রামের তো বটেই, এমনকী শহরের মানুষের মনেও গেঁথে আছে। সবচেয়ে সাংঘাতিক হয়, যখন কেউ কেউ তাকে যুক্তি দিয়ে বা বিজ্ঞান দিয়ে সমর্থন করার চেষ্টা করেন। একেই বলা হয়েছে অপবিজ্ঞান।

'উৎস মানুষ' পত্রিকা তাঁদের বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত কতকগুলি প্রবন্ধ বিষয়ানুসারে দুটি সংকলনে গ্রথিত করেছেন। দুটিরই উদ্দেশ্য এক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী চিন্তার প্রসার। তাঁরা জানেন, ভূমিকাতে বলেছেনও, স্কুল-কলেজে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করলেই, এমনকী বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করলেই কোনো মানুষ যুক্তিবাদী মনের অধিকারী হয় কিংবা বিজ্ঞানমনস্ক হয়, এমন নয়। অনেক সময় উলটোটাও লক্ষ করা যায়—'সারাটা জীবন স্কুল-কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষা পেল না এমন মানুষের যুক্তিবাদী মনও আমরা দেখেছি।' আসল দরকার, সমাজে যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক চেতনা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা। 'উৎস মানুষ' সে কাজই করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বেশ কিছুকাল ধরে। তাঁদের এই অদম্য কর্মপ্রেরণাকে সাধুবাদ জানানোর ভাষা নেই।

এ কাজ কত যে কঠিন, তা তাঁদের চেয়ে বেশি কে জানে? বিশেষত আমাদের মতো দেশে, যেখানে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক নোঙর এখনও পোঁতা আছে জীবন ও সমাজের গভীরে? অবশ্য ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসার হলেই অবিজ্ঞান বা কুসংস্কার দূর হয়ে যায় এমন নয়। তখন অবিজ্ঞান বা কুসংস্কারেরও ধরন পালটায়। আসলে যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও সহবতের ফলে কুসংস্কারের ভূত পালাতে পারে, সেই দেশব্যাপী সুশিক্ষা অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেই দেখা যায় না—আর আমাদের মতো দেশে, যেখানে নিরক্ষরতাই দূর করা যায় নি, সেখানে অবস্থাটা কীরকম হতে পারে, তা তো জানা কথাই। কিন্তু লড়াই চালিয়ে যেতে হয়, সেই লড়াইয়ের সীমাবদ্ধতা জেনেও, সামাজিক রূপান্তরের আগে সার্বিক মুক্তি ঘটবে না জেনেও। অবিজ্ঞান ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই। আমাদের কাঙ্ক্ষিত সমাজে পৌঁছবার আগে আমাদের নিজেদের মধ্যে, আমাদের চারপাশের মানুষের মধ্যে কুসংস্কার রয়ে যাবে, আর আমরা সমাজ পরিবর্তনের কথা বলতে থাকব, তা তো হতে পারে না। কুসংস্কার ও অবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে লড়াইটাও আমাদের সমাজ পরিবর্তনের লড়াইয়ের অংশ, গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এটা নিছকই বিবেকের লড়াই, প্রতীক লড়াই—এমন মনে করলে

ভুল হবে। আন্তরিকভাবে, সুশৃঙ্খলভাবে এই লড়াই চালিয়ে গেলে কিছু কাজ—তা যতই সামান্য ও ধীরগতি হোক না কেন—হবেই। যে বড় কাজ সামনে পড়ে আছে, তার পক্ষে হয়ত অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু বড় কাজের জন্য যে বড় আয়োজন সেই পরিবর্তন আনার লড়াইয়ে কর্মী হতে পারবে তো তারাই, আজ যারা এই ছোট কাজের মধ্যে দীক্ষিত হয়ে চলেছে।

এই অবস্থায় তাঁদের প্রথম সংকলন 'বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান'-এর প্রথম সংস্করণ যে মাত্র এক বছরের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং পাঠকের চাহিদায় দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপতে হয়েছে—এটা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক এবং ওপরের কথাগুলোরই সমার্থক।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বলা হয়েছিল, 'আজ আমরা উৎস মানুষের পাতায় পাতায় বিজ্ঞান শেখাই সমাজটাকে চেনাই—তার সংস্কৃতিকে ধরবার চেষ্টা করি।' দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় জানা গেল, এতে কোনো কোনো পাঠক 'অহংকার ও আত্মম্ভরিতার আভাস' খুঁজে পেয়েছেন। সেটা একটু বাড়াবাড়ি। তবে এটা ঠিকই, প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় সামান্য তরলতার যে প্রশ্রয় পেয়েছে, তা এই উদ্যমের পক্ষে বেমানান। দ্বিতীয় সংস্করণে ভূমিকায় অবশ্য তা শোধরানো হয়েছে। সেখানে আছে যথোচিত গাম্ভীর্য। 'বিজ্ঞান-অবিজ্ঞান-অপবিজ্ঞান অবশ্যই সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশিত।...বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সত্য উদঘাটনের প্রক্রিয়াকে এই সংকলনে কিছুটা অন্তত তুলে ধরা যাচ্ছে বলে আমরা মনে করছি।'

দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু অদল বদলও ঘটেছে—নতুন লেখা যুক্ত হয়েছে, পুরনো ছোট লেখা বাদ গেছে এবং বিন্যাসেরও পরিবর্তন করা হয়েছে। বোঝা যায়, 'উৎস মানুষ' থেকে কয়েকটি লেখা ছাপিয়েই তাঁরা বসে নেই—নিরন্তর বিচার-পুনর্বিচার সমালোচনা-আত্মসমালোচনা চলেছে তাঁদের কর্মোদ্যোগের মধ্যে।

কুসংস্কার বা অবিজ্ঞানের মূল আশ্রয় ধর্ম। ধর্মের দোহাই দিয়েই লোকঠকানোর ব্যবসা চারদিকে ছড়ানো। ভারতবর্ষের মতো দেশে ধর্মীয় কুসংস্কারের তো অন্ত নেই। অলৌকিকবাদ, অবতারবাদ, বিভিন্ন তুকতাকে বিশ্বাস গ্রামের তো বটেই, এমনকী শহরের মানুষের মনেও গেঁথে আছে। সবচেয়ে সাংঘাতিক হয়, যখন কেউ কেউ তাকে যুক্তি দিয়ে বা বিজ্ঞান দিয়ে সমর্থন করার চেষ্টা করেন। একেই বলা হয়েছে অপবিজ্ঞান। 'বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান' বইটিতে উনত্রিশটি রচনার সাহায্যে অবিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞানের এই জগৎকে ধূলিসাৎ করা হয়েছে। যেসব ঘটনা বা কল্পিত

দাওয়াইয়ের সাহায্যে এই কুসংস্কারের জগৎ গড়ে তোলা হয়, তার অন্তঃসারশূন্যতাকে প্রায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করা হয়েছে। এত বিচিত্র ও ব্যাপক এইসব দৃষ্টান্ত যে, তাদের সংক্ষিপ্ত উল্লেখও আমাদের কৌতূহলী করে তুলবে।

সরল বিশ্বাস আর অনুভবের মাত্রাকে ধর্ম নামক অনুশাসন দিয়ে বেঁধে রেখে কীভাবে এই সমাজেরই একাংশ বৃহত্তর অংশকে শোষণ করে চলেছে, তারই কাহিনী পড়ি অনসূয়া মুখোপাধ্যায় ও অশোক বন্দোপাধ্যায়ের দুটি লেখায়। শিবকে মাটি ফুঁড়ে উপরে তোলা হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ভক্তির মায়াজাল সৃষ্টি করে ব্যবসা চলছে। প্রচার করা হচ্ছে যে, জনডিস বা ন্যাবা মালা পরলে কমে যায়। এমন অনেক অন্ধ বিশ্বাস আজও রয়ে গেছে। লেখকরা এইসব ঘটনার আসল কারণগুলো বুঝিয়ে বলেছেন। সবিত্রমোহন রায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে জানিয়েছেন, দাঁতে কখনো পোকা ধরে না। দাঁত ক্ষয়ে যায় অ্যাসিডে। কীভাবে এই ক্ষয় রোধ হয়, সেটাই বরং ভাববার।

জুনিয়র পি· সি· সরকারের একটি সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, কেউ কেউ যাদুবিদ্যা ও সম্মোহন বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে নিজেকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে প্রচার করেন। এঁদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন তিনি—সাঁইবাবার বুজরুকির কাহিনী শুনিয়ে। জ্যোতিষবিদ্যায় যে বিজ্ঞান নেই, তার প্রমাণস্বরূপ কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ দেখি সিদ্ধার্থ ঘোষের লেখায়। নিশির ডাক, ভূতে ধরা, ভর হওয়া—এগুলি যে হিস্টিরিয়া বা মৃগী রোগেরই উপসর্গ এই তথ্য গ্রামগঞ্জের মানুষ আজও বিশ্বাস করেন না। তাঁরা নানারকম গালগল্প তৈরি করেন এ নিয়ে। এ নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করেছেন ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও সোমনাথ ভট্টাচার্য।

উড়ন্ত চাকি বা উফো ও বারমুডা ত্রিকোণ—এসব যে নিতান্তই ফাঁদা-গল্প এবং ব্যবসায়িক বুদ্ধিই যে এর পেছনে, তা আজ অনেকটাই ফাঁস হয়ে গেছে। বিভিন্ন তথ্যের সমন্বয়ে রবীন চক্রবর্তী, সিদ্ধার্থ ঘোষ ও লেভ বোবরভ তা আলোচনা করেছেন। যেমন, মহাকাশ-গবেষণাই আজ বলে দিচ্ছে যে নক্ষত্রলোক থেকে প্রেরিত নক্ষত্র-যানের পৃথিবীতে আসার সম্ভাবনা প্রতি দশ হাজার বছরে একটি। তেমনি কী কী কারণে জাহাজ বা বিমান বারমুডা অঞ্চল থেকে নিখোঁজ হয়েছে, সেই সত্যও আজ উদ্‌ঘাটিত। এসব কুসংস্কারমূলক গুজবের প্রচারে সংবাদপত্রের জুড়ি নেই ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়, সংবাদপত্র তো এই ব্যবস্থায় ব্যবসারই একটি মাধ্যম।

আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটা নিয়ে তিনটি রচনা রয়েছে। দুটি মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের ও একটি শঙ্কর রাও-এর। জানা যায়, গভীর মন-সংযোগ ও দ্রুত পদক্ষেপই হচ্ছে সাফল্যের আসল চাবিকাঠি। পেছনে কোনো অলৌকিক শক্তির কাজ নেই। হাঁস জল মেশানো দুধ থেকে শুধু দুধটুকু পান করে নিতে পারে কিংবা হাতি গোটা বেল খেতে পারে বেল না ভেঙেই—এসব অন্ধ বিশ্বাস চুরমার করেছেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর। পাহাড়ের গুহায় যে সমস্ত শিলাস্তম্ভ নীচে বা ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়, সেগুলি চুনাপাথরের (ক্যালশিয়াম কার্বনেট) স্তূপ। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে অলৌকিক কোনো কিছু নেই। এই নিয়ে লিখেছেন হীরক দাশ।

খনার বচন মূলত কৃষিবিষয়ক গ্রন্থ, জ্যোতিষশাস্ত্র নয়। প্রাচীন কৃষিপ্রণালীর প্রামাণ্য গ্রন্থ 'কৃষিপরাশর'-এর সঙ্গে এর বহুলাংশে মিলই তা প্রমাণ করে। লেখক সৌমেন গুহর মতে, 'খনা' বলতে চাষীদেরই বোঝায়। তিনি বলেছেন, 'খনার বচনকে উপকথা বা প্রবাদের হাত থেকে বের করা আনা' দরকার। কারণ বচনগুলো 'বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ঠিক পাকা কৃষিতত্ত্ব।'

অ্যামোনাইট নামক এক প্রাগৈতিহাসিক জীবের জীবাশ্মই যে শালগ্রাম শিলা, তার বিস্তৃত বর্ণনা দেখি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর ও অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগ্ম রচনায়। নেপাল-হিমালয়ের মুক্তিনাথ ছাড়িয়ে দামোদর কুণ্ডে অসংখ্য এই শিলাখণ্ড চোখে পড়বে। পুরাকালে দুর্গই ছিল রাজ-রাজড়ার রক্ষাকর্তা। সেই দুর্গা কীভাবে কালের বিবর্তনে দশভূজা দুর্গায় রূপান্তরিত হয়, তার বর্ণনাও পাই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুরেরই নিবন্ধে। এলাহাবাদের প্রয়াগ গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর মিলনস্থল বলেই কথিত। সেই ধারণা পৌরাণিক ও ভৌগোলিক ব্যাখ্যার সাহায্যে খণ্ডন করেছেন প্রবীর গুপ্ত। ঐ অঞ্চলে নাকি সরস্বতীর অবস্থানই ছিল না।

দ্বিতীয় বইটির নাম 'বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ'। আগেই বলা হয়েছে, লক্ষ্যের দিক থেকে দুটি বইয়ের মিলের কথা। 'শুরুতে যা বলার' এই শিরোনামে 'উৎস মানুষ'-এর পক্ষে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'নামে "জ্যোতিষ" হলেও শুধুমাত্র জ্যোতিষ (Astrology)-এর মধ্যে এই বইয়ের বিষয়সূচিকে ধরে রাখা হয় নি। জ্যোতির্বিজ্ঞান, সমাজ, মানবমন, পঞ্জিকা, ভাগ্য, লটারি, হস্তরেখা, ভুয়াবিজ্ঞান ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক দিকগুলিকেও রাখা হয়েছে আলোচনার স্বার্থে।...বৈজ্ঞানিক বিচারের মধ্য দিয়ে ভুয়া বিশ্বাস আর পিছিয়ে পড়া বিভ্রান্তিকর ধারণাকে চিনিয়ে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।' অর্থাৎ লড়াইটা এখানেও কুসংস্কার ও অপবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে। পরস্পর পরিপূরক বই দুটি।

জ্যোতিষশাস্ত্রের দাপট আমাদের জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করছে, তা আজকের দৈনিক পত্রিকায় 'রাশিফল' বিভাগের কিংবা রাজ্যব্যাপী লটারি-র জনপ্রিয়তা থেকেই আঁচ করা যায়। 'উৎস মানুষ' বলতে চায়, এ সমস্তই 'কায়েমি মহলের অপসাংস্কৃতিক কার্যকলাপ' এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবে শুধু 'রাগ-আক্রোশে গলা ফাটিয়ে নয়'—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর 'ব্যাপক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে।'

এই বইয়েরও ২৮টি প্রবন্ধ 'উৎস মানুষ' পত্রিকার 'বিশেষ জ্যোতিষসংখ্যা' থেকে নেওয়া—অবশ্যই যথোচিত পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে। এখানেও ব্যাপক-অর্থে জ্যোতিষশাস্ত্রের সঙ্গে জড়িত নানা সংস্কার খুঁটিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক।

আলোচ্য বইটির প্রথমেই রয়েছে রামেন্দ্রসুন্দরের একটি বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ। এই যুক্তিবাদী রচনাটি ৮৪ বছর আগে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। রচনাটির এমনই গুণ যে আজও তা আমাদের সমানভাবে নাড়া দেয় ও ভাবায়। রামেন্দ্রসুন্দর স্পষ্টভাবে বলেছেন, যাঁরা ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসী তাঁদেরকে সেই বিশ্বাসের বিজ্ঞানভিত্তিক কারণ জনসমক্ষে দর্শাতে হবে। আরো বলেছেন, এক হাজার কোষ্ঠীর মধ্যে যদি নয় শ মেলে, তবেই এর ওপর আস্থা রাখা চলে, নচেৎ নয়।

দ্বিতীয় রচনাটি ফরাসী পর্যটক বার্নিয়ারের। তিনি সপ্তদশ শতকে ভারতে এসেছিলেন। সেই সময় জ্যোতিষী বা সাধু বা ফকিরদের লোক ঠকানোর যে ছবি তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা তাঁর 'ট্রাভেলস ইন দ্য মুঘল এম্পায়ার' বইতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তখনকার মানুষের মন এতই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল যে তারা বিশ্বাস করত, গ্রহনক্ষত্রের প্রভাব একমাত্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারে জ্যোতিষীরা। ঈশ্বরের কৃপা ও প্রসাদপ্রাপ্তির পথও বাতলে দিতে পারে সাধু ফকিরের দল। মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এই অপকর্মের জন্যে, বার্নিয়ার দায়ী করেছেন মূলত ব্রাহ্মণদের। নিজেদের পার্থিব সুখভোগ ও স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই তাঁরা এগুলি করত।

এরপরেই দেখি সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল'-এর সেই বিখ্যাত 'হাত গণনা' নামক কবিতাটি। এই কবিতায় হাত দেখানোর ব্যাপারটাকে কৌতুকে বিদ্ধ করা হয়েছে কবির অনবদ্য ভাষায়।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের ইতিহাস ও বিস্তার বর্ণনা করতে গিয়ে মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার দেখিয়েছেন, জ্যোতিষবিদ্যার সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই। অতীতে কীভাবে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা বন্ধ রেখে জ্যোতিষচর্চার প্রসার ঘটে তাও দেখি। সেই স্রোত বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এসেও সমান তালে বইছে। এটা রুখতে যে জাগরণের দরকার ছিল তা ইওরোপে হলেও এখানে হয় নি। পরিশেষে উনি বলেছেন, এই ধরনের অপবিজ্ঞানের ওপর ভরসা করলে মানুষের সমস্যা লাঘব হবে না, বরং বেড়েই চলবে।

মানুষের ভাগ্যের ওপর

গ্রহনক্ষত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। এই বিশ্বাসের ভিত্তি যে কতটাই নড়বড়ে তা রবীন চক্রবর্তী জ্যোতির্বিজ্ঞান দিয়ে বুঝিয়েছেন। ফলিত জ্যোতিষের বিবেচনার বিষয় আকাশে অবস্থিত কয়েকটি গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি ও আপেক্ষিক সরণ নিয়ে। যাদের দৃষ্টি মানুষের ওপর সরাসরি পড়ছে। মজার বিষয়, জ্যোতিষ গণনা কিন্তু সব জ্যোতিষ্ক নিয়ে নয়। এই তালিকায় পড়ে মাত্র ২৭টি। আরো মজার ব্যাপার, এই সে দিনের আবিষ্কার ইউরেনাস নেপচুন প্লুটো এতে স্থান পায় নি। গ্রহনক্ষত্র নিয়ে রাশিচক্র। এর সঙ্গে আছে কিছু কাল্পনিক শর্ত। যেমন, বৃষরাশির জাতক উগ্র স্বভাবের বা মেষরাশির জাতক গোঁয়ার হবে—এমন সব অলীক কল্পনার ছড়াছড়ি জ্যোতিষ শাস্ত্রে। এগুলি নিছক কল্পনা বলেই বিজ্ঞান সেখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

জ্যোতিষবিদ্যায় যে বিজ্ঞান নেই তা প্রমাণ করতেই ১৮ জন নোবেল বিজ্ঞানী সমেত ১৮৬ জন বিজ্ঞানী তাঁদের বিজ্ঞানভিত্তিক মতামত জ্ঞাপন করেন নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত 'দ্য হিউম্যানিস্ট' পত্রিকায়। সেই অভিমত থেকে জানা যায় যে, পৃথিবীর থেকে গ্রহনক্ষত্রগুলির দূরত্ব এতই বেশি যে পৃথিবীর ওপর তাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রায় উপেক্ষণীয়। তাই জন্মলগ্নে জাতকের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সেই প্রভাব কার্যকরী ভূমিকা নেয় তা মনে করার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। মানুষের ভবিষ্যৎ মানুষেরই ওপরে নির্ভরশীল, গ্রহনক্ষত্রের ওপরে নয়।

শঙ্কর ঘটক বলেছেন, কোষ্ঠীবিচার করে বিয়ে হলে সেই বিয়ে শাস্ত্রসম্মত হতে পারে। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্মত নাও হতে পারে। চার শ্রেণীর রক্তের মধ্যে কোন শ্রেণী কোন শ্রেণীর সঙ্গে ম্যাচ করে, কোন শ্রেণী আবার কোন শ্রেণীর সঙ্গে করে না, না করলে কী ভয়ঙ্কর ক্ষতি হতে পারে—তা প্রদত্ত তালিকা থেকে জানতে পারি।

এরপরে আসছে পঞ্জিকার কথা। লিখেছেন অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও পূবন রায়। বার তিথি নক্ষত্র করণ ও যোগ নিয়ে পঞ্জিকা। দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা চলে অ্যাস্ট্রনমিক্যাল এফিমারিস অনুসারে। আর অদৃক্‌সিদ্ধ চলে সূর্যসিদ্ধান্ত ধরে। গ্রহণের সময় অবশ্য অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকায় আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তই মানা হয়। ১৯৮২তে দুর্গাপূজার তারিখ নিয়ে গোল বেঁধেছিল। বছরে দুটি মল মাস হলে, কোনটি শুদ্ধ তাই নিয়ে বিতর্ক। লেখকরা আক্ষেপ করেছেন, কী কেন্দ্রীয় সরকার, কী রাজ্য সরকার, কেউই অদৃক্‌সিদ্ধ অবৈজ্ঞানিক মতামত বাতিল করতে সাহসী হন নি।

যেখানে অশিক্ষা আর দারিদ্র্য সেখানেই কুসংস্কার। কিন্তু যে মহলে এর ঠিক উল্টো অবস্থা, সেখানেও কি কুসংস্কার শিকড় গেড়ে বসেনি? এমন একটি জ্বলন্ত প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন অশোক রুদ্র। একেবারে প্রগতিশীলত্বর ঝুঁটি ধরে টান। লেখকের মতে, ইওরোপে বিজ্ঞানের লোকদের মধ্যে এমনটি নাকি কল্পনাই করা যায় না। সত্যিই কি তাই? তবে, পৃথিবীর বাইরে গিয়েও মহাকাশচারীরা ঈশ্বরকে স্মরণ করে বাইবেল পাঠ করেন কী করে?

শরীর ও মন অবিচ্ছিন্ন। মন ভালো মানে শরীর ভালো। ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, রত্ন তাবিজ পরে যদি কেউ উপকৃত হন তবে তা দ্রব্য গুণের জন্যে নয়। সম্পূর্ণভাবে অভিভাবন ও স্বাভিভাবন-এর জন্য। ইংরেজিতে যাকে বলা হয়, Suggestion এবং auto-suggestion—'যা কিনা সহজভাবে বললে বিশ্বাস, আশ্বাস, অভয়, পরামর্শ ইত্যাদি।'

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় লটারি নামক এক ধরনের আইনি জুয়া শ্রমজীবী মানুষকেও কুরে কুরে খাচ্ছে। শোষিত মানুষের মধ্যে এই ধরনের কৃত্রিম স্বপ্ন সৃষ্টি করা কি সুস্থ মনের পরিচয়? এমন সংগত প্রশ্ন খুঁজে পাই সিদ্ধার্থ ঘোষ ও মধুসূদন দত্তর লেখায়।

প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই সুশ্রুত সংহিতায় দেখি, রোগ প্রতিকারের উপায় হচ্ছে ওষুধ। রত্ন বা তাবিজ বা কবচধারণ নয়।

অন্যান্য রচনাগুলির বক্তব্যও এক—রোগ সারাতে বা ভাগ্য পরিবর্তন করতে জ্যোতিষবিদ্যা কোনো কাজেই আসে না। বইটিতে রত্নরাজির জাত ধর্ম নিয়ে একটি মূল্যবান তালিকাও রয়েছে।

দুটি বইতেই বিষয়ের অন্ত নেই—কারণ আমাদের কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণারও অন্ত নেই। যে কোনো বিষয়কে নিয়েই যেন তা গড়ে উঠতে চায়। এই সমস্ত অবিজ্ঞানের পেছনে যেমন রয়েছে সামাজিক-অর্থনৈতিক কার্যকারণ, তেমনি একে দূর করার জন্যও চাই সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তর। 'উৎস মানুষ'-এর এই দুটি বই রচনা বা সংকলনের মূলে সেই বোধই প্রবলভাবে আছে। নিছক কিছু কুসংস্কারের তালিকা ও বিবরণ পেশ এবং তা নিয়ে হা-হুতাশ করেই তাঁদের কাজ শেষ বলে তাঁরা মনে করেন নি। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'এক বিশেষ সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমিতে আজকের মানুষ ধর্মান্ধতা, অন্ধবিশ্বাস, পূর্বজন্ম-পরজন্ম, নিয়ত-নির্দেশিত জীবন—ইত্যাদি অবৈজ্ঞানিক বোধের শিকার, সেই পটভূমিই হল জ্যোতিষ বিশ্বাসের লালন গৃহ। তাই জ্যোতিষ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা করতে গেলে গোটা সামাজিক ছবিটার প্রয়োজন।' সব লেখাতেই সামাজিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ হয়েছে এমন হয়ত নয়, কিন্তু দুটি বইয়েরই প্রায় প্রতিটি রচনার অভ্যন্তরে রয়েছে বৃহত্তর সামাজিক দায়বোধ। এখানেই তাঁদের প্রচেষ্টার গুরুত্ব। □

নানা দৃষ্টিকোণ থেকে চলচ্চিত্র

তপন দাস

চলচ্চিত্র সমীক্ষা। প্রধান সম্পাদক ঃ মৃগাঙ্কশেখর রায়। ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ অফ ইণ্ডিয়া, কলকাতা ৭২। আগস্ট ১৯৮৩। ২০ টাকা।

পূর্বাঞ্চলে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সূচনা হয় ১৯৪৭ সালে, ক্যালক্যাটা ফিল্ম সোসাইটির গোড়াপত্তন থেকে। গোড়ার দিকে তার সদস্যসংখ্যা ছিল পঁচাত্তর জন। আশি সালের প্রথম দিকে শুধু কলকাতাতেই বিভিন্ন ফিল্ম সোসাইটির সদস্যসংখ্যা তের হাজারেরও বেশি। এই সাঁইত্রিশ বছরে দেশী বিদেশী চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সঙ্গে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত আলোচনা এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকা প্রকাশনার কাজও ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের একটা অংশ হিসাবে করা হচ্ছে। এইরকম নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত চলচ্চিত্র বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধের একটি সংকলন প্রকাশ করেছেন ফিল্ম সোসাইটিগুলির কেন্দ্রীয় সংগঠন ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ অফ ইণ্ডিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় বিভাগ। ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন, চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্ব, আঙ্গিক, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সাঁইত্রিশটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে এই বইয়ে। প্রবন্ধগুলির প্রথম প্রকাশকাল ১৯৫০ থেকে ১৯৮০। এই দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে চলচ্চিত্র সম্বন্ধীয় চিন্তাভাবনার একটা রূপরেখা হাজির করার চেষ্টা করা হয়েছে এখানে। লেখকদের মধ্যে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন-এর মতো চলচ্চিত্রকার থেকে অপেক্ষাকৃত তরুণ ফিল্ম সোসাইটির সভ্য পর্যন্ত অনেকেই রয়েছেন।

বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র বিষয়ক সিরিয়স প্রবন্ধের সর্বপ্রথম সংকলন সম্ভবত ৫০ সালে প্রকাশিত সিগনেট প্রেস-এর 'চলচ্চিত্র'। অনেকেই সে বই দেখেছেন। লেখক এবং সম্পাদক মণ্ডলীতে ছিলেন সত্যজিৎ রায়, চিদানন্দ দাশগুপ্ত প্রমুখ ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের প্রথম সারির সভ্যরা। সেই বইয়ে প্রকাশিত চারটি প্রবন্ধ পুনঃপ্রকাশ করা হয়েছে 'চলচ্চিত্র সমীক্ষা'য়। এই ব্যাপারটা আলাদা করে উল্লেখ করার একটা কারণ আছে। ১৯৫০ অর্থাৎ 'পথের পাঁচালী'রও আগে লিখিত এই

প্রবন্ধগুলি থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে যায়, চলচ্চিত্রচেতনার পরিপূর্ণ বিকাশ না হলে ‘ছিন্নমূল’, ‘নাগরিক’ বা ‘পথের পাঁচালী’র মতো শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয় না। চলচ্চিত্রবোধের পরিমণ্ডলটাই সেই পঞ্চাশ সালেই এত সম্পৃক্ত ছিল যে চলচ্চিত্র আন্দোলনের মূল ধারা অর্থাৎ চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে তার বহিঃপ্রকাশ এইরকম যুগান্তকারী স্বাক্ষর রাখতে পেরেছিল। উদাহরণস্বরূপ সংকলনে প্রকাশিত প্রথম প্রবন্ধটিই উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৫০ সালে লিখিত ‘চলচ্চিত্র আন্দোলন : কলকাতা ফিল্ম সোসাইটি’ প্রবন্ধটির লেখক চিদানন্দ দাশগুপ্ত। কলকাতা ফিল্ম সোসাইটির পত্তনের তিন বছর পর সোসাইটির অবস্থা এবং উদ্দেশ্য জানাতে গিয়ে তিনি লিখছেন, ‘সিনেমা নিয়ে সভাসমিতি করা ব্যাপারটা এখনো আমাদের দেশে প্রায় অপরিচিত। কালে ভদ্রে যা হয় তা নিতান্তই ব্যবসা ঘটিত ব্যাপারে, যেমন কাঁচা ফিল্মের ঘাটতি, চলচ্চিত্রজগতে ছাঁটাই সমস্যা কিংবা বোম্বাই-আগত জাঁদরেল পরিচালকদের সম্মানের জন্য চা সম্মেলনে বক্তৃতা। সাহিত্য বা চিত্রকলা নিয়ে যেমন আলোচনা চলে, সম্মেলন হয়, বৈঠক বসে, গুরুত্বপূর্ণ বই, প্রবন্ধাদি বেরোয়, সিনেমার ক্ষেত্রেও যে তা হতে পারে এটা নাক-উঁচু শিক্ষিত মহলে হাস্যকর, ছাপোষা বাঙালির কাছে অবিশ্বাস্য, সিনেমামহলের কাছে নিষ্কর্মা যুবকদের খামখেয়াল।...গত প্রায় তিন বছরে কলকাতা ফিল্ম সোসাইটির খানিকটা নামডাক হয়েছে, অন্তত আমাদের অস্তিত্বটা অনেকেই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু এখনো আমাদের উদ্দেশ্য বা ক্রিয়াকাণ্ড সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা অনেকেরই নেই।... আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষা আর সামাজিক শক্তি হিসেবে চলচ্চিত্র সম্পর্কে লোককে সচেতন করে তোলা এবং তার মধ্য দিয়ে উন্নততর চলচ্চিত্র সৃষ্টিকে সাহায্য করা। সিনেমা যে বাগানবাড়ির ব্যাপার নয়, তেল নুনের ব্যবসার মতো আরেকটা ব্যবসাও নয়, আজকের দিনে সবচেয়ে ব্যাপক এবং সমাজ-জীবনে রীতিমতো প্রভাবশালী একটা শিক্ষা, কাজেই শিক্ষিত লোকের চর্চার যোগ্য—এটা জোর গলায় প্রচার করা ও প্রমাণ করা কলকাতা ফিল্ম সোসাইটির অন্যতম কাজ।’

‘পথের পাঁচালী’র আগে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে বাংলাদেশে বহু ছবি হয়েছে, ভালো হলেও হয়েছে, মন্দ হলেও হয়েছে। ঘটনাকে অস্বীকার করলে ইতিহাসকে অস্বীকার করা হয়। আজকাল এমন একটা ভাব করা হয় ৫৬-র আগে যেন আর জানার কিছু নেই। ২৬৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে দেখি, ‘...চলচ্চিত্র আমাদের দেশে সর্বকনিষ্ঠ শিল্পমাধ্যম। শুধু যে পূর্বকৃতির উদাহরণ বা অনুশাসন এতে

অনুপস্থিত তাই নয়, এর বাল্য ও কৈশোরে যাঁরা পরিচালক ছিলেন তাদের শিক্ষা বা প্রতিভার কোনো বালাই ছিল না বলে, লোককৃষ্টির উত্তরাধিকার থেকে, কিছুদিন আগে অবধি, ভারতীয় চলচ্চিত্র একেবারে বঞ্চিত ছিল।’ কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। হীরালাল সেন, নিরঞ্জন পাল, ধীরেন গাঙ্গুলি, শিশির ভাদুড়ি, নীতিন বসু, বি এন সরকার, দেবকী বোস, প্রমথেশ বড়ুয়া, মধু বসু—এঁদের কারো শিক্ষার বালাই ছিল না একথা বোধহয় বলা যায় না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বহু লেখক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কে এসেছিলেন। তবুও এখন যাকে চলচ্চিত্র-ভাষা বলা হয় তার সঙ্গে সেযুগের ছবির এত পার্থক্য কেন, এর সঙ্গে বাঙালি মানসিকতা, রুচি, সমাজ সংস্কৃতির কী যোগ ছিল—এসব ঐতিহাসিকের অনুসন্ধানের বিষয় হওয়া উচিত। এবং এর পেছনে সেসময় বহুল-প্রচারিত হলিউডের জনপ্রিয় ছবিগুলির কী প্রভাব আছে তাও আলোচনার বিষয় হতে পারে।

অতীতের সঙ্গে কথোপকথনের এই সম্পর্কসূত্রের একটা খোঁজ পাওয়া যায় কমলকুমার মজুমদারের ‘চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহার’ প্রবন্ধে। মূলত গানের ব্যবহার নিয়ে হলেও সামগ্রিক ভাবে পুরনো বাংলা ছবির একটা পরিচয় এতে পাওয়া যায়। ১৯৫০ সালে প্রকাশিত এই প্রবন্ধে কমলকুমার লিখছেন, ‘আমাদের দেশ ছাড়া সব দেশের লোক আশ্চর্য হবে শুনে, তাদের একমাত্র শোকের জায়গা যে শ্মশান সেখানেও আমরা গান করি। আগেই বলেছি, জীবন আমাদের অনেক বড়। আমরা কথা বলি কম অর্থাৎ আমরা কম বলায় অনেক বলি। গভীর আমাদের জীবনের সুর, তাই কথাও কম, তাই অনেক কথার অবকাশ। তাই আমাদের দেশের ছবিতে যে গান থাকবে এ আর এমন আশ্চর্য কি। আমাদের দেশের ছবিতেই তো গান থাকবে। পৃথিবীর অন্য কোন দেশের ছবিতেই এতো গান নেই। তারা গানের জন্য, বিশেষ করে গানের জন্যই, আলাদা করে ছবি তোলে; তার নাম দেয় ‘গীতি-চিত্র’। তারা গান বলতে বোঝে হয়ত চটুল আনন্দের রূপকে। আমাদের গানে আনন্দের চটুলতাও আছে, গভীরতাও আছে; আবার বেদনার অতলস্পর্শী স্তব্ধতাও আছে সুরে। তখন অবাক হয়ে কথা হারায়। তাই আমরা যেখানে সেখানে যখন তখন কথার আগে গান খুঁজে পাই। কিছু বা বলি কিছু বা শুনি গানে। আমাদের ছবির এটা নিজস্ব রূপ, একমাত্র রূপ বলতে পারি ;...আমাদের ছবির এই নিজস্ব রূপটাই ভারতীয় ছবির প্রাণ। বিদেশী ছবিকে শুধুই নকল করতে গিয়ে ভালো কিছু আমরা পাইনি। আমাদের মনে রাখা দরকার আমাদের রিয়ালিটি আলাদা। কণ্ঠসঙ্গীত ছাড়া আমাদের উপায় নেই। আমাদের গানের ট্র্যাডিশন সম্পূর্ণ ভিন্ন বিদেশীদের থেকে।’

১৯৪৮ থেকে ৫১ পর্যন্ত ঋত্বিক ঘটক ভারতীয় গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে অভিনেতা-পরিচালক হিসেবে যুক্ত ছিলেন। সিনেমা জগতে

পুরোপুরি তখনও আসেননি। এইরকম সময়ে লেখা তাঁর প্রবন্ধ 'অভিনয়ে নব অধ্যায়'। মঞ্চ এবং চলচ্চিত্র অভিনয়ের একটা তুলনামূলক আলোচনার প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, 'চিত্রের আঙ্গিক সম্পাদনা, এ ধারণা পুরনো দিনের ; অভিনেতার অভিনয়কে কাঁচামাল হিসাবে গ্রহণ করে পরিচালক ও সম্পাদকের অভিনয়বোধ দেখানো যাবে এ মতেরও পরিবর্তন তাই দরকার। যৌথ শিল্পের সবচেয়ে বড় কথা সমবেত দৃষ্টিভঙ্গি ঃ সকলের মধ্যেই এ চেষ্টা থাকা দরকার।' ১৯৬৪-৬৫ তে লেখা করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'সমাজবাস্তব এবং বাংলা ছবি' অত্যন্ত সহজ ভাষায় বহুমাত্রিক বাস্তবতার স্তরকে স্পর্শ করে। চলচ্চিত্রের সমাজসচেতনতার প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, 'নতুন অর্থনৈতিক জীবন মধ্যবিত্ত জীবনের গৃহকোণ-প্রীতির চিরপুরাতন ধারাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। একটা নতুন ধনী সমাজ গড়ে উঠছে, যে জীবনের স্বাদ ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে, নিত্য নতুনের আকর্ষণ ছাড়া সে বাঁচতে পারে না। অপর পক্ষে আছে 'ক্রুদ্ধ তরুণের দল' যাদের মন বিদ্রোহ করছে সমস্ত অসঙ্গতির বিরুদ্ধে। ইয়োরোপে যা দুই শতাব্দী ধরে পরিণতি লাভ করেছে, ভারতবর্ষে তাই ঘটেছে কয়েক দশকের ভিতরে। এ অবস্থায় বহু জটিল সম্পর্ক গড়ে উঠতে বাধ্য। এই পটভূমিতেই ভারতের শহরে ও গ্রামে নতুন মেয়ে পুরুষ গড়ে উঠছে। যে কৃষক লাঙল দিয়ে চাষ করে, ও যে কৃষক ট্রাক্টর চালায় তাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য, যে লোক তাঁত চালায় ও যে লোক হেভি মেশিন নিয়ে নাড়াচাড়া করে তারা আলাদা।' সিনেমার সামাজিক অর্থনৈতিক বিষয়ে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ আছে সংকলনে, কিন্তু প্রেক্ষাপটের এমন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অন্য কোথাও দেখতে পাই নি।

পাঁচের ও ছয়ের দশকে অর্থাৎ ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে লেখা প্রবন্ধগুলির পাশাপাশি সাতের দশকের চলচ্চিত্র চেতনার কিছু নিদর্শন তুলে ধরা যেতে পারে, তাতে পাঠকের পক্ষে একটা তুলনামূলক চেহারার পরিচয় পাওয়া সহজ হবে। সংকলনের ১০১ পৃষ্ঠায় চলচ্চিত্র আঙ্গিক সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে দেখি ঃ 'চলচ্চিত্রের প্রাথমিক গুণ দৃশ্যতা। তখন ফ্রেমের অন্তর্বর্তী চিত্রকল্পের সবই অখণ্ড মনোযোগের গণ্ডিতে আসেনি সমান্তরাল ভাবে। কিন্তু দৃশ্যের এই খণ্ডিতাংশগুলি এক চিত্রবেষ্টনীর মধ্যে একটি বিশেষ ঐক্য লাভ করল। এতদিন চলচ্চিত্রের ছাড়া-ছাড়া সমস্ত ছড়ানো তথ্যের অস্পষ্টতা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে তারা সুনির্দিষ্ট হয়ে উঠল। সেই ঐকতানিক রূপকল্প দাবি জানালে "আমাকে দেখো"। কিন্তু, অনুভবের বেলা পথ হলো ভিন্নতর। দৃষ্টিলোক থেকে চিন্তালোকে উত্তরণ ঘটলো। বা বলা যায় বুদ্ধিময়তার পরিপ্রেক্ষণে। স্রষ্টা তাদের কপালে অস্তিত্ব গৌরবের টিকা দিয়ে বললেন,"এরা আছে"। চলচ্চিত্র তার বলিষ্ঠ আঙ্গিক খুঁজে পেল।' এই বাক্যসমষ্টির অর্থ কী? এটি কি কোনো মৌলিক সাহিত্যকর্ম, না কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিশ্লেষিত রূপ? কী অর্থ হয় এসব লেখার? অথবা ১৮৭ পৃষ্ঠায় চলচ্চিত্রে রাজনীতি বিষয়ক একটি প্রবন্ধে লেখা দেখি, 'এদেশের প্রতিবাদী চলচ্চিত্র "দেবী।" এ পর্যন্ত দেশের চলচ্চিত্রে প্রতিবাদী ভাষার সবচেয়ে বিস্ময়কর শক্তির প্রকাশ "অশনি সংকেত"-এর সমাপ্তি দৃশ্য...'ইত্যাদি। এটা কি প্রবন্ধ লেখকের মত, না স্বীকৃত তথ্য, তার কোনো পরিষ্কার ইঙ্গিত কিন্তু প্রবন্ধটিতে পাওয়া যায় না। লেখকের নিজস্ব মত বা ধারণা হলেও আপত্তির কিছু নেই, কিন্তু ছাপার অক্ষরে সেই ধারণার প্রকাশ করতে গেলে তার জন্য কিছু যুক্তি হাজির করা উচিত যা থেকে অন্তত সাধারণ পাঠক বুঝতে পারেন লেখকের মতটা গ্রহণযোগ্য কিনা।

চলচ্চিত্রের অর্থনীতি প্রসঙ্গে তিনটি প্রবন্ধ আছে সংকলনে। চিদানন্দ দাশগুপ্তর 'নিবারণবাবুর সমস্যা' এবং সুধী প্রধানের দুটি প্রবন্ধ 'বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সংকট' ও 'বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাস প্রসঙ্গে'। চিদানন্দবাবুর প্রবন্ধটি ১৯৫০ সালে লেখা যখন একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি তৈরির খরচ, বিজ্ঞাপন এবং দশটি কপি সহ, মোট ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ছিল। সেটা এখন সাদাকালোয় তোলা ছবির ক্ষেত্রেই অন্তত ৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকায় দাঁড়াবে, রঙিন হলে তো আরো বেশি। কিন্তু সেই সোয়া লক্ষ টাকার ছবির প্রযোজনা, পরিবেশনা এবং প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে যে যে সমস্যার মুখোমুখি হতে হত তার পুঙ্খানুপুঙ্খ, তথ্যনির্ভর একটা চেহারা পাই এই প্রবন্ধে। নিবারণবাবু নামে এক কাল্পনিক প্রযোজককে 'আঁখিজল' বা 'কালের গতি' নামে এক ছবি তৈরি করার পর যে দুরবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল, হাসির ছলে চিদানন্দবাবু তার এক গল্প বানিয়েছেন। কিন্তু হাসির আড়ালে যে সংকটের চেহারাটা প্রকট হয়ে উঠেছে তা ভয়াবহ। আজ ৩৪ বছর পার করে দিয়ে বাংলা দেশের চলচ্চিত্র-ব্যবসার সেই সামন্ততান্ত্রিক বিলিব্যবস্থার চেহারাটা একটুও পালটায় নি, বরং বহুগুণে বেড়েছে।

সুধী প্রধানের প্রবন্ধ দুটির নানা পরিসংখ্যান থেকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে জড়িত কলাকুশলীদের অর্থনৈতিক অবস্থার একটা আঁচ পাওয়া যায়। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ১৯৭০ সালের সংশোধিত বেতন হারে অদক্ষ এবং অতি দক্ষ কর্মীর বেতনহার মাসিক মোট ১৬৬ টাকা থেকে ৪১৫ টাকার মধ্যে ওঠানামা করে। কোটি কোটি টাকার লগ্নি এবং প্রমোদকর যে শিল্প থেকে আসে তার নেপথ্য অংশীদারদের অবস্থাটা যে কিরকম তা এই বেতনহার থেকেই বোঝা যাবে।

'চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনা' প্রসঙ্গে একটি অনবদ্য প্রবন্ধ রয়েছে ৮৬ পৃষ্ঠায়। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, শ্যাম বেনেগাল, কুমার সাহানী-র মতো পরিচালকদের শিল্প-নির্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্তর চেয়ে যোগ্যতর আর কে আছেন ভারতবর্ষে যিনি এই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে পারেন? চলচ্চিত্রের শিল্প নির্দশনা যে সৃষ্টিধর্মী কাজ তার অসংখ্য পরিচয় পাওয়া গেছে এই শিল্পীর জীবদ্দশায়। উল্লিখিত প্রবন্ধেও তাঁর গভীর শিল্পবোধের স্বাক্ষর পাওয়া যায়। প্রবন্ধটি শুরু করেন তিনি এইভাবে ঃ 'যে লোক কাজ করেই নিজের অস্তিত্বের সার্থকতা বুঝতে পারে তাকে প্রবন্ধ লিখতে বলার মতো কঠিন কাজ আর কিছুই হতে পারে না। আমি চলচ্চিত্রের 'সেট তৈরি করি ঃ কোন সেট, কোন দৃশ্যের মুড ও বিশ্বাসযোগ্যতাকে কতটা দর্শকদের কাছে তুলে ধরে সেটা বিবেচনা করা আমার কাজ। কথা সাজিয়ে একটা গোছানো প্রবন্ধ খাড়া করা আমার পক্ষে সোজা নয়।' তারপর অত্যন্ত স্বচ্ছন্দভাবে খানিকটা স্মৃতিচারণা করেছেন, দেশবিদেশের কয়েকটা উল্লেখযোগ্য ছবির সেট ডিজাইন নিয়ে বিশ্লেষণী আলোচনা করেছেন, শিল্পনির্দেশনার কিছু টেকনিকের উল্লেখ করেছেন, নিজের করা কিছু কাজ সম্বন্ধে বলেছেন এবং সবশেষে লিখেছেন, 'দর্শকরা যদি ভালো জিনিস প্রত্যাশা করেন তাহলে আজ হোক কাল হোক, ফিল্ম নির্মাতাদের সেই প্রত্যাশা পুরণ করতেই হবে। ফিল্ম নির্মাণ কোনো একজন মানুষের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে না, এই নির্মাণ কাজের জন্যে সকলকেই ভালো ছবির কথা মনে মনে ভাবতে হবে, প্রত্যেক বিভাগের আন্তরিক অবদানের উপরেই ছবির উৎকর্ষ নির্ভর করবে। ক্যামেরা—সাউণ্ড ইত্যাদির মতো আর্টও একটা প্রধান বিভাগ—এখানে আর্ট মানে শিল্প-নির্দেশনা। সবগুলো বিভাগের অবদানের সার্থকতাতেই জন্ম হয় সার্থক আর্টের—এখানে আর্ট মানে শিল্প বা সৃষ্টি।'

সত্যজিৎ রায়ের দুটি প্রবন্ধ 'চলচ্চিত্র-চিন্তা' এবং 'চলচ্চিত্র রচনা-আঙ্গিক-ভাষা ও ভঙ্গি' আর মৃণাল সেনের একটি প্রবন্ধ 'সিনেমার দর্শন' প্রত্যেক চলচ্চিত্রের ছাত্র এবং আগ্রহীদের অবশ্যপাঠনীয়। এঁদের শিল্পকর্মের পেছনে কী ধরনের তাত্ত্বিক চিন্তা এবং বিশ্লেষণী মনোভাব কাজ করে তার খানিকটা পরিচয় তো পাওয়া যাবেই, উপরন্তু অনুভূতি ও তাঁদের মূল্যবান অভিজ্ঞতার অনেক কথাও জানা যাবে। দুর্গার মৃত্যুর পর হরিহরের বাড়ি ফিরে আসার দৃশ্যে প্রতিটি শটের বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন, কেন ঐ বিশেষ ক্যামেরা—অ্যাঙ্গল, ঐ মুড ছবিতে অবশ্যম্ভাবী ছিল। হরিহর বাড়ি ফিরে ছেলেমেয়েদের নাম ধরে ডাকে, সেই মুহূর্তের বর্ণনায় সত্যজিৎ রায় লিখছেন, 'সর্বজয়া কি সে ডাক শুনেছে? শুনেছে। এখানে তার অভিব্যক্তি কী হবে? বাড়াবাড়ি কিছু হওয়া অসম্ভব, কারণ কান্নার বাঁধ এত সহজে ভাঙতে পারে না। তাই

সামান্য একটা মুভমেন্ট, এবং তাই ক্লোজ-আপের প্রয়োজন। সাদা শাঁখাটা আলগা হয়ে ইঞ্চি খানেক নেমে এল। এই যথেষ্ট—কারণ এর আগে দীর্ঘক্ষণ ধরে তাকে অনড় অবস্থায় দেখেছি। এই শাঁখার দোলাই যেন তার বুকের দোলা। এতক্ষণে হরিহর কোথায় ?' চিত্রনাট্য রচনার প্রতিটি ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন করা এবং তার উত্তর খোঁজা একটা জরুরি ব্যাপার আত্মসচেতন শিল্পীর কাছে।

চলচ্চিত্র ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ে অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'সমকালীন বাস্তবতার চিত্রণে বাংলা চলচ্চিত্র' শিল্পের সমকালীনতা প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। চলচ্চিত্র আলোচনায় অনেকেই 'প্রতিবাদী', 'পরীক্ষামূলক বামপন্থা'(?) 'স্যোশাল রিয়ালিটি' ইত্যাদি শব্দপুঞ্জ ব্যবহার করে প্রগতিবাদী সাজতে চান এবং এর বাইরে কিছু বললেই তা শুদ্ধ শিল্পের পক্ষে মত প্রকাশ করা হল এমন একটা ভাব করেন। ব্যাপারটা কিন্তু অত সহজে নিষ্পত্তি করে দেওয়া যায় না। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে যথার্থই লেখেন, 'যে শিল্পীর মানবতাবোধ আছে, তিনি কি তাঁর সমকালের মানুষের দুঃখযন্ত্রণার দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারেন ? এই তাকানোটায় কম বেশি আছে। কেউ এ ব্যাপারে "কমিটেড" নন। কিন্তু মহৎ সৃষ্টির কালে তিনিও অজ্ঞাতসারে অথবা সচেতন ভাবে "কমিটেড" হয়ে যান। চেখভের সুন্দর গল্পগুলি তার অপরূপ উদাহরণ। এমনকী যে সংগীত বিমূর্ত-প্রায়, সেখানেও দেখা গেছে, মহৎ স্রষ্টা তাঁর প্রেরণা পেয়েছেন সমকালীন জগৎ থেকে।' তৎকালীন সাহিত্য এবং বিশ্ব চলচ্চিত্র, বিশেষত সোভিয়েত চলচ্চিত্রের নিরিখে সমকালীন বাংলা সিনেমার বাস্তব নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেন, 'সেকালের প্রমথেশ বড়ুয়া বা নিউ থিয়েটার্স-এর ছবির মধ্যে সময়ের পদচিহ্ন যেভাবে পড়েছে তা অনুল্লেখযোগ্য নয়। ...যেকালে বাস্তবতা ছিল বেশ সহনীয়, তাকে সহনীয় দেখানো (যা বড়ুয়া সাহেব করেছিলেন) এবং যেকালে বাস্তবতা ভয়ঙ্কর রকমের দুঃসহ তাকে সহনীয় বা মৃদু অসহনীয় দেখানো (যা বাংলাদেশের এখনকার প্রায় সব পরিচালক করে থাকেন, দু-তিন জন ছাড়া) এর মধ্যে সততার প্রশ্নে বিরাট পার্থক্য আছে।' পরবর্তী পর্যায়ে আধুনিক বাংলা ছবির ক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক এবং মৃণাল সেনের কিছু ছবির গভীর আলোচনা করেছেন। কিছু কিছু দৃশ্য বর্ণনা করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন, প্রতীকী তাৎপর্যময়তায় পর্যবেক্ষণ করেছেন একেবারে নিজস্ব ভঙ্গিতে। সাতের দশকের রক্তাক্ত দিনগুলি উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, 'এই সময় দুটি উল্লেখযোগ্য ছবি সেই অবস্থার দুটি ভিন্নচিত্র উপস্থিত করল, সত্যজিৎ রায়ের "প্রতিদ্বন্দ্বী" এবং মৃণাল সেনের "ইন্টারভিউ"। দুটি ছবিতেই নতুন বাস্তবতাকে বোঝার চেষ্টা ছিল, ভিন্নভাবে।' তারপর 'অশনি সংকেত' পর্যন্ত নানা ছবি নিয়ে প্রবন্ধটিতে আলোচনা আছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে মতপার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু চলচ্চিত্র সম্পর্কীয় এরকম সুচিন্তিত প্রবন্ধ খুব বেশি লেখা হয় নি এদেশে।

উল্লিখিত প্রবন্ধগুলি ছাড়াও 'চলচ্চিত্র সমীক্ষা'য় আরো বহু প্রবন্ধই রয়েছে। নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চলচ্চিত্রকে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। কোথাও অকারণে কিছু ইংরেজি উদ্ধৃতি বসিয়ে আলোচনার জ্ঞানগর্ভতা প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে, কোথাও বা বেশ রাগী রাগী একটা আধুনিক ভাব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, কেউ বা নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকে 'বলিষ্ঠ' কিন্তু অতিসরল আলোচনা করেছেন। আবার চলচ্চিত্র সমালোচনার মাপকাঠি কী হবে তা নিয়ে যুক্তিনির্ভর মতামতও আছে। সব মিলিয়ে 'চলচ্চিত্র সমীক্ষা' একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংকলন যা ভবিষ্যতের চলচ্চিত্র-আলোচনার ক্ষেত্রে আকরগ্রন্থ হিসেবে কাজ করবে। তবু যদি সম্পাদক মণ্ডলী প্রবন্ধগুলিকে বিষয়ানুক্রমিক ভাগ না করে কালানুক্রমিক ভাগ করতেন তাহলে চলচ্চিত্রের মূলধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলচ্চিত্র-আলোচনাও কীরকম ক্রমশ অগভীর হয়ে উঠছে, তার একটা তুলনামূলক প্রমাণ পাওয়া যেত। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, সেরকম ব্যতিক্রম তো চলচ্চিত্র-নির্মাণের ক্ষেত্রেও রয়েছে।

বই-এর খবর

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় বেঁচে থাকতে বেরিয়েছিল 'চিত্রকর'-এর প্রথম সংস্করণ। প্রকাশক অরুণা প্রকাশনী। মলাটও এঁকেছিলেন বিনোদবিহারী নিজেই। তারপর আরও একটি সংস্করণ হয়েছে এ বইয়ের। এরও অনেক আগেই আমরা দেখেছি সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র 'ইনার আই'—যার নায়কও বিনোদবিহারী। অনেকদিন ধরে কাজ চলছিল 'চিত্রকথা' বইটির। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের প্রকাশিত সমস্ত লেখা নিয়ে বেরল এই সেদিন। সম্পাদনা কাঞ্চন চক্রবর্তী। প্রকাশক অরুণা প্রকাশনী। বইয়ের মোট চারটি অংশে শিল্পী লিখেছেন—পট, লোকশিল্প, টেরাকোটা, রান্নাবান্না, নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের ছবি, রবীন্দ্রনাথের ছবি, গগনেন্দ্রনাথ, জ্যাকব এপস্টাইন, শিল্পী উইলিয়াম ব্লেক, রামকিংকর, অসিতকুমার হালদার—এমনি নানা বিচিত্র বিষয়। শুধু বাংলাই নয়, ওঁর ইংরেজি লেখাও আছে এই সঙ্গে। আর আছে বিনোদবিহারীর রচনাপঞ্জী। এরকম একটা কাজ যে হলো, সেটা ভাবতেই ভালো লাগছে।

প্রেমচন্দের 'দুই সখি' বেরল তিনসঙ্গী থেকে। অনুবাদ করেছেন সুবিমল বসাক। চিঠি আর চিঠির উত্তর—এই ভাবেই এগিয়েছে এ উপন্যাস। 'অন্নদাশঙ্কর রায়ের শ্রেষ্ঠগল্প' ছাপলেন বাণীশিল্প। সংকলনে রয়েছে উপযাচিকা, দুকান কাটা, হাসন সখী, নারী, অপ্সরা, রূপদর্শন, কামিনী কাঞ্চন, রানীপসন্দ, ঠিকানা, পরীর গল্প, মীনপিয়াসী, ও হাজারদুয়ারী, জন্মদিনে, রাবণের সিঁড়ি, সোনার ঠাকুর মাটির পা, আঙিনা বিদেশ, স্বস্ত্যয়ন, সব শেষের জন, বিনা প্রেমসে না মিলে—এই সব গল্প। 'অমৃতা প্রীতম শ্রেষ্ঠ রচনা সম্ভার' ছেপেছেন মডার্ন কলম। সম্পাদনা ও অনুবাদ অসিত সরকার এবং দিব্যেন্দু বন্দোপাধ্যায়ের। সংকলনে রয়েছে একটি উপন্যাস—ডাক্তার দেব। পনেরটি গল্প, নটি কবিতা।

তরুণ গল্পকারদের মধ্যে সাধন চট্টোপাধ্যায় অবশ্যই একটি উল্লেখযোগ্য নাম। বুকমার্ক থেকে ওঁর গল্প সংকলন 'মহারাজা দীর্ঘজীবী হোন' প্রকাশিত হয়েছে। জয়ন্ত জোয়ারদারের গল্প সংকলন 'কল্লোলিনী তিলোত্তমা' বেরল সুবর্ণরেখা থেকে। 'দ্বাদশ পাতাল'—এই নামের একটি গল্প সংকলন বেরিয়েছে উদয় প্রকাশন থেকে। লেখকেরা সবাই শোনাতে চেয়েছেন অন্য এক ভুবনের গল্প। এ সংকলনের লেখকসূচিতে আছেন মহাশ্বেতা দেবী, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু পত্রী, কুমার মিত্র প্রমুখ।

প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের 'উইলিয়াম উইনস্টানলি পিয়ার্সন' বেরিয়েছে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে। বহুমুখী প্রতিভাধর পিয়ার্সন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে বই লিখে স্বদেশে অন্তরীণ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সেক্রেটারি হিসেবে জাপান, ইওরোপে ঘুরেছেন। শিক্ষকতা করেছেন শান্তিনিকেতনে। প্রচুর ছবি এবং তথ্যসমৃদ্ধ এ বই অবশ্যই আদর পাবে পাঠকের কাছে।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আমার কবিতা'-র প্রকাশক বাণীশিল্প। ব্রতত্তী বিশ্বাসের কবিতার বই 'গুপ্তঘাতক নিসর্গ' এবং সফোক্লেসের 'আন্তিগোনে' (অনুবাদক শিশিরকুমার দাস) ছাপলেন প্রমা।

কলকাতা নিয়ে অনেক ধরনের লেখা লিখেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী। ওঁর নতুন বই 'কলকাতার গল্পসল্প' ছেপেছেন আনন্দ পাবলিশার্স। ছোটদের মতো করে কলকাতার অনেক গল্পকথা শুনিয়েছেন লেখক। শচীন দাশের ছোটদের বই 'হানাবাড়ি'-র প্রকাশক করুণা। শ্যামল সেনের ছড়ার সংকলন 'আংলা দিনের বাংলা' ছাপলেন অগ্রণী বুক ক্লাব।

সন্দীপ দত্তের সম্পাদনায় 'জীবনানন্দ প্রাসঙ্গিকী' বেরল। প্রকাশক বাংলা সাময়িকপত্র পাঠাগার ও গবেষণা কেন্দ্র। সংকলনের লেখকরা হলেন অশ্রুকুমার সিকদার, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, হরপ্রসাদ মিত্র, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার। □

শুভ্রা ভট্টাচার্য

জাতিভেদপ্রথা সামাজিক অভিশাপ

শরসন্ধান। জাতিভেদবিরোধী সমিতির মুখপত্র।
সম্পাদক দেবী চ্যাটার্জী সেপ্টেম্বর ১৯৮৩।
৪৯২ লেক গার্ডেন্‌স্‌, কলকাতা ৪৫। দাম ১·৫০ টাকা।

'শরসন্ধান' পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে। বছর চারেক বয়স হলেও পত্রিকাটি খুব নিয়মিত নয়। অবশ্য তাতেও একটা চরিত্র এঁরা তৈরি করতে পেরেছেন। পত্রিকাটির সম্পাদকও পরিবর্তিত হয়েছে, তবে এঁদের মূল বক্তব্য জাতিভেদবিরোধিতা বেশ তীব্রভাবে বর্তমান রয়েছে সব সংখ্যাতেই।

প্রথম সংকলনের ভূমিকায় সম্পাদক ঘোষণা করেছিলেন, 'জাতিভেদ প্রথা ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনে সম্ভবত সর্বাধিকভাবে নির্মম অভিশাপ' এবং এই অভিশাপ মোচনের জন্য 'সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতির পরিপূরক হিসেবে কিছু প্রয়াস চালাতে চাইছি।' তাই এঁদের গল্প, কবিতা প্রবন্ধ সব লেখারই মূল বিষয় এই জাতিভেদ প্রথা। সব সময়ই সমস্যাটি যে লেখার অঙ্গীভূত হয়েছে এমন হয়ত নয়, ফলে কখনো কখনো লেখা এবং সমস্যার মধ্যে ভেদ প্রকট হয়েও পড়ে। সেটা খুবই পীড়াদায়ক সন্দেহ নেই, বিশেষত গল্প কবিতা কিংবা নাটকে যদি সমস্যাটি চাপানো হয়, যদি তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত না হয়, তাহলে সবই তো মাঠে মারা যায়। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, সে অভিজ্ঞতা সর্বাঙ্গীণ নয়।

দেবী চট্টোপাধ্যায় একটি নাটক অনুবাদ করেছেন প্রেমচন্দের গল্পের ছায়া অবলম্বনে নাম, 'দুধের দাম'। নাটকটির বিষয়টি খুবই ভালো, নাটকাকারে উপস্থাপনাটিও মন্দ হয় নি, কিন্তু অবাঙালি নিচু জাতের 'হামি' 'কেনে' আর 'লিব'র ঠ্যালা বড় বিষম। এদের চরিত্র জীবন্ত করতে গেলে অনেক অভিজ্ঞতা লাগে, আসলে নিচু জাত সম্পর্কে উঁচু জাতের অনভিজ্ঞতা এই অপচেষ্টার জন্ম দেয়। ফলে জাতিভেদ দূরীকরণের পক্ষে প্রয়োজনীয় চেতনাই গড়ে উঠতে পারে না।

এঁদের প্রবন্ধগুলো সম্পর্কে অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করতে হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি প্রবন্ধ 'জাতিভেদ ও বামপন্থা' এবং 'প্রগতি বনাম জাতিভেদ'। তাঁর মতামত যে সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য এমন হয়ত নয়, হয়ত বহুক্ষেত্রেই তা বিতর্কমূলক—কিন্তু লেখক বড় জমিতে সমস্যাটিকে এনে দাঁড় করিয়েছেন। প্রথম প্রবন্ধটিতে জাতিভেদ সমস্যার উপর গুরুত্ব আরোপ না করার জন্য তিনি প্রায় সমস্ত বামপন্থী দলকেই সমালোচনা করেছেন। শেষ করেছেন প্রবন্ধটি এই বলে, 'ভারতে যেহেতু জাতিভেদই প্রথম ও প্রধান অপসাংস্কৃতিক কাঠামো, এখানে অতএব শ্রেণীসংগ্রামের বাইরেও ব্যাপক জাতিভেদ বিরোধী গণআন্দোলনের প্রয়োজন স্বীকার্য। এদেশের বামপন্থী দলগুলোকে অতএব তাদের শ্রেণীসংগ্রাম এবং ব্যাপকতর গণসংগ্রামের মধ্যে জাতিভেদ বিরোধী আন্দোলনকে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতে হবে।' দ্বিতীয় প্রবন্ধেও তাঁর বক্তব্য 'জাতিভেদরূপী ভারতীয় সমাজের সারি সারি লৌহপ্রাকারগুলিকে চূর্ণবিচূর্ণ না করলে এদেশের রাজনৈতিক, আর্থিক কিংবা সাংস্কৃতিক প্রগতি সম্ভব নয়।' মতামতের বলিষ্ঠতার কারণে প্রবন্ধদুটি এই পত্রিকার দিগদর্শন হিসেবে কাজ করে।

বস্তুত পত্রিকার সমস্ত প্রবন্ধই প্রায় দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিষয়ের গুণে। বিষয়গুলি এরকম 'জাতিভেদ ও বামপন্থা', 'শ্রেণীসংগ্রাম, জাতিভেদ ও ভারতীয় গণতন্ত্র', 'জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ ও প্রগতি', 'যতদিন "হরিজন" থাকবে, ততদিন গণহত্যা চলবে', 'জাতিভেদ এবং এর সামাজিক তাৎপর্য', 'জাতের ধর্ম', 'জাতিবিচারের আদি অন্ত', 'কৃষিক্ষেত্রে শ্রেণী ও জাত', 'প্রতিষ্ঠানের বিকল্প বাউল সম্প্রদায়' আবার সাহিত্যে এই জাতিভেদ সমস্যা কতটা এসেছে বা কীভাবে এসেছে সে বিষয়েও এঁরা সচেতন। ফলে এ ধরনের প্রবন্ধও আছে, 'প্রেমচন্দ ও হরিজন সমস্যা', 'তারাশঙ্করের লেখায় জাতপাত সমস্যা ও সমাধান' ইত্যাদি। আবার সমীক্ষামূলক রচনাও আছে এঁদের সূচিতে 'উপেক্ষিত ঘুনী সম্প্রদায়' বা 'খেড়িয়া'। তাছাড়া ওই সমস্যা সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য ঘটনাও এঁরা উল্লেখ করেছেন, যেমন 'দুবদায় হরিজন নিগ্রহ' বা 'কেস্টারার রায়'

'শরসন্ধান' জাতিভেদবিরোধী সমিতির মুখপত্র। তাই এঁদের কয়েকটি সংখ্যায় এই সমিতির নীতি ও কার্যক্রম এবং বছরের কাজের বিবরণও স্থান পেয়েছে। এ থেকে আরেকটা কথাও প্রমাণিত হয় যে, লেখায় সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করেই এঁরা ক্ষান্ত হন নি, সত্যিই এ নিয়ে এঁরা এতটাই ভাবেন যে, নানারকম কার্যসূচিও এঁরা নেন। পত্রিকা-প্রকাশও এঁদের অন্যতম কর্মসূচি। সব কিছুর মধ্য দিয়ে এঁদের জাতিভেদবিরোধী লড়াইয়ের চরিত্র বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

পত্রিকার প্রথম সংকলনের লেখাগুলির মান যতটা উঁচু ছিল, পরে সেই মান ততটা রক্ষা করা যায় নি সব সময়। এবং আমাদের হাতে যে কটি সংখ্যা এসেছে, তার মধ্যে যেটি বর্তমানে প্রধানত আলোচ্য সেটি একটু হতাশই করে। সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। সম্ভবত এটিই শরসন্ধানের সাম্প্রতিকতম সংখ্যা। এর পরে যদি কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হয়েও থাকে, সেটি আমাদের হাতে আসে নি

সাগর মাঝির কবিতা 'পরশুরাম' বা ইন্দ্রনীল মজুমদারের গল্প 'মিলন'—এদের শুদ্ধ সাহিত্যবিচার করা উচিত নয় ঠিকই। উদ্দেশ্যটাই এখানে বড়। কিন্তু তার বাড়াবাড়িতে কী হতে পারে, তারই নিদর্শন হয়ে রইল এগুলো। যেন ঘাড়ে ধরে বুঝিয়ে তবে ছেড়েছে গল্প, কবিতা ইত্যাদি সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের মাধ্যমে কোনো সমস্যা যতটা মনে দাগ কাটে, দশটা প্রবন্ধ লিখে সে কাজ হয় না। অথচ সেটাই এ-পত্রিকায় বড় উপেক্ষিত। সবই বড় চাহিদামাফিক যোগান, ভিতরে মালমশলা ছাড়াই।

এল. এস. হার্দোনিয়া 'কেস্টারার রায়'-এ হরিজন হত্যার একটি সত্য ঘটনা তুলে ধরেছেন এবং হত্যাকারীরা যে খালাস পেয়ে গেছে, সে ঘটনাও আমরা জানতে পেরেছি। এ ক্ষেত্রে প্রবল প্রভাবশালী ব্যক্তি ও মন্ত্রীদের নিষ্ক্রিয় ভূমিকাটিও তাঁর নজর এড়ায় নি। সুব্রত পাণ্ডা তারাশঙ্করের সাহিত্যে জাতপাত খুঁজতে গিয়ে লেখকের স্ববিরোধিতাকে সযত্নে তুলে ধরেছেন। অবশ্য শেষপর্যন্ত তিনি বেশ কয়েকটি উপন্যাস আলোচনা করে দেখান যে তারাশঙ্কর কীভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতার শিকার হয়েছেন। 'কবি' উপন্যাসের নায়ক নিতাই কবিয়াল ডোম, ব্রাত্য কিন্তু সে অন্য ব্রাত্যজনদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একাই উঁচুজাতির সম্মান পাওয়ার জন্য ব্যগ্র। ব্রাত্যজনের প্রতিনিধি তাই সে নয়। সে একা। এখানেই তারাশঙ্করের দুর্বলতা। সুব্রতবাবুর এই মূল্যায়ন যুক্তিসম্মত। তাঁর লেখার আগাগোড়া এই যুক্তিবাদিতা ক্রিয়াশীল। সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'জাতের ধর্ম' প্রবন্ধে বলেছেন, 'জাতবিচারকে শ্রমবিভাগের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার না করে, জীবন ও ইতিহাসের একটি

অতি স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে মেনে নেওয়াকেই যুক্তিসম্মত বলে এক দল পণ্ডিতেরা বিধান দেন।' জাতবিচার হিন্দুধর্মের সঙ্গে একাত্ম হয়ে রয়েছে—এ বিষয়টিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি।

যাই হোক না কেন, এই জাতিভেদবিরোধী সমিতিকে সাধুবাদ জানাতে হয় তাঁদের সীমাবদ্ধতার সমালোচনা করেও। পত্রিকাটির কলেবর ক্ষুদ্র, কিন্তু তার নৈতিক প্রভাব ব্যাপক। গল্প-কবিতার মান যদি এঁরা প্রথম সংখ্যার মতোই টিকিয়ে রাখতে পারতেন, তাহলে ফলাফল পাওয়া যেত আরো বেশি ও আরো সহজে। এঁদের আরেকটি বিষয় উল্লেখ করতেই হয় যে, প্রত্যেকটি সংখ্যার পেছনে সমিতির যে কার্যক্রম ঘোষিত হয়েছে, তা সত্যিই করা হলে জাতভেদ দূরীকরণের পথ সুগম হবে। তারা এটাও বলেছেন, এই নীতি ও কার্যক্রম যাঁরা সমর্থন করেন এমন সব গণসংগঠনের সঙ্গে জাতিভেদ বিরোধী সমিতি সহযোগিতা করতে চায়। পত্রিকাটির সম্পাদকীয়গুলো বেশ সুরচিত। প্রত্যেকটি সম্পাদকীয় থেকে জাতভেদ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানোন্মেষ ঘটে। সম্পাদক তাঁর লেখায় আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সব 'শুভ' অনুষ্ঠান প্রায়ই করতে হয় তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন, বি. আর. আম্বেদকরের আন্দোলন সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন, হরিজন নিগ্রহ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

এরকম ছোট পত্রিকার এরকম বড় চেষ্টা একটি গ্রহণযোগ্য উদাহরণ। □

তপস্যা ঘোষ

নাটক

মূকাভিনয়ের বহুমুখী প্রয়োগ সম্ভাবনা

মূকাভিনয় উৎসব ১৯৮৪। আয়োজক ঃ ইণ্ডিয়ান মাইম থিয়েটার। ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও অনুষ্ঠান। ২৫—২৭ মার্চ ১৯৮৪।

মূকাভিনয় বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে এই উৎসব বাস্তবিকই ব্যাপকতা পেয়েছিল। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের জন্য ওয়ার্কশপ, ৬টা থেকে সাড়ে ৭টা পর্যন্ত সেমিনার, সাড়ে ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত মূকাভিনয়ের অনুষ্ঠান।

ওয়ার্কশপ ও সেমিনারে মূকাভিনয়ের সঙ্গে অন্যান্য 'পারফর্মিং আর্ট'-এর যোগাযোগ ও পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা হয়েছে, হয়েছে হাতে-কলমে এর প্রয়োগ। এই কর্মসূচিতে উদ্যোক্তাদের পরিকল্পনা মতো অবশ্যই বক্তা সমাবেশ ঘটেনি। তবু, ঐ তিন দিনে নৃত্য, গীত, অভিনয়ের সম্পূরক শিল্প হিসেবে মূক-অভিব্যক্তি নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনায় বিশিষ্ট শিল্পীরা অংশ নেন। ডেরেক মনরো কুচিপুডি নাচের সঙ্গে বর্তমান মূকাভিনয়ের সাদৃশ্য নিয়ে বক্তৃতায় নৃত্য ও অভিনয়ের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা বিষয়ে জোর দেন। বালকৃষ্ণ মেনন দেখান বিভিন্ন মুদ্রা ও অভিব্যক্তি কীভাবে নৃত্য ও মূকাভিনয়ে একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। গোবিন্দন কুট্টি কথাকলির সঙ্গে মূকাভিনয়ের এবং থাঙ্কমণি কুট্টি মোহিনী আট্টম, ভারতনাট্যমের মধ্যে মূক-অভিব্যক্তির দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। মণিপুরী নৃত্যের মধ্যেও যে মূকাভিনয়ের বিশেষ প্রাধান্য আছে তা দেখান নদীয়া সিং ও গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়।

তরুণ রায়, জারিন চৌধুরী, শুভাপ্রসন্ন, প্রদীপ ঘোষ, জগন্নাথ বসু, সলিল চৌধুরী, দেবাশিস দাশগুপ্ত, মাধব ভট্টাচার্য প্রমুখ নাটক, চিত্রশিল্প, আবৃত্তি, গান, আবহ সংগীতের সঙ্গে মূকাভিনয়ের সম্পর্ক নির্ণয় করে বক্তৃতা দেন। উৎসব উদ্বোধন করেন

নির্বাক চলচ্চিত্র যুগের বিশিষ্ট অভিনেতা হীরেন বসু।

সারা দিনের ব্যস্ততার পর সন্ধ্যায় শিশিরমঞ্চে অভিনেতা- অভিনেত্রীরা তাঁদের শিল্পকৃতি দেখান। এক্ষেত্রেও উৎসব-উদ্যোক্তারা কলকাতার দর্শকদের অভিনব অভিজ্ঞতার স্বাদ দিতে পেরেছেন। পশ্চিমবঙ্গের বেশ কটি জেলা থেকে তরুণতরুণীরা মূক-শিল্পের সম্ভার নিয়ে এসেছেন। অপেক্ষাকৃত নবীন এবং বস্তুতই অবহেলিত এই শিল্প-আঙ্গিক নিয়ে সারা বাংলা জুড়েই দস্তুরমতো নিষ্ঠ সাধনা ও চর্চা যে চলেছে, এর প্রমাণ ওই তিন দিনের অনুষ্ঠান। আরো একটা বিষয়ে এ উৎসব আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে, মূকাভিনয়ের ব্রাত্য পরিচয় ঘুচিয়ে এর বহুমুখী প্রয়োগ-সম্ভাবনা বিষয়ে স্বাক্ষর রেখেছেন এর শিল্পীরা। মূক-অনুকৃতি যে কেবল স্কেচ-ধর্মী তাৎক্ষণিক আবেদনেই সীমাবদ্ধ নেই, তার প্রকাশ সারা রাজ্য জুড়ে এর চর্চা এবং এর বিচিত্র শিল্পসিদ্ধি।

উৎসবে অমিতাভ মজুমদার, নিরঞ্জন গোস্বামী, চঞ্চল দাশগুপ্ত, শান্তিময় রায়, বিশ্বনাথ অধিকারী প্রমুখ খ্যাত মূকাভিনেতার পাশে একেবারেই অজ্ঞাতনামা শিল্পীরা উৎসাহব্যঞ্জক অনুষ্ঠান করেছেন। প্রতিদিনই একেবারে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের অবাক-করা অভিনয় দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে, এইসব ক্ষুদে অভিনেতারা মূকাভিনয়ের কৃৎকৌশল চমৎকার আয়ত্ত করতে পেরেছে। দিব্যেন্দু সরকার (মাছধরা), দেবরাজ গুহরায় (লেখক ও মাছি), সংহিতা প্রামাণিক (দুষ্টু) এবং কল্যাণী থেকে আসা নান্দনিক-এর শিশু-অভিনেতার নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তিনদিনের উৎসবে মূকাভিনয়ের বিভিন্নমুখী ধারা নিয়ে যাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সাহসী পদক্ষেপের স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁদের মধ্যে নিরঞ্জন গোস্বামীর ইণ্ডিয়ান মাইম থিয়েটার গ্রুপ, অঞ্জন দেবের নির্বাক অভিনয় একাডেমি (বারাসত), শান্তিময় রায়ের মৌনমুখর (সন্তোষপুর), তপন অধিকারীর সাইলেন্ট থিয়েটার (বজবজ) এবং কাজল মহান্তর নান্দনিক (কল্যাণী)-এদের নাম করা যেতে পারে। নিরঞ্জন ও তাঁর সহশিল্পীরা 'সুখের চাবি' নামের যে মৌন-নাটিকার অভিনয় করলেন তা

পরিকল্পনা, ছন্দোময়তা, বর্ণ-সুষমা ও কম্পোজিশন-এর চারুত্বে বাস্তবিক সুদৃশ্য হয়েছে। এঁদের অভিনয়রীতিতে নৃত্যের আঙ্গিকটি প্রাধান্য পেয়েছে অন্যভাবে বলতে গেলে, নৃত্য-কলার সঙ্গে মৌন-অনুকৃতির চমৎকার সংশ্লেষ ঘটিয়েছেন নির্দেশক নিরঞ্জন গোস্বামী ফলে 'সুখের চাবি' নামের আপাত সাঙ্কেতিক বিষয়টিও অভিনয় নৈপুণ্যে ও উপস্থাপনার গুণে অনুভূতিকে নাড়া দিতে সমর্থ হয়েছে মূকাভিনয়ের নতুন একটা সম্ভাবনার দিক দেখা গেল এই গ্রুপের অনুষ্ঠানে

অঞ্জন দেবের নির্দেশনায় 'পুতুল ঘর' অভিনয় করলেন একেবারে কিশোর বয়সী স্কুলের দল। তাদের অঙ্গ-সংস্থাপন ও সঞ্চালনের শৃঙ্খলা অবাক হয়ে দেখার মতো। নির্ভুল সময়জ্ঞান ও নাটকীয় মুহূর্ত সৃজনের ক্ষমতা এই দলটিকে কৌতুকরসের অতিরিক্ত কিছু দিতে পেরেছে। নেপথ্য শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অঙ্গচালনার দিক এই অনুষ্ঠানের প্রধান সম্পদ মৌন-অনুকৃতিতে শব্দব্যবহারের দিক নিয়ে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাই ভাববেন। এ ক্ষেত্রে তার অতিরেক ঘটেছে কিনা তাও তাঁরাই দেখবেন। কিন্তু অনুষ্ঠানটি যে বেশ ভালো হয়েছে এ কথা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না।

শান্তিময় রায়ের দুটি একক অভিনয় এবং অপরটি যুগ্ম-অভিনয়, তিনটিতেই মূকাভিনয়ের চলতি পথের বাইরে পা-বাড়ানোর প্রয়াস আছে। মৌনমুখর গোষ্ঠীর এই তিনটি স্কেচ্-ই দর্শককে ভাবায়। মূকাভিনয়ের তাৎক্ষণিকতা থেকে স্থায়ী রসের দিকে যাত্রার এই প্রয়াস অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। 'নেহরু গোল্ড কাপ'-এ শান্তিময়ের অভিনয়ও দেখার মতো। প্রতিটি পদক্ষেপে অনুপুঙ্খ বিভাজন ও অভিব্যক্তির রকমফের ঘটিয়ে শান্তিময় খেলার মাঠের উত্তেজনা, চঞ্চলতা ও সার্বিক অর্থ-শূন্যতাকে চমৎকার ফোটাতে পেরেছেন। 'প্রতিজ্ঞা' এবং 'একতাই শক্তি' বক্তব্যপ্রধান রচনা। মানুষের মনে আশা ও শক্তি সঞ্চারই এর উদ্দেশ্য। মূকাভিনয়ের মাধ্যমে গভীর অনুভবকেও যে ব্যঞ্জিত করা যায় তার প্রচেষ্টা এতে লক্ষ করা গেল। কিন্তু অভিনয়ে অনাবশ্যক দ্রুতি ও বিন্যাস-ক্ষেত্রে অযত্ন এদের পূর্ণতায় বাধা হয়েছে।

তপন অধিকারীর সাইলেন্ট থিয়েটার-এর নাটিকায় আলোর-ব্যবহার মৌন-অনুকৃতির পক্ষে বাহুল্য মনে হলেও 'মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত' পরিকল্পনা ও প্রয়োগে বেশ নতুন, অর্থবাহী। নেপথ্য-শব্দ ও আলোর ওপর নির্ভর না করে অভিনয়ে আরো মনোযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। মনে রাখতে হবে, মূকাভিনয়ে শরীরী বিভঙ্গ ও মুখের অভিব্যক্তিই একটা বড় জায়গা জুড়ে থাকে।

কাজল মোহান্ত 'বক্সার ও তার পুতুল' এবং 'ভয় ও তার কারণ' অভিনয়ের দিকটায় বেশ নজর দিয়েছেন। অবশ্য এদের 'সেলুন' ফিচারটি জমেছে শিশু-অভিনেতার অভিব্যক্তির গুণে। কল্যাণীর এই গোষ্ঠীর কাছে মূকাভিনয় আরো প্রত্যাশা করতে পারে।

একক অভিনয়ে অমিতাভ মজুমদারের 'ক্ষুধা', বিশ্বনাথ অধিকারীর 'আমি কি চেয়েছি', রণীন্দ্রনাথ সেনের 'কাঠুরিয়া' পুরনো হলেও উল্লেখযোগ্য। মূকাভিনয়ের নানাদিক এঁদের, বিশেষত অমিতাভ ও বিশ্বনাথের অভিনয়ে চমৎকার ফুটেছে। যাঁরা মূকাভিনয় শিখতে চান এঁদের অভিনয় তাঁদের কাছে বেশ শিক্ষণীয়। কীভাবে কখন শরীরকে ভাঙতে হয়, উচ্চ-নীচ তল-সাপেক্ষে পদক্ষেপের বিভিন্নতা ঘটাতে হয়, বস্তুর আকার ও আকৃতির সঠিক বোধ কীভাবে সঞ্চারিত করতে হয়, তার নিখুঁত দৃষ্টান্ত এঁদের অভিনয়। দক্ষতার সঙ্গে গভীরতর ভাবনা যুক্ত করতে পারলে এঁরা মূকাভিনয় শিল্পকে আরো সমৃদ্ধ করতে পারবেন।

চঞ্চল দাশগুপ্ত কি অভিনয়ে মনঃসংযোগের সময় পাননি ? নইলে, হাঁটায় দক্ষ শিল্পীর ছাপ রেখেও কেন আমাদের মন ভরানোর মতো কিছু দিতে চাইলেন না ? বন্দনা ঘোষের 'পরীক্ষা' ফিচারটিও দর্শকদের তৃপ্ত করতে পারেনি। মালবিকা বসুর 'প্রতীক্ষা'য় নাচের ছন্দ ও মুদ্রাই প্রধান, অভিনয়ে ভারসাম্যের অভাব। অভাব নির্দিষ্ট অনুভব গঠনের, তবু দেখতে মন্দ লাগে না। বরং মেদিনীপুর থেকে আসা তরুণ প্রধান ('দক্ষ ছুতার'), কুচবিহারের শঙ্কর দত্তগুপ্ত ('প্রতিবাদ') অভিনয়ে নিষ্ঠা দেখাতে পেরেছেন। বিষয়বস্তুর দীনতা কাটিয়ে উঠতে পারলে এঁরা দাঁড়াতে পারবেন।

এই উৎসবে দুর্বল অনুষ্ঠানও সংখ্যায় একেবারে কম ছিল না। কল্পনার দৈন্য, মূকাভিনয় সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও অক্ষমতা—সবই এই দুর্বলতার জন্য দায়ী। যেমন, রূপায়ণ চৌধুরীর 'রানার' কোনো অর্থেই শিল্প নয়, মূকাভিনয় তো নয়ই। শ্রীবিশ্বনাথের 'ফেডেড ডায়মণ্ড' নিয়ে শিশিরমঞ্চে ওঠাটাই দুঃসাহস, এমন কাঁচা অনুষ্ঠানের অনুমতি উদ্যোক্তারাই বা দিলেন কীভাবে ? সমীর মণ্ডলের 'মশা'য় অনেক লাফঝাঁপের মধ্যদিয়েও কোনো কিছু বেরিয়ে আসেনি। রণেন চক্রবর্তীর 'পুলিশ এ্যাকশন' এবং সাহানার 'রোবট'-ও খুবই দুর্বল। □

মলয় দাশগুপ্ত

প্রদর্শনী

মূর্তি ও বিমূর্ততার টানাপোড়েন

বরেন বসু-র একক প্রদর্শনী। অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস। ৫—১১ এপ্রিল ১৯৮৪।

বরেন বসু (জন্ম ১৯৪৩) ১৯৬৭-তে কলকাতার সরকারি আর্ট কলেজের স্নাতক। সে সময় থেকে এ পর্যন্ত কলকাতা ছাড়াও অন্যান্য শহরে নিয়মিত প্রদর্শনী করে, এবং প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য বার্ষিক প্রদর্শনীগুলিতে অংশ গ্রহণ করে শিল্পী হিসেবে পরিচিতি অর্জন করেছেন। তাঁর এই পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠার পিছনে রয়েছে ছবির আঙ্গিক নিয়ে নিরলস পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ক্রমান্বয়ে নিজস্ব এক প্রকাশভঙ্গি বা আঙ্গিকগত শৈলী গড়ে তোলার প্রয়াস। এই নিজস্বতা অর্জনে তিনি এতটাই সফল হয়েছেন যে ছবির নিয়মিত যেকোনো দর্শকই অনায়াসে চিনে নিতে পারেন তাঁর ছবি।

বরেন বসুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা লোকায়ত রূপবন্ধ নিয়ে। এই সময়ের ছবিতে লোকায়ত প্রতিমা, আমরা জানি, বিশিষ্ট এক প্রকাশভঙ্গি। দেশজ লোক-ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নানা আঙ্গিকের সমন্বয় ঘটিয়ে আমাদের ছবির স্বতন্ত্র এক আত্মপরিচয় নির্মাণে ব্যাপৃত আছেন অনেক প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। শুদ্ধ লোকায়ত রূপবন্ধের সঙ্গে দেশী বা বিদেশী শিল্পের আঙ্গিকগত সম্মেলনের পরিমাণের উপর লোকায়ত প্রতিমা অনুসারী ছবির বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ করে নেওয়া যায়। যেমন, এম্. এফ হুসেনের ধারায় লোকায়ত রূপবন্ধকে আধুনিক রূপবিন্যাসে বেঁধে চলমান জীবনপ্রবাহকে রূপায়িত করেন অনেকে। কলকাতার রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, যামিনী রায় ও নন্দলাল বসু-র দুই ভিন্ন ধারার সম্মেলন ঘটিয়ে তাৎক্ষণিকতা নিরপেক্ষ ছন্দোময় রূপবিন্যাস করে থাকেন। এই ধারাও অনুসরণ করেন অনেকে। আবার উড়িষ্যার সুকান্তি পট্টনায়ক-এর মতো কোনো কোনো শিল্পী বিশুদ্ধ লোকায়ত সরল বিন্যাসে কাজ করেন। এই সমস্ত মূল ধারাগুলির নানা সংযুক্তি ও বিযুক্তিতে লোকায়ত অনুসারী নানা শিল্পীর শৈলী গড়ে উঠেছে।

বরেন বসু প্রথম দিকে লোকায়তের যে ধারাটি অনুসরণ করেছেন তা বুঝতে (আঙ্গিকগত অনেক পার্থক্য সত্ত্বেও) হুসেনের শৈলীর সাধারণ ধারণা কিছুটা সহায়ক হয়। অন্তত ৭৭-৭৮ পর্যন্তও তাঁর কোনো কোনো ছবিতে সমকালীন জীবনধারা লোকায়ত সরলতায়

রূপবন্ধ হত। ক্রমান্বয়ে লোকায়তের শুদ্ধতার পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যই হয়ত তিনি পৌরাণিক ও ধর্মীয় নানা প্রতিমা বিন্যাসের দিকে ঝোঁকেন। এবং এই দিকে যেতে গিয়ে এক সময় তিনি পৌরাণিক দেবদেবীর বহুদৃষ্টি সম্পন্নতার প্রতীক হিসেবে পংক্তিবদ্ধ বহুচক্ষুর প্রবর্তন করেন পরে এই প্রতীক শুধু দেবদেবীর প্রতিমার ক্ষেত্রেই নয়, মানুষের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেন এই পংক্তিবদ্ধ চক্ষুশ্রেণীকে এখন তিনি প্রতীক-নির্মাণ ছাড়াও স্বকীয় এক কম্পোজিশনের বৈশিষ্ট্য হিসেবে ব্যবহার করছেন

লোকায়ত রূপবন্ধের দ্বিমাত্রা বিশিষ্ট রৈখিক সরল রূপায়ণকেই তিনি মাত্র গ্রহণ করেছেন। ছবির বা পটের বাকি অংশের বিন্যাসে তিনি পাশ্চাত্য নানা রচনা-বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরীক্ষা করেন। ফলে তাঁর ছবির রেখা বিন্যাস লোকায়তিক এবং রঙ ও রচনা বিন্যাসে পাশ্চাত্য আঙ্গিকের প্রতিফলন। এই দুই আঙ্গিকের মিলিত সংযোগে একদিকে তিনি পৌরাণিক প্রতিমার রূপায়ণ যেমন করেন, তেমনি সমকালীন জটিল জীবনপ্রবাহের নানা সমস্যাকেও ধরতে চেষ্টা করেন। লোকায়ত প্রতিমাকে আধুনিক আঙ্গিক ও জীবনভাবনায় প্রসারিত করে ছবিতে প্রকাশের নানা সমস্যা ও জটিলতার সমাধান করতে চেষ্টা করেন। এই প্রসারণ এখন এতটাই বিস্তৃত যে মূর্তির মূর্ততাকে ভেঙে ভেঙে বিমূর্ততার দিকে চলে যান তিনি অনায়াসেই। মূর্তি ও বিমূর্ততার এই টানাপোড়েন হয়ে ওঠে তাঁর কোনো কোনো ছবির উপভোগ্য এক বৈশিষ্ট্য।

আলোচ্য প্রদর্শনীর ১৬টি ছবির মধ্যে ১০টি ক্যানভাসের উপর তেলরঙের কাজ, বাকি ৬টি কাগজের

'মিথ উইথ রিলিজিয়ান' বরেন বসুর ছবি

উপর ফেল্ট পেন, প্যাস্টেল বা জলরঙের সম্মিলিত ড্রয়িং এই ড্রয়িংগুলি তাঁর সাম্প্রতিকতম নূতন রীতির কাজ। অতিসরলরেখা বিন্যাসে আঁকা হয়েছে নানা ধর্মীয় ও পৌরাণিক দেবদেবীর প্রতিমা যেমন, রামায়ণের রাম লক্ষ্মণ সীতা ও হনুমান, জগন্নাথ, রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি। ফেল্ট পেন-এ ড্রয়িংটি করে মধ্যবর্তী অংশে প্যাস্টেল বা জলরঙের সামান্য প্রলেপ দিয়েছেন। ফলে রৈখিক বিন্যাসের সরল সাবলীলতার মধ্যে কিছুটা পেইন্টিং-এর স্বাদ এসেছে। সরল রূপায়ণের এই ছবিগুলি তাঁর সাবলীল অঙ্কন শৈলীর শিল্পোত্তীর্ণ নিদর্শন। যামিনী রায় ও নন্দলালের যুগ্ম উত্তরাধিকারের সফল প্রয়োগ অনুভব করা যায় এই রূপারোপে।

১০টি তেলরঙের ছবিকে বিষয়ের দিক থেকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। ৪টি পৌরাণিক ও ধর্মীয় বিষয়-আশ্রিত। বাকি ৬টি সামাজিক বিষয় সম্বন্ধীয়। রচনাগত দিক থেকে আবার প্রত্যেকটি ছবিকে দুটি ভাগে ভাগ করে নিতে পারি বিষয়ের রৈখিক বিন্যাস ও পটভূমির রচনাগত বিন্যাস। উভয় বিন্যাসের প্রতি সমান সচেতনতা ও মনোযোগ ছবিগুলিকে আরও উপভোগ্য করেছে। ৬ নং 'রিসোর্সেস' ছবিতে উপরে কৃষকের মুখাবয়ব, নীচে একটি মহিষের উপস্থাপনা। বাকি অংশে রয়েছে হলুদ, ধূসর ও সাদা, এই বর্ণের বিভিন্ন ক্রমে পটকে তিন বিষম আয়তক্ষেত্রাকার ভাগে ভাগ করে নেওয়া। ৮ নং 'ডিভোশন' ছবিতে রেখার জ্যামিতিক বিন্যাসে একটি নৃত্যরতা নারীমূর্তির উপস্থাপনা যেমন, অর্ধবৃত্ত —উত্তোলিত ডান হাত, ষড়ভুজ—কোমরের উপর বাঁ হাত, ত্রিভুজ—দেহমধ্য ভাগ, বৃত্ত—মুখাবয়ব। পটের বাকি অংশে বিভিন্ন রঙের আয়তক্ষেত্রাকা বিভাগ। এরকম সরল জ্যামিতিব উপস্থাপনার পরে কিছু জটিল রূপবন্ধ দেখা যায় 'মা ও ছেলে' বিষয়ের দুটি ছবিতে (৯ ও ১০ নং)। রূপবন্ধে এই ভঙ্গুরতা আরও বিমূর্ততার দিবে অগ্রসর হতে থাকে কয়েকটি দেবদেবীর ছবিতে। ৩ নং 'দুর্গা ও গণেশ' ছবিতে দুই প্রতিমার মূর্তি ভেঙে ভেঙে, শরীরের অংশবিশে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পটে রচনাগত বলিষ্ঠতার কাজে লেগেছে দুর্গার দশটি হাতের পাতা আলাদা করে সাজানো রয়েছে পট জুড়ে দুর্গার মুখও শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন সরলতর মূর্তি ও সেই মূর্তির বিভি বিকৃতিকরণ থেকে এই দুয়ের সমন্বয়ে রচিত সমাজ বাস্তবতামূলক এক প্রা বিমূর্ত ছবিতে চলে আসতে পারে শিল্পী। সেখানে (৭ নং 'ডিটাচমেন্ট' ছবিতে) সাদা ও গোলাপির নানা ক্রমে রচিত পটভূমির উদ্ভাসিত উজ্জ্বলতা পরিপ্রেক্ষিতে তীব্র কালোর বিচ্ছুরণে করা অশুভ ও অন্ধকারময় নান প্রতিমার রূপারোপ গড়ে তোলেন কালো পেঁচা বা পংক্তিবদ্ধ রক্তব চক্ষুশ্রেণী হয়ে ওঠে অশুভ শক্তি ও দৃষ্টির প্রতীক।

লোকায়ত ও অভিব্যক্তিময়তা এই মেলবন্ধনের পরীক্ষায় এখনও সর্বত্র সমান উত্তীর্ণ নন শিল্পী সার্কাসের বিষয় নিয়ে করা ৪ ন 'অ্যারেনা' নামের ছবিটিতে যেম সেই অসফলতার ইঙ্গিত রয়েছে কিন্তু লোকায়তকে আধুনিক জীব ভাবনার রূপায়ণে ব্যবহার কা সমকালীন ছবির নান্দনিক না সমস্যা নিয়ে যাঁরা ভাবছেন ও নিরল কাজ করছেন, বরেন বসু তাঁদে অন্যতম। এখানেই শিল্পী হিসেবে তাঁর বিশিষ্টতা। ☐

মৃণাল ঘোষ

গান

উত্তরবঙ্গের গান

লোকযান-এর শিল্পীদের অনুষ্ঠান। ২২ ও ২৩ মার্চ ১৯৮৪। শিশির মঞ্চ।

শিশির মঞ্চে উত্তরবঙ্গ লোকযান-এর শিল্পীরা দুদিনের অনুষ্ঠানে পরিবেশন করলেন লোকনাট্য ভাওয়াইয়া ও চটকা গান। লোকশিল্পীদের সারল্য, গ্রামীণ কথ্য ভাষায় কথোপকথন এবং লোককাহিনীগুলির পরিমণ্ডলে অনুষ্ঠান দুটি সার্থকতার দাবি রাখে। স্বীকার করতে হয়, উপস্থাপনায় কিছু খামতি থাকলেও পরিবেশকদের ঐকান্তিক নিষ্ঠায় দুদিনের আসরই ছিল মনোজ্ঞ। অবহেলিত লোককাহিনী এবং অবলুপ্ত লোক-সংস্কৃতিকে আন্তরিকতার সঙ্গে পরিবেশনের জন্য উত্তরবঙ্গ লোকযান সংস্থা ধন্যবাদার্হ।

২২ মার্চের অনুষ্ঠান শুরু হ সুখবিলাস বর্মার ভাওয়াইয়া দিয়ে শিল্পী 'ও ভাই মোর গাওালিয়া রে 'গাও তোল মোর মইশাল বন্ধু' প্রভৃ সফল হলেও মুন্সিয়ানা দেখিয়েছে

চট্‌কা গানে। এ সম্পর্কে বোধহয় শিল্পী নিজেই সচেতন ছিলেন অধিক। তাই অনিবার্যভাবে পরপর গেয়ে যান 'চ্যাংরাটা সাজিপারি কলেজ যায়' এবং মশা ও ঘ্যাগা (যার গলা ফুলেছে) নিয়ে কয়েকটি উৎকৃষ্ট মানের চট্‌কা গান। উল্লেখ করতেই হয়, অনুষ্ঠানে ভাওয়াইয়া গানের অভাব বারবার অনুভূত হয়েছে। কেননা সংগীতরসিক মাত্রেই জানেন, বীরভূমের বাউল, পুরুলিয়ার ঝুমুর, পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালির মতো উত্তরবাংলা ভাওয়াইয়ার খনি। সেখানে একা সুখবিলাসবাবু সমগ্র উত্তরবঙ্গের কতটুকু প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন? এই খামতি আরো দ্বিগুণ হয়েছে যখন সেই একই কৌশলে তাঁকে দ্বিতীয় দিনের গানের তরী বাইতে হয়েছে। সুখবিলাসবাবুর আন্তরিকতা ও সাবলীলতা প্রশংসার দাবি করে যদিও তাঁর সহযোগীদের দুর্বল যন্ত্রসংগীত ও সংগত মাঝে মাঝে তাঁকে বিব্রত করেছে।

দুদিনের অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে সেরা ছিল প্রথম দিনের 'হালুয়া-হালুয়ানি' লোকনাট্যটি। 'হাল' অর্থাৎ লাঙল যে বয় সে হালুয়া। হালুয়ানি তার বউ। হালুয়া সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে হাল টানে জমি আবাদ করে। কিন্তু কৃষক-জীবনের দারিদ্র্য তার দাম্পত্য-প্রেমের প্রবলতম অন্তরায়। এর উপর নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার পিছুটানে একমাত্র শিশু-সন্তানের জনক হালুয়া দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে পড়ে। তাই সামাজিক প্রথা অনুসারে সে স্ত্রীকে ফেরৎ দেয় সেই 'আজু'র (দাদু) হাতে, যে আজু বিবাহে কন্যাসম্প্রদান করেছিল। এরই মধ্যে গল্পরস জমে উঠেছিল হালুয়ার হাল বইবার দৃশ্যে, হালুয়ানির সঙ্গে দাম্পত্য প্রেমে ও কলহে—যেখানে রাগের মাথায় স্ত্রীকে পান্‌ঠি (লাঙলের ছড়ি) মেরেছে, পরে তারই জন্যে আবার আক্ষেপে কান্নায় ভেঙে পড়েছে। দুঃস্থ কৃষকজীবনের সামাজিক চিত্র হিসাবে কাহিনীটি সার্থক। তবে হালুয়ানি মমতা দাসের অভিনয়ে বারবার আড়ষ্টতা লক্ষ করা গেছে। বিশেষত শেষ দৃশ্যে হালুয়া যখন আজুর কাছে তাকে ফেরৎ দিচ্ছে এবং রোগজীর্ণ হালুয়া মৃত্যুপথযাত্রী, তখন হালুয়ানির মুচকি হাসি বড়ই বিসদৃশ ঠেকেছে। হালুয়া কুলীন বর্মন অনেকাংশে সফল। সফল তাঁর 'মামা' চরিত্রটিও। হালুয়ানির মতো ব্যর্থ হয়েছে গানের দোয়ারদের এবং যন্ত্রসংগীতের ভূমিকা।

মনসামঙ্গল গীতি আলেখ্যর একটি দৃশ্য

শ্রাবণ-সংক্রান্তির রাতে 'ব-খেলা' অর্থাৎ ব্রতকেন্দ্রিক আনন্দ-অনুষ্ঠান উপলক্ষে নানা প্রকার গান ও নাচ সহযোগে গ্রামীণ শিল্পীরা এই নাটকটি কৌতুক নকশা হিসাবে গ্রামে পরিবেশন করে থাকেন। নাটকটি কৌতুক নকশা হলেও গ্রামজীবনের সংস্কার বিজড়িত মর্মন্তুদ এক সত্য চিত্র থাকায় দর্শকমনে গভীর রেখাপাত করার ক্ষমতা রাখে। প্রয়োজন সফল প্রয়োজনার।

২৩ মার্চ সুখবিলাস বর্মার ভাওয়াইয়া ও চট্‌কা গানের পর পরিবেশিত হল 'লব-কুশ' ও পরে 'বিষহরা' লোকনাট্য। 'লব-কুশ' লোকনাট্যটি ছিল সবচেয়ে দুর্বল উপস্থাপনা। রামায়ণভিত্তিক এই গানের আরেক নাম লক্ষ্মীয়ালা। সীতা হলো লক্ষ্মী। নবান্নের পর এই গান শোনা যায় পশ্চিম দিনাজপুরের গ্রামাঞ্চলে। অযোধ্যায় রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে বীরবেশে লব-কুশের যাত্রা এবং রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে তাদের জয়লাভ। লব-কুশ বনবাস থেকে সীতাকে উদ্ধার করে অযোধ্যার লক্ষ্মীরূপে তাঁকে প্রতিষ্ঠা দেন। এই নাটকে মূল গায়েন নীলকণ্ঠ দত্ত ব্যতীত কেউ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন নি। লব-কুশ চরিত্রে বয়স্কা আকুলবালা সরকার ও মমতা দাসকে রীতিমতো অশোভন মনে হয়েছে।

শেষ অনুষ্ঠানটি ছিল 'বিষহরা' লোকনাট্যের। সপ্তদশ শতকের কবি জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলের কাহিনী নিয়ে এই লোকনাট্যটি। শ্রাবণ-সংক্রান্তি, ভাদ্র-সংক্রান্তি এবং আষাঢ় মাসে অম্বুবাচীর সময় 'বিষহরা' বা মনসার গান করা হয়। নাট্যাংশের কাহিনী আরম্ভ হয়েছে লখীন্দরের বিবাহের উদ্যোগ দিয়ে। কাহিনীতে মূল চরিত্র হিসাবে আছে চাঁদ বণিক, বেহুলা, লখীন্দর এবং চাঁদের গৃহভৃত্য 'নাংঘা'। গৃহভৃত্য হিসাবে নীলকণ্ঠ দত্ত সবচেয়ে বেশি প্রশংসার দাবি রাখে। নীলকণ্ঠবাবু একদিকে মূল গায়েন, অপরদিকে দক্ষ অভিনেতা, সহ-পরিচালকও। তবে গানের উৎকর্ষে তিনি সুনাম রাখতে পারেন নি। তাঁর একাগ্রতা, সাবলীলতা এবং দক্ষতা আসরকে জমিয়ে রেখেছিল। সে তুলনায় বেহুলা মমতা দাস বা চাঁদ চরিত্রের প্রচেষ্টা দেখা গেলেও গুণগত বিচারে তা দ্বিতীয় শ্রেণীর। মনসা আকুলবালা সরকারকেও বেশ খানিকটা অপটু মনে হয়েছে। লখীন্দরের বেহুলাকে বারবার 'ভাই' বলে সম্বোধন অনিবার্যভাবে শ্রুতিকটু লেগেছে। এ ভুল মূল গায়েনও করেছেন।

তবে লখীন্দরের বিবাহের দৃশ্যটি ছিল যথার্থ উত্তরবঙ্গীয়। কনে বেহুলার পরনে ছিল বুখানি, গলায় চন্দ্রহার, কানে মাকড়ি, মাথায় সিঁথিপাটি। মঞ্চটিকে উত্তরবঙ্গীয় শিল্পকলা দিয়ে সাজানোর পরিকল্পনা প্রশংসনীয়। পশ্চিম দিনাজপুরের ধোকরা, ঝালং, বিছান, ব্যাগ কাঠের মুখোশ, পীরের ঘোড়া ছিল উপযুক্ত স্থানে। গানের শিল্পী সুখবিলাস বর্মার বাড়ি কোচবিহারের তুফানগঞ্জে, লোকনাট্যের শিল্পীদের সবারই বাড়ি পশ্চিম দিনাজপুরের কুষমণ্ডি ও হেমতাবাদে। □

কেশব আডু

ফিল্ম

ছবি তোলার সমস্যা নিয়ে ছবির সমস্যা

কাহিনী, চিত্রনাট্য, প্রযোজনা, পরিচালনা
অশোক আহুজা

'আধারশিলা' শুধু ছবির নায়কের নয়, পরিচালক অশোক আহুজারও আধারশিলা এবং ভিত্তিপ্রস্তর। কিন্তু অন্য রকমের ছবি, শিক্ষিত ছবি। অনেক রকমেই ছবিটি বিশিষ্ট। সিনেমা প্রদর্শনের জটিল ও কুটিল ব্যবসার সঙ্গে আপোস না করে এ ছবি দিল্লিতে সিনেমা হল ছাড়াই মুক্তি নিয়েছিল। সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান-বিরোধী প্রয়াস হওয়া সত্ত্বেও দর্শক ছবিটিকে গ্রহণ করেছিলেন বিপুলভাবে। অবশ্য এর আগেই ছবিটি জাতীয় পুরস্কার ও ম্যানহাইম পুরস্কার পেয়ে দর্শকমনে আগ্রহ জাগিয়েছিল।

গঠন অনুসারে ছবিটিকে দুই পর্বে আলোচনা করা ভালো।

১· ছাত্রবেলাকার শিক্ষা, দীক্ষা ও নীতিবোধ কর্মজীবনের শুরুতে প্রাতিষ্ঠানিক চক্রান্তে কীভাবে থেঁতলে যায়, কীভাবে ধসে যায়, আত্মপ্রকাশের

সেই যন্ত্রণাই 'আধারশীলা' ছবির প্রথম প্রশ্ন। এ পর্যায়ে পুনা ফিল্ম এ্যাণ্ড টেলিভিশন ইনসটিটিউট থেকে পরিচালনায় স্নাতক ডিগ্রি পাবার পর নায়ক জীবিকার জগতে ঢুকতে চাইছেন। তাঁর ইচ্ছা কিছু সৎ ছবি গড়ে দর্শকের কাছে পৌঁছনো। কিন্তু কোনো প্রযোজক মেলে না। এমনকী এক কাহিনীকার চূড়ান্ত বৈষয়িক স্বার্থ থেকে নায়ককে 'বুনিয়াদ' নামে একটি কাহিনী দিতে-দিতেও পেছিয়ে যান।

শেষপর্যন্ত নায়কের জ্ঞানলাভ হল যে, প্রতিটি প্রজন্মকে পূর্বসূরিরা সৎ হতে বলেন, সৎ হবার শিক্ষা দেন, কিন্তু সত্যি সত্যিই যখন কেউ সৎ হবার সাহস দেখায়, তারাই হয়ে দাঁড়ান তাদের সামনে পাথরের দেয়াল। নায়কের এই শিক্ষা, তার শিক্ষার এই আয়রনির দিকটি পরিচালক অশোক আহুজা গড়ে তুলেছিলেন ভালোই। কিন্তু বাজারি 'বেয়োকুফ' ছবিগুলির নিঃস্বতাকে তুলে ধরতে ঐ ছবিগুলির হাস্যকর ছকবাঁধা দৃশ্যগুলি বারবার দেখানো ক্লান্তিকর ঠেকেছে এতে করে ছবির গভীরতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ছবির মজা হারিয়ে যায়। মনে হয়, ছবির নায়ক অসুস্থ, সিনেমার সঙ্গে আপোস করতে না চাইলেও দর্শক ভেড়াতে অশোক আহুজা কিন্তু আপোস করেছেন। কায়দা: বাজারি নাচগান ছবিতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। ছবির এই অংশগুলির আধিক্য পরিচালকের উদ্দেশ্যের পক্ষে যায় না। গভীর ব্যঞ্জনাও বহন করে না। বরং তথ্যচিত্রের লোকেশান সন্ধানে নায়কের গ্রামে যাওয়া, গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা পাঠশালা দেখা, সিনেমা সম্পর্কে গ্রাম্যবধূদের ধারণা ইত্যাদি ঘটনার বিন্যাসে পরিচালকের যে

'আধারশীলা' ছবিতে নাসিরুদ্দিন শা

কৌতুক তা বেশ সূক্ষ্ম এবং বুদ্ধিদীপ্ত।

কিংবা পুনা ফিল্ম এণ্ড টেলিভিশন ইনসটিটিউটে নায়িকাকে নায়ক যখন বেড়াতে নিয়ে এলেন এবং সেইসূত্রে ইনসটিটিউটের অতীত ও বর্তমান ব্যক্ত করতে যে সংযত সংলাপ ও ইঙ্গিতময় দৃশ্যের ব্যবহার করলেন, তাতেও পরিচালকের বাহাদুরি অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু নায়কের ছাত্র জীবন সাদাকালো সেলুলয়েডে নির্মাণ করে তার সংগ্রামী জীবন রঙিন করার মধ্যে কোনো চিন্তাভাবনার সাক্ষ্য নেই।

২· প্রতিষ্ঠান বিরোধীভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াবার প্রশ্ন, এ ছবির দ্বিতীয় বিষয়। এ পর্বে প্রাতিষ্ঠানিক আত্মবিকাশে বঞ্চিত নায়ক তার নিজের এই প্রাতিষ্ঠানিক বঞ্চনার অভিজ্ঞতা নিয়েই 'আধারশীলা' নামে একটি ছবি বানাতে শুরু করলেন। নিজেদের অর্থ, নিজেদের শ্রম, নিজেদের বুদ্ধি, নিজেদের ক্ষমতার ওপর দাঁড়িয়ে আধারশীলা ইউনিট-এর কাজ দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলে। নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার এই লড়াইয়ের পর্বটি খুবই উপভোগ্য কিন্তু ব্যাপারটি মাঝে মাঝে অতিনাটকীয় সহজ মীমাংসা বলে মনে হয়। তাছাড়া অতগুলো ছেলেমেয়ে একটি ইউনিটে একসঙ্গে কাজ করছে, অথচ ওদের মধ্যে কখনো কোনো সংকট গড়ে উঠছে না—এটা ভাবা বেশ কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। ওদের পারিবারিক অবস্থানও যে ঠিক কোথায়, ছবিতে তার হদিশ নেই। নায়কের যে পারিবারিক অবস্থান দেখানো হয়েছে তা বেশ সম্পন্ন ও স্বচ্ছল। কিন্তু নায়ক নায়িকা ছাড়া সে পরিবারে অন্য কোনো মানুষজন নেই। হতেই পারে। কিন্তু তখন প্রশ্ন এসে যায় যে, ওদের বেঁচে থাকার অর্থনৈতিক উৎস তাহলে কী? একটি সটে দেখানো হয়েছে, নায়িকা স্কুলবাসে বাড়ির দরজায় নামছেন। অর্থাৎ নায়িকা শিক্ষিকা। কিন্তু নায়ক তো বেকার, তাহলে কেবলমাত্র শিক্ষিকার উপার্জনে ওরকম সম্পন্ন জীবনযাপন সম্ভব হয় কী করে? ফিল্ম এণ্ড টেলিভিশন ইনসটিটিউটের স্নাতক ছাড়া নায়কের পারিবারিক পরিচয় তো ছবিতে রাখা হয়নি—এমনকী নায়িকারও নয়। ফলে নায়কের অর্থনৈতিক অবস্থান ছবিতে নির্দিষ্ট হয় না এবং ফলে নায়কের সিনেমা-পরিচালক হয়ে ওঠার বিষয়টি জোর পায় না।

অবশ্য আধারশীলা ইউনিট-এর বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেছেন, তাঁদের চরিত্র নির্বাচন এবং অভিনয়ে কোনো ফাঁক নেই—ওরা অধিকাংশই দিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার পাশ-করা ছেলে মেয়ে। বিশেষ করে রাজা বুন্দেলা এবং কে· কে· রায়নার মধ্যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। তরুণ চলচ্চিত্রকারের চরিত্রে নাসিরউদ্দিন তাঁর খ্যাতি-অনুযায়ীই অভিনয় করেছেন। পরিচালকের স্ত্রীর ভূমিকায় অনিতা কানওয়ারের ঘরোয়া চেহারা এবং ঘরোয়া মেজাজ মনে হয় অনেকেরই অনেক দিন মনে থাকবে। ক্যামেরা চলচ্চিত্র ভাষানুসারী। কিছু ভালো গজল শোনার অভিজ্ঞতাও ঘটে।

কিন্তু ছবি শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল কোথায়? এ ছবি দেখে মোটামুটি যে ধারণা নিয়ে ফিরতে হয়, তা হলো অনিতা কানওয়ারের মতো প্রেরণাময়ী স্ত্রী এবং 'আধারশীলা' ইউনিট-এর মতো একটি ইউনিট থাকলে প্রাতিষ্ঠানিক তোয়াক্কা না করেও সিনেমা গড়া যায়, না হলে যায় না।

অর্থাৎ ওদের লড়াইটা উপলক্ষকে ছাড়িয়ে যায় না, সবার লড়াই হয়ে ওঠে না। লক্ষ্যের এই অনির্দিষ্টতা 'আধারশীলা'-তে আছে। তবুও ছবিটি যে জায়গায় আঘাত করতে চেয়েছে, যতটা সফল হয়েছে, তাতেই ছবিটি সার্থকতা পেয়ে যায়, আশা জাগায়।

বরুণ দাশ

উষা-পাখা এবং সেলাই মেশিনের ক্ষেত্রে অগ্রদূত। মূল্য ও মানে সেরার সেরা।

যে কারণে উষার বিক্রি আজ সর্ব্বাধিক

উষা পাখার উচ্চ গুণ-বৈশিষ্ট্য

- কম্পিউটারে ডিজাইন করা মোটর অল্প বিদ্যুৎ খরচে বেশী বাতাস দেয়।
- কম ভোল্টেজেও অতি উত্তম কাজ করে।
- ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক পেন্টিং-এর জন্য মসৃণ রঙের বাহার।
- ২ বল-বেয়ারিং এবং অন্য সব উষার গুণ-বৈশিষ্ট্য।
- এবং এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সাথে উষার আছে-প্রত্যেকের পছন্দ, রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী নানা মডেলের পাখার সমারোহ।

JE/4-74(ক)

"ভারতের বধূদের চিনুন" উষার প্রতিযোগিতায় যোগদিন

উষা সেলাই মেশিন ক্রেতাদের জন্য ৩৬ লাখ টাকারও বেশী পুরস্কার।

প্রতি সপ্তাহে প্রথম ২০০টি সঠিক প্রবেশপত্রের জন্য ৫১ টাকা করে পুরস্কার।

তাড়াতাড়ি করুন ! মাত্র কিছুদিনের জন্য এই সুযোগ দেওয়া হবে !!
বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিকটতম উষার দোকানে যোগাযোগ করুন।

১ম পুরস্কার
যে কোন একটি জিতে নিন
- দুজনের জন্য বিমানে পৃথিবী ভ্রমণের টিকিট
- দুজনের জন্য লসএ্যাঞ্জলিস অলিম্পিক্স দেখার সুযোগ
- নগদ ৪০,০০০ টাকা

২য় পুরস্কার দুইটি
যে কোন একটি জিতে নিন
- একটি ২০ ইঞ্চি রঙীন টিভি
- একটি স্কুটার
- নগদ ৯,০০০ টাকা

৩য় পুরস্কার তিনটি
যে কোন একটি জিতে নিন
- ভারতের যে-কোন জায়গায় দুজনের জন্য তীর্থযাত্রার বা ছুটি কাটানোর ব্যবস্থা
- নগদ ৬,০০০ টাকা

৪র্থ পুরস্কার ৯টি
যে কোন একটি জিতে নিন
- একটি ১৬৫ লিটারের রেফ্রিজারেটর
- নগদ ৪,৫০০ টাকা

৫ম পুরস্কার ১৮৫টি
- এইচ. এম. টি হাতঘড়ি

আরও পাবেন!
সীমিত সংখ্যক সম্পূর্ণ জাপানী পার্টস্ সম্বলিত ফুল জিগ-জ্যাগ মেশিন

গুণের মহান ঐতিহ্য